

কৃষিশিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

কৃষিশিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর মুহম্মদ আব্দুল করীম
প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন জু-এ
প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল্লাহুল হক বেগ
ড. কাসী আহসান হাবীব
আনোয়ারা খানম
খোন্দ, জুলাফিকার হোসেন
এ কে এম জিলানুর রহমান

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মোঃ সদিকুল আমিন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সহায়ক

শাহীনুর বেগম

যোগাযোগ: মোঃ মুনাল মিয়া

প্রচ্ছদ

সুদর্শন মাহার

সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

দ্রিঙ্ক শেখর চিত্রাঙ্গ

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ

গ্রাফিক ডেস

সরকার কর্তৃক বিদ্যামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর শ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একেজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। তাহা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক মেধা ও সমাজকলার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এর ভরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার তিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে লক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক ভরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সহকারী নীতিসমূহ প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর সৈনিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে গড়ে তুলে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, যতন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিকবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-পেত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমবর্ধনাবোধ জন্মের করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমন্ডল জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যত্নস্বর্ভূত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সজ্জ্ব করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক ভরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল তুলে করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অনুশীলন প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি-কর্মসীতি নির্ভর দেশ। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে বীমিত জমির সর্বোত্তম ব্যবহার, অধি ও ফসল কমানোর লক্ষ্যে পানসই প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৌশলের সাথে পরিচিত করার প্রদান নিয়ে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাল্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানাননীতি।

একবিংশ শতকের অর্থীকার ও প্রভাবকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রিই অংশী কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, ডিজাইন, পড়না প্রদান প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে হারা আর্থনৈতিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের কলবান অঙ্গন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দ পাঠ ও প্রভাবশীল লক্ষ্যতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

এক্সেলের নারায়ণ চন্দ্র সাহা

সেতারহান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

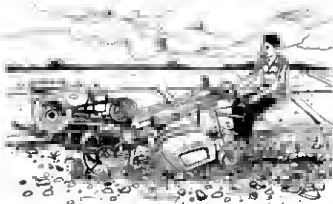
সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	কৃষি প্রযুক্তি	১-৩৫
দ্বিতীয়	কৃষি উপকরণ	৩৬-৬৯
তৃতীয়	কৃষি ও জলবায়ু	৭০-৯৩
চতুর্থ	কৃষির উৎপাদন	৯৪-১৭৪
পঞ্চম	বনায়ন	১৭৫-২০১
ষষ্ঠ	কৃষি সমস্যা	২০২-২০৯
সপ্তম	পারিবারিক খামার	২১০-২২৮

প্রথম অধ্যায়

কৃষি প্রযুক্তি

কৃষিকাজ এবং কৃষি প্রযুক্তি একে অপরের পরিসুরক। মূলত যে প্রক্রিয়ার কৃষি কাজ করা হয় তাই হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি। প্রকৃতি কৃষিকাজের সাথে সুনির্দিষ্ট কৃষি প্রযুক্তির সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে কৃষি আর শুধু পরিবারিক খাদ্য সরবরাহের বিষয় নয়। এটা এখন ব্যবসায়িক পেশার উন্নীত হয়েছে। আগে কৃষি বলতে জমি হাল-চাষ করে বীজ বুনে ঘরে ফসল তুলে বছরের বোঝাক সত্ত্বাহ করাকেই বোঝাত। কিন্তু এখন কৃষির প্রতিটি কাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের খরচাশি ও ফসলের বাজারবুজোর বাণকট্টে আত-হাভের হিসাববিকাশ করে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষিকে তুল্যাতন করা হয়। তাই এখন কৃষি সহস্যা বেবন জটিলতর হচ্ছে তেমনি কৃষি বিজানীহাও উন্নততর জ্ঞানসমৃদ্ধ কৃষি প্রযুক্তি উন্নতন করছেন। পূর্বের প্রেক্ষিতোতে আতরা কৃষিকাজের নাম, সট্ট্রিই প্রযুক্তির নাম, কৃষি হরপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়শি শিখেছি। দরহ-সময় প্রেক্ষিতে আরও এক খাপ এগিয়ে জমির প্রকৃতি, উর্বরতা কৃতি, ফসলভিত্তিক হাটের বৈশিষ্ট্য, কৃষিকর, কৃষিকরোহ, বীজ সংরকণ, রোপণালাই নমন, কৃষি বাহিনীকরণ ইত্যাদি বিষয় এবং সট্ট্রিই প্রযুক্তি সম্পর্কে জানব।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করতে পারব।
- খাদ উদ্ভেবপূর্বক জমির প্রকৃতি পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- জমি প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কৃষিকর, কৃষিকরোহ কারণ ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।

- কৃষিকরের অভিকারক দিকগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- কৃষিকরের কার্যকরী উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- বীজ সংরক্ষণের ভবুদ্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শস্টবীজ সংরক্ষণ করতে পারব।
- মাছ ও পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছ ও পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- সম্পূরক খাদ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছের ও পশুপাখির সম্পূরক খাদ্য তালিকা তৈরি করতে পারব।
- মাছ ও পশুপাখির সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- মাছ ও পশুপাখির হ্রদ বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফসল নির্বাচন

মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

মাটি ফসল উৎপাদনের অন্যতম মাধ্যম। ফসল উৎপাদন মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর পুরাপুরি নির্ভরশীল। মাটিই হচ্ছে পানি ও পুষ্টির প্রাকৃতিক উৎস। সব মাটিতে সব ফসল জন্মানো হয়। যেমন: ধানপাতি কাশা মাটি বা কাশা সোজা মাটি পছন্দ করে। অপর দিকে বাগান বেলে বা বেলে-দোআঁশ মাটি পছন্দ করে। তবে বাংলাদেশের মাটি পলা, প্রচণ্ডুর ও বেঘনাব পলি হওয়া সৃষ্টি হওয়ার কারণে সব ধরনের ফসলই কামবেশি জন্মায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মাটিই মরম, ছালকা, ধুলিময় ও কর্ণসোপা। মাটি বলতে ভাঙেই বোঝায় যেখানে ফসল জন্মায়, বন সৃষ্টি হয় আর সবজিপত্র বিচরণ করে। একজন কৃষককে যখন মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ঝটপট বলে থাকেন যে ভূ-ত্বকের পটীতে যতটুকু লাভসের কলা পৌঁছে, তাই মাটি বা ফসল উৎপাদনের উপযোগী। অর্থাৎ কৃষকের জায়গা ভূ-পৃষ্ঠের ১৫-৩৮ সেনি. পটীর ভরতে মাটি বলা হয়। অতএব, ফসল উপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য এ ভরতেই নিহিত।

আগেই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের মাটিতে অল্প বিভিন্ন সব ফসলই জন্মে। কিন্তু সব অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য একরূপ নয়। তাই দেখা যায়, কোথাও ধান, কোথাও গম, কোথাও আলু আবার কোথাও পাট জন্মে হয়। নিচে বিভিন্ন ফসল উপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

ধান চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	পম চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
<p>১) কংকর ও বেলেমাটি ছাড়া সব মাটিই ধান চাষের উপযোগী। এটেল ও এটেল সোআঁশ মাটি ধান চাষের জন্য খুব ভালো। সম-সমীর অববাহিকা ও হওন-বাঁওর এলাকা যেখানে পলি জমে সেখানেও ধান ভালো হয়।</p> <p>২) একরকমের উঁচু, মাঝারি, নিচু সব ধরনের জমিকেই ধানের চাষ করা যায়। যেমন, নিচু জমিকে বোরো ও জলি আমল চাষ করা হয়।</p> <p>৩) মাটির অপ্রাচুর্য থেকে সিরশেক অবস্থা ধান চাষের অনুকূল।</p> <p>৪) মাটিতে জৈব পদার্থ কম হলে কয়লাপোষ্ট ব্যবহার করে এর দায় বাড়ানো যায়।</p> <p>৫) মাটির সইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, জিঙ্ক, সালফার ইত্যাদির দায় নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।</p>	<p>১) উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি পম চাষের জন্য উপযোগী। মাঝারি নিচু জমিতেও পম চাষ করা হয়।</p> <p>২) সোআঁশ বা বেলে সোআঁশ মাটি পম চাষের জন্য ভালো। এটেল - সোআঁশ মাটিতেও পমের চাষ হয়।</p> <p>৩) বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে পমের চাষ ভালো হয়। এছাড়া ঢাকা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, কক্সবাজারেও পমের আবাদ হয়।</p> <p>৪) বাংলাদেশের সব কৃষি অঞ্চলে পমের চাষ হয় না। বিশেষ করে হাওর - বাঁওর ও হিল অঞ্চলে পমের আবাদ করা হয় না।</p> <p>৫) যে মাটিতে pH (অম্লীয়তা-ক্ষারত্ব)। যার ৬.০ থেকে ৭.০ সেলস মাটিতে পম ভালো হয়।</p>

পট চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	ভালো চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
<p>১) ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রবৃত্তি বল-সমীর পলিবাহিত উর্বর সমতল জমিতে পট ভালো ফলে।</p> <p>২) সসীমবাহিত পটীর পলিমাটি পট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।</p> <p>৩) সোআঁশ ও বেলে সোআঁশ মাটিতেও পট ভালো ফলে।</p>	<p>১) উঁচু ও মাঝারি জমিতে সোআঁশ, বেলে সোআঁশ, এটেল সোআঁশ এবং পলি সোআঁশ মাটিতে ভাল ফাটীর ফসল ফলে। ভাল ফসল অতিরিক্ত পানি সহ্য করতে পারেন। তাই নিষ্কাশনযোগ্য মাটিই ভাল চাষের জন্য উপযোগী।</p> <p>২) ভাল নিরপেক্ষ বা ক্ষারীয় মূলভূত মাটিতে ভালো হয়।</p> <p>৩) ঢক ও ঠীকা আবহাওয়া এবং অল্প বৃষ্টিপাত ভাল ফসল চাষের জন্য উপযোগী। যদি এছাড়া আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত থাকে তবে বেলে সোআঁশ থেকে এটেল সোআঁশ প্রকৃতির মাটিতে অবশ্যই ভাল ফসল ভালো ফলন হবে।</p> <p>৪) বিনা চাষে ভাল ফসল আবাদের জন্য নিচু ও মাঝারি জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি থেকে বর্ষার পানি নেমে গেলে ভেঁজা মাটিতে ভাল ফসলের বীজ বোনা হয়।</p>

কাঙ্ক্ষা : শিক্ষার্থীর মাটি উপযোগী ফসলগুলোর তালিকা তৈরি করবে এবং প্রস্তুতি উপস্থাপন করবে।

সবজিআবর্তীতর তসলর মাতির বৈশিষ্ট্য

সবজরনর শাকসবজিই ঠুঁতু, সুসিদ্ধাসিত সোআঁশ, বেল সোআঁশ, পলি সোআঁশ মাতিতে জালো জানে । নিতে আলু ও টমেটো চাষোপযোী মাতির বৈশিষ্ট্য কর্ণন করা হলো ।

সোল আলু চাষোপযোী মাতির বৈশিষ্ট্য	টমেটো চাষোপযোী মাতির বৈশিষ্ট্য
১) সোআঁশ ও বেল সোআঁশ মটি আলু উপাদানের জন্য বেশ উপযোী ।	১) যে কোনো প্রকার মটিতে টমেটোর চাষ করা যায় । তবে বেল ও কংকরময় মটিতে টমেটো চাষ করা যায় না ।
২) আলুর জন্য বাহু চলচল করতে পারে একশ নরম ও তুরতুরে মটি মরকার । এতে অশু বড় হওয়ার সুযোগ পায় ।	২) সোআঁশ ও বেল সোআঁশ মটি টমেটো চাষের উপযোী ।
৩) সোল আলুর মটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ থাকে মরকার ।	৩) বেল মটিতে অধিক পরিমাণে জৈবপাৰ প্রাণেণ করলে টমেটোর চাষ বেটিমুটি করা যায় ।
৪) মটির pH মাত্রা ৬-৭ এর মধ্যে থাকা ভালো ।	৪) মটির pH মাত্রা নিরপেক্ষ মানের কাছাকাছি হলে ভালো হয় ।

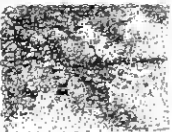
কাজ : শিকারীরা লগনতভাবে কোন বরনের মটিতে কোন বরনের তসল জালো হয় তার একটি তালিকা তৈরি করবে এবং প্রেসিতে উপস্থাপন করবে ।

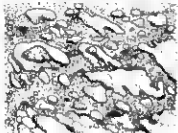
সুতিকাসিতিক পরিবেশ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তসল নির্বাচন

আপের শঠকসোতে আমরা তসলের প্রেসি অনুযায়ী মটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে শিখেছি । এই পার্টে আমরা মটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তসল নির্বাচন করতে শিখব । মটির বৈশিষ্ট্য বলতে মটির প্রেসি, জৈব পদার্থের মাত্রা, পটাশজাত ধনিকের মাত্রা, pH মাত্রা এবং মটির বহুরককে বোকার । আমরা শিখব জেসেছি যে মটির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভালোতসলকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে । কোনো একটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল প্রকৃতিগত সের অঞ্চলের মটির প্রতিনিধিত্ব করে । এক একটি কৃষি অঞ্চল এক একটি প্রকৃতিগত বটে । কৃষি কর্মজগতের জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হলো মটির বৈশিষ্ট্য ও বহুরকতা অনুযায়ী তসল নির্বাচন করা । মটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক তসল নির্বাচন কৃষি কর্মের একটি অত্যাবশ্যক প্রযুক্তি । এই প্রযুক্তি বড় নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করা যাবে কৃষিক্ষেত্রে ফলাফলও ভাল বেশি লাভজনক হবে । মটির গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলকে নিম্নোক্ত ৫টি ভাগে ভাগ করা যত । এই অঞ্চলগুলোর মটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক তসল নির্বাচন দেখানো হলো ।

- ১। সোআঁশ ও পলি সোআঁশ মটি অঞ্চল
- ২। কাদা মটি অঞ্চল
- ৩। বহুশু অঞ্চল ও মধুপুর অঞ্চল
- ৪। পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চল
- ৫। উপকূলীয় অঞ্চল

মুগ্ধিকার ভিত্তিক অঞ্চল	চাষ উপযোগী কসল
<p>সোরাঁশ ও পলি সোরাঁশ মাটি অঞ্চল:</p> <p>এ অঞ্চলের তুমির মাটি সোরাঁশ থেকে পলি সোরাঁশ প্রকৃতির। উঁচু তুমি থেকে মাঝারি নিচু তুমি এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সোরাঁশ অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা অল্প থেকে মাঝারি। এর P^{25} মাত্রা ৫.২ হতে ৬.২ পর্যন্ত। পলি সোরাঁশ অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা খুবই সামান্য। P^{25} মাত্রা ৪.৯ হতে ৬.১ পর্যন্ত।</p>	<p>সোরাঁশ মাটিতে প্রায় সব বকমের কসল কসে। সোরাঁশ কসল উৎপাদনের আদর্শ মাটি। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে কৃষকেরা কসল উৎপাদন করেন। আবার সেচের উপর নির্ভর করেও কৃষকেরা কসল উৎপাদন করেন। নিচে বৃষ্টি ও সেচ নির্ভর কসলের নাম উল্লেখ করা হলো।</p> <p>বৃষ্টিনির্ভর কসল নির্বাচন</p> <p>রবি মৌসুম : গম, ফুল, চিমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ট্রেডস, সরিষা, ডিনা বাসুম ইত্যাদি</p> <p>বরিশ-১ : রোপা আউশ, বোনা আমন, পটি (সাদা), কাউন, বেগুন, ডিল, চুপ, বোনা আউশ, ভুট্টা, খৈচা ইত্যাদি</p> <p>বরিশ-২ : রোপা আমন (ছানীর উন্নত জাত ও উচ্চশী)</p> <p>সেচনির্ভর কসল নির্বাচন</p> <p>রবি মৌসুম : ধোয়া, আঁখ, আঁখ+আলু, আঁখ+চুপ, শিরাম, তসুল, গম, আলু, ফুল, সরিষা ইত্যাদি</p> <p>বরিশ-১ : রোপা আউশ, পটি (কোঁচা), ডিল, ভুট্টা</p> <p>বরিশ-২ : রোপা আমন (ছানীর উন্নত জাত ও উচ্চশী)</p>
<p>কাদা মাটি অঞ্চল</p>	
<p>মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু এলাকায় মাটি কর্মম বিপীষ্ট। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পলি কাদা বিপীষ্ট মাটিও লক্ষ করা যায়। এই মাটিতে মাঝারি মাত্রার জৈব পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চমাত্রার জৈব পদার্থও আছে। পটাশজাত বনিকের ম'ত্রা মাঝারি।</p>	<p>মাঝারি নিচু ও নিচু অঞ্চলসমূহে কাদা মাটি বেশি দেখা যায়। কাদা মাটিতে ধানের উৎপাদন ভালো হয়। নিম্নে বৃষ্টিনির্ভর ও সেচ নির্ভর কসলের নাম উল্লেখ করা হলো।</p> <p>বৃষ্টিনির্ভর বা সেচনির্ভর উভয় ক্ষেত্রেই এই অঞ্চলের কসল প্রথমত ধান। রবি মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা থাকলে কিছু পরিমাণ অন্যান্য কসলও কসে।</p>

বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চল	চাষ উপযোগী ফসল
<p>উঁচু এবং মাঝারি উঁচু কৃষি বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মধুপুর অঞ্চল সমতল ও উঁচু কৃষি বিশিষ্ট। এর মাটি সোরাঁশ। মাটিতে নিম্নমাত্রার জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজ পদার্থ রয়েছে। এর P^{25} মাত্রা ৫.৫-৬.৫।</p>  <p>চিত্র : সোরাঁশ মাটি</p>	<p>এই অঞ্চলের মাটি সোরাঁশ হওয়ার কারণে ঠিকমতো সেচ শেলে বানাবিধ ফসল উৎপাদন করা যায়। নিচে বৃষ্টি ও সেচ নির্ভর ফসলের নামের তালিকা দেওয়া হলো।</p> <p>বৃষ্টি নির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>কবি মৌসুম : বোরো, আখ, আলু, সরিষা, মসুর, ছোলা, বারি ও শীতকালীন শাকসবজি।</p> <p>বরিশ-১ : বোনা আউশ, পাট, কাউল, গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি</p> <p>বরিশ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উচ্চশী)।</p> <p>সেচ নির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>কবি মৌসুম : আখ, আখ+আলু, গর, সরিষা, চিনাবাদাম, মসুর, উম্মেটো, বাঁধাকপি, ছোলা, শীতকালীন শাকসবজি</p> <p>বরিশ-১ : রোপা আউশ, পাট, মুগ, চাঁকুস</p> <p>বরিশ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উচ্চশী)।</p>
<p>পাহাড়ি ও পালকুনি অঞ্চল</p> <p>এ অঞ্চলের ৯০ শতাংশের বেশি কৃষি উঁচু। ঝাণড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও আখাউড়া এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই মাটি সোরাঁশ। জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজের মাত্রা সামান্য। এখানকার মাটির P^{25} মাত্রা ৫.৫-৬.৫।</p>	<p>পাহাড়ি ও পালকুনি অঞ্চলের মাটি সোরাঁশ হওয়াতে পাহাড়ি অঞ্চলেও নানাবিধ ফসল উৎপাদন হয়। নিচে এই অটিকে উপযোগী বৃষ্টি নির্ভর ও সেচ নির্ভর ফসলের তালিকা দেওয়া হলো।</p> <p>বৃষ্টি নির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>কবি মৌসুম : আখ, সরিষা, মসুর, ছোলা, গর ইত্যাদি</p> <p>বরিশ-১ : বোনা আউশ, পাট, বোনা আমন</p> <p>বরিশ-২ : রোপা আমন</p> <p>সেচ নির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>কবি মৌসুম : আখ, আখ+আলু, আখ+মসুর, বোরো, গর, সরিষা ইত্যাদি</p> <p>বরিশ-১ : বৈজ্ঞ, বোনা আউশ, রোপা আউশ</p> <p>বরিশ-২ : রোপা আমন (স্থানীয় উন্নত ও উচ্চশী)</p>

মৃত্তিকা ভিত্তিক অঞ্চল	ভাষ উপযোগী অঞ্চল
<p>উপকূলীয় অঞ্চল</p> <p>সেউয়াটিন টীপ, চট্রোয়, ফেনী, সোরাখালী, বরিশাল ও জেলাসহ বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে মাঝারি উঁচু জমির অধিকাংশ বেশি : এর মতি সোঁতাশ এবং বেলে ও পলি সোঁতাশ প্রকৃতির। জৈব পদার্থ ও পটাশজাত বসিফের মাত্রা অল্প। এই অঞ্চলের মাটির pH মাত্রা ৭.০ - ৮.৫।</p>  <p>চিত্র : পলিমাটি</p>	<p>বোহেজু এখামকর মাটি সোঁতাশ, বেলে ও পলি সোঁতাশ ভাই বিভিন্ন প্রকার কৃষিশা এই অঞ্চলে উৎপাদন হয়। সিতে এই অঞ্চলে বৃত্তিবির্ভর ও সেচসির্ভর কসলের নাম উল্লেখ করা হলো।</p> <p>বৃত্তিবির্ভর অঞ্চল নির্বাচন</p> <p>জমি বৌপুখ : পল, সরিষা, তুল, মরিচ, লিখাজ, রসুন, তুলা, বেগুন, শির, টমেটো, চিনাবাদাম, ছুটা ইত্যাদি।</p> <p>বরিশ-১ : বোশা আউশ, বোশা আউশ, পাট, কঁকরোল ইত্যাদি।</p> <p>বরিশ-২ : বোশা আউশ (হালীত উন্নত ও উন্নতী)</p> <p>সেচ বির্ভর অঞ্চল নির্বাচন</p> <p>জমি বৌপুখ : বোরো, টমেটো, আলু, সরিষা, তরমুজ, তুল, মরিচ ইত্যাদি।</p> <p>বরিশ-১ : বোশা আউশ</p> <p>বরিশ-২ : বোশা আউশ (হালীত উন্নত ও উন্নতী)</p>

কাছ : শিকারীরা ভাসের সিজ সিজ গ্রাম/উপজেলা কোম পরিবেশ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তা শিকারের কাছ থেকে জেলে সেবে। অতঃপর গ্রামের মটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে মাটির প্রকার উল্লেখ করে এ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।

বিভিন্ন পরিচ্ছেদ

ফসল উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুতি

কৃষির বসন্ত কাল আগে তখনো প্রচুর পূর্ণ কাল হলো জমি প্রস্তুতি। সব ফসলের জন্য জমি প্রস্তুতি এক রকম নয়। যেমন বোরো বা বোণা আমন ধানের ক্ষেত্রে আগে চারা উৎপাদন করতে হবে, তারপর মূল জমি প্রস্তুত করে চারা রোপণ করতে হবে। কিন্তু বোনা আউশ বা বোনা আধানের ক্ষেত্রে চারা উৎপাদন না করে সরাসরি প্রস্তুতকৃত মূল জমিতে বীজ ছিটিয়ে দিতে হয়। এরা একইরকম পর্বের ক্ষেত্রেও ভাগ্যভাগ্যে জমি চাষ দিয়ে বীজ ছিটিয়ে বুনেতে হবে। জমি প্রস্তুতির সাথে বহুদুই কাজ জড়িত। যথা জমি চাষ, মই সেওয়া, শার প্রয়োগ ইত্যাদি। নিচে ফসলভিত্তিক প্রত্যেকটি কাজ আলোচনা করা হলো।

ধান চাষের জন্য জমির প্রস্তুতি

ধান বাংলাদেশে সারা বছর চাষ করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীজতলায় চারা উৎপাদন করতে হয়। ধানের বীজতলা তৈরি ও জমি প্রস্তুতি ৪র্থ অধ্যায় এর ১ম পরিচ্ছেদ থেকে আলাদা জানতে পারব।

পম চাষের জন্য জমি প্রস্তুতকরণ

পম রবি শস্য। বর্ষার মৌসুম শেষ হওয়ার পর মধ্য কর্তিক-যথা অক্টোবর পর্যন্ত পম চাষের উপযুক্ত সময়। মাটির 'জে' স্তরে অধিকে লালচে ঢালনা করা হয়। পমের মাটি কুরকুরা করে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এজন্য ও বেতে ও বার আড়াআড়ি জমি চাষ দিয়ে বার করেই মই দিয়ে মাটি কুরকুরা হয়। জমিতে থাকে কোনো বস্তু ঢেলা বা থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। পমের জন্য সোজাশ বা বেলে সোজাশ মাটি উপযুক্ত। এ মাটি সহজেই কুরকুরা হয়। পাওয়ার ট্রাক্টরের সাথে বট্টোকেটর সংযোগ করে জমি চাষ দিলে মাটি ভালো চাষ হয় এবং একই সাথে মইও সেওয়া হয়। কুরকুরা মাটি পমের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে খুবই উপযোগী। অষ্টম প্রেসিডে অনার পম চাষে সার প্রয়োগ সম্পর্কে জেনেছি।

ডালজাতীয় শস্যের জন্য জমি প্রস্তুতি

বাংলাদেশে ডালজাতীয় শস্যের জন্য জমি চাষ করা হয় না। তবে মসুর ডালের জন্য জমিকে দুইএকটি চাষ সেওয়া হয়। বর্ষা শেষ হলে অধিন-কার্তিকে বধন বর্ষার চার ও শিউ এলাকায় হতে পাশি সরে বার তখন মসুর পলি মাটিতে বিনা চাষে বীজ বপন করা হয়। চাষ সেওয়া সম্ভব হলে দুইএকটি চাষও সেওয়া হয়। চাষের পর পঙ্কিত জমিতে আবার অনেক সময় রোপণ ও বোনা আধানের জমিতে ফসল থাকে অবস্থার ডালের বীজ ছিটিয়ে সেওয়া হয়।

আলু চাষের জন্য জমি প্রস্তুতি

শিউ এলাকায় বর্ষার পাশি সেবে গেলে বা শিউ এলাকায় অধিন মাস হতে আলু চাষের জন্য জমি প্রস্তুতির কাল শুরু করা হয়। সাধারণত সোজাশ ও বেলে সোজাশ মাটিতে আলুর চাষ করা হয়। তাই মাটি চাষ করা মেটাছুটি সহজ। আলুর জমি ৫-৬ বার চাষ ও বসন্ত করেই মই দিয়ে মাটি কুরকুরা করে জমি প্রস্তুত করা হয়। আলুকাল পাওয়ার ট্রাক্টর বার চাষ করা হয় বলে ৩-৪ বার আড়াআড়ি চাষ দিলেই কুরকুরা হয় এবং সমান করা হয়।

নলা তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জমি আলোচনা করে চাষ ও মই সেতওয়ার পর জমি সমান করে বীজ বপনের জন্য জমির এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত নলা করতে হবে। একে একটি নলা ধার ১০-১২ সেমি. পঙ্খী করতে হবে। একটি নলা থেকে আর একটি নলার দূরত্ব হবে ৬০ সেমি.। অতঃপর নলার মধ্যে ১৫ সেমি. দূরে দূরে বীজ বুনে দিতে হয়। আলুচাষে সার প্রয়োগ পদ্ধতি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জমি প্রসূতির কনু

জমি কর্ষণ জমি প্রসূতির প্রথম ধাপ। জমি কর্ষণের সংকীর্ণ অর্থ হলো কসল কলারের উদ্দেশ্যে জমির মাটি ঘরের সাহায্যে খুঁড়ে আলগা করা। কিন্তু জমি কর্ষণের সাথে শস্য প্রযুক্তি জড়িত। যেমন, বীজকে অক্সিজেনের জন্য উপযুক্ত স্থানে ও সঠিক পটীয়তার স্থাপন করা, মাটিতে বায়ু চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি করা, উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে নিয়ে আসা, মাটিতে অণুজীবের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। এসব দিক বিবেচনা করে জমি প্রসূতির কনু উপলব্ধি করা যায়। আর এই কনু অনুশাসনের জন্য জমি কর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে “শস্যের বীজ মাস্টে সুস্থভাবে বসান ও পরবর্তী পর্যায়ে চারাগাছ বৃদ্ধির জন্য মাটিকে যে প্রক্রিয়ার খুঁড়ে বা আঁড়ে আগছাযুক্ত, নরম, আলগা ও ফুরফুরা করা হয় তাকে জমিকর্ষণ বলে”। জমি কর্ষণ জমি প্রসূতির প্রাথমিক ধাপ। আদিকাল থেকেই মানুষ জমি কর্ষণ অথবা জমি প্রসূতির কনু উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই তারা কার্ভের বা প্যডলের ভৈরি সূচালো যন্ত্রের সাহায্যে মাটি আলগা ও নরম করে কসলের বীজ বুনেতে বা চাষ প্রয়োগ করেছেন। কসলভেসে জমি কর্ষণের ভারতীয় হাতে পারে কিন্তু এর কনু কখনো খাটো করে দেখার বিষয় নয়।

জমি প্রসূতির ক্ষেত্রে খনন হচ্ছে উদ্ভেদ আছে যে,

বেলা চাষে মূলা
চাষে অর্ধেক মূলা
তার অর্ধেক ধান
কিনা চাষে পান

কম্ব : শিক্ষার্থীরা মাঝে মাঝে কসলের মাঠ পরিদর্শন করবে। কৃষকেরা পয় চাষের জমি তৈরি করছেন তা দেখবে এবং জমি প্রসূতির কর্মকাণ্ডগুলো বাতায় লিখবে। এতদ্বারা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কসলের বিভিন্ন বকরের জমি প্রসূতির নিয়ম বুঝে বের করে লিখবে।

অর্ধাৎ মূলা চাষের জন্য ফেলাটি চাষ দিতে হবে বতফল বা মাটি ফুরফুরা বা আলগা হয়। মূলা চাষের জন্য খাট চাষ দিতে হবে আর ধানের জন্য চাষটি চাষই করতে। মজার ব্যাপার হলো পান উৎপাদনে কোনো চাষই লাগেনা। আর এই ধারণা থেকেই আজকাল বিভিন্ন কসল উৎপাদনে ‘কিনা চাষ’ প্রথা প্রচলন করা হয়েছে। এখন অনেক কৃষকই কিনা চাষে ভুট্টা, ডাল ইত্যাদি কসল উৎপাদন করেন।

ভূমি কর্তব্য তথা জমি প্রস্তুতকরণের উদ্দেশ্য

ভূমি কর্তব্যের উদ্দেশ্য থেকেই জমি প্রস্তুতকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। নিচে ভূমি কর্তব্যের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো:

- ১। **মাটি বীজের অনুরোধমূলক অবস্থার আলোচনা** : যে প্রক্রিয়ায় মাটিকে সুকল্যাণ করে বীজের অনুরোধমূলক অবস্থায় আনা ও ফসল জন্মানোর উপযোগী করা হয় তাকে কর্তব্য বলে। জমিতে বাবদার চাষ সেপতার ফলে মাটি নরম হয়, দানাফলো মিহি হয় আর খসে বীজ পড়লো ও ফসল জন্মানোর এক তৌক অবস্থা সৃষ্টি হয়। জমি কীভাবে কল্যাণকর করা হবে তা নির্ভর করে মাটির প্রকারভেদে, মাটির জৈব পদার্থ ও রস এবং ফসলের প্রকারভেদে উপর। মোদাশি, বেগে বা বেগে মোদাশি মাটির মতো হালকা মাটিতে ৩/৬ এর চাষ এ মই দিলে ভূমি কর্তব্য ফসল উৎপাদন উপযোগী হয়। কিন্তু কাদামাটির মতো ভারী মাটিতে ৫/৬ বা ৭/৮ চাষের প্রয়োজন পড়ে। মাটিতে রস থাকলে চাষের সময় মাটি সহজেই খুলে যায় আর রস না থাকলে বড় বড় ঢেপা হয়। মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকলে মাটির কথা দানাদার হয় ও সংযুক্ত থাকে। আর তাতে বীজের অবস্থান ভালো থাকে এবং সহজেই অনুরোধমূলক হয়।
- ২। **মাটি সার ও জৈব পদার্থের বিশ্লেষণ** : জমিতে সার নিজেই হয় এবং জৈব পদার্থ প্রদান করতে হয়। ভূমি কর্তব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মাটির সাথে সার ও জৈব পদার্থের বিশ্লেষণ ঘটানো। এ ক্ষেত্রে জমি পুই একবার চাষ সেপতা হলে সোকা বা কমপোস্ট জমিতে ছিটানো হয়। পরবর্তী চাষের সময় এগুলো মাটিতে মিশে যায়। অনেক সময় তৈলাক চাষ করতেও সবুজ সার হিসাবে কুল আশার আশে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মেশানো হয়। তাতে মাটির উর্বরতা বাড়ে।
- ৩। **সু-অভ্যন্তরীণ কীট-পতঙ্গ দমন** : মাটির অভ্যন্তরে অনেক পোক আছে যেগুলো ফসলের অনেক কতি করে। ভূমি কর্তব্যের সময় এসব পোকা, পুতুলি ও ডিম উন্মুক্ত হয় এবং পরিষ্কার এগুলো থেকে নিধন করে। আর সূর্যালোকও সেগুলো ধ্বংস করে। মাটির নিচের পোকাগুলোর মধ্যে উই, উরুচলা ও পিলীপিকা প্রধান।
- ৪। **মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ** : ভূমি কর্তব্য মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়া। অবর্ধিত ভূমি থেকে পানি ডাঙাডাঙি বাপন হয়ে বার অবধা পানি পড়িয়ে অন্যর ভলে বার। কিন্তু কর্তব্য জমিতে সার বা সেচের পানি আটকা পড়ে যা পরে মাটি ভেদে বের। অবর্ধিত কর্তব্য মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক মাটিতে বীজ মুনলে ভালো অনুরোধমূলক হয় এবং ফসলের বৃদ্ধি বাড়ে।
- ৫। **মাটিস্থ জীববিশেষের কার্যকারিতা বৃদ্ধি** : মাটিতে অনেক জীববিশেষ আছে যা মাটিতে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে তখনো হ্রাস ও ব্যাকটেরিয়া প্রধান। এসব জীববিশেষ মাটিতে থেকে মাটির জৈব পদার্থ পচন সাহায্য করে। তাগোভাবে ভূমি কর্তব্য করলে মাটিই এই জীববিশেষের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। গাছ সহজে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে এবং ফলন অনেক ভালো হয়।
- ৬। **মাটির ক্ষয়রোধ** : ভূমি কর্তব্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো টুচু-নিচু জমিতে সমতল করা এবং আঁটসাঁট করা। তাতে বৃষ্টির বা সেচের পানি পড়িয়ে অন্যর থেকে পারে না। আর এতে একদিকে ভূমিক্রম নিরোধ হয় আর অন্যদিকে পানির সুব্যবহার হয়।

জমি চাষের বিবিধ বিষয়

জমি কীভাবে চাষ করতে হবে তা নির্ভর করে কতকগুলো বিষয়ের উপর। বিষয়গুলো হচ্ছে :

- ১। কসলের প্রকার
 - ২। মাটির প্রকার
 - ৩। আবহাওয়া ও
 - ৪। খামারের প্রকার ইত্যাদি।
- ১। কসলের প্রকার। জমি চাষ কেমন হবে তা নির্ভর করে কৃষক কী কী কসল কলারেন। যেমন ধান চাষের জন্য কেরকলার আড়াঅড়ি চাষ ও বই দিয়ে জমি কর্ষিত করতে হয়। কিন্তু মূলা, মরিচ, ইত্যাদির জন্য মাটি মিহি ছুরছুরা করে চাষ করতে হয়। আশ ও আলু চাষের জন্য পটীরভাবে জমি চাষ করতে হয়।
 - ২। মাটির প্রকার। জমি চাষ মাটির প্রকারের উপর নির্ভর করে। কাঁচা মাটিতে বেশি অর্ধ্রতা বা তেল থাকলে চাষ করা যায় না। মাটির “জো” খালা পর্বত অপেক্ষা করতে হয়। আবহা হালকা মাটি যেমন সোআঁশ, পলি সোআঁশ ও বেলে সোআঁশ মাটিতে অর্ধ্রতা একটু বেশি থাকলেও চাষ করা যায়। এই মাটিগুলো চাষের জন্য খুব ভালো।
 - ৩। আবহাওয়া। আবহাওয়ার প্রভাবে মাটিতে অর্ধ্রতার ভাষত্বা খট্টে। বৃষ্টি-বাদল কম হলে মাটিতে অর্ধ্রতার অভাব খট্টে। এই অবস্থায় জমিতে পটীর চাষ সেওয়া অনুচিত। মাটিতে পটীর চাষ দিলে অর্ধ্রতার অভাব দেখা লিবে। আবহা বর্ষাকালে তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তখন মাটিতে প্রচুর অর্ধ্রতা থাকে এবং গোশা খালন চাকের জন্য জমি প্রস্তর করা সহজ হয়।
 - ৪। খামারের প্রকার। বাড়ির আশে পাশের জমিতে নিবিড় শস্য চাষ করা হয়। নিবিড় শস্য চাষে একটা কসল দুইটাই আর একটা কসল লাগালে হয়। তখন জমিতে পটীর চাষের সহকার পড়ে না। জমির মাটি এমনিডেই খালপর থাকে। তবে অনিবিড় শস্য চাষে জমিতে পটীর চাষের সহকার পড়ে।

ভূমির পরিচয় ভূমিকমল ও ক্ষয়বোহ

ভূমিকমল

মূলধারায় ভূমির সমস্ত মাসির লিকে লক্ষ্য কর। দেখবে বড় বড় ভূমির কেঁটা যখন স্থপতিত হয়, তখন ভূমির আধারে ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হয় আর এতে পানি জমা হয়। কালান্ধিত খোলা পানি অপেক্ষাকৃত নিচের লিকে ধবিত হয়। একতবে ভূমিপাতের সময় কণাবিশিষ্ট খোলা পানির মাধ্যমে ভূমিকমল হয়। আবার ঝড়-ঝড়াল বা ঘূর্ণিঝড়ের লিকে লক্ষ্য কর। দেখবে বাক্যনের বেগের সাথে মাটির কণা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে উড়ে যায়। বহির্ভে থাকলে কোমর টোখে বুঝেও ইন্ডির কণাগুলো আলাদা করে। অর্থাৎ বাক্যল দ্বারাও ভূমিকমল হয়। এখন ইন্ডর কণাকে পাঠের যে বিভিন্ন কণাগুলি জন্মিত উপরিতাপ হয়ে মাটির কণা চলে যাওয়ার লে ভূমিকমল বলে।

ভূমিকমল প্রক্রিয়ায় একস্থানের মাটির ক্ষয় হয় আর অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থানে জমা হয়। ভূমিকমলের প্রকাশ কারণগুলো হচ্ছে ভূমিপাত, ঘূর্ণিঝড়, স্রোত, বনজলমল পরিভার করে চাবাবাল, পাহাড়ের চালে চাবাবাল ইত্যাদি। ক্রমাগত ভূমিপাতের ললে মাটি যখন পানি শোষণকমত: হারিয়ে তেলে তখন অভিজিত পানি মাটির উপরের স্তরের কিছু ভূমিকমল কণা বহন করে নিম্ন লিকে প্রবাহিত হয়। পানি প্রবাহের সাথে ভূমির উপরি স্তরের মাটি আলগা হয় এবং নিম্নভূমিতে গিয়ে জমা হয়। তেমনি কর্তিত জন্মি হতে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমেও কণার আকারে মাটি দূরদূরান্তে চলে যায়। স্রোত বহী স্রোতের পাড় তেলে মাটি অন্যস্থানে বহন করে গিয়ে যায় ও চাবাকল গড়ে তেলে। বায়ু বহন বন-তখন কেটে পরিভার করে ফললের আহাশ করে তখন ভূমি উপুত হয়। আর দাবানিতও বিচল করে। এলে ভূমির ক্ষয় হয়। একইভাবে পাহাড়ের জলল কেটে পাহাড়ের চালে চাবাবাল করে। ভূমিপাতের জলস্রোত উপরের স্তরের মাটি উপরভাকার পরিণত হয়।

ভূমিকমলের প্রকার

ভূমিকমল দুই প্রকার: ১) প্রাকৃতিক ভূমিকমল ও (২) মনুষ্য কর্তৃক ভূমিকমল। গিয়ে এগুলোর আলোচনা করা হলো:

১. প্রাকৃতিক ভূমিকমল: প্রাকৃতিক ভূমিকমলে ভূমিকমল হয়। ভূ-সৃষ্টির তত্ত্ব থেকেই এর ক্ষয় তত্ত্ব হয়েছে। স্রোতকালের এই ক্ষয়ের ফলেই স্রোতের মোকদ্দার বা স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে বা স্রোত গড়ে উঠেছে। এই ভূমিকমলের ফলে পৃথিবীর অনেক অঞ্চল উর্বর হয়েছে, আবার অনেক অঞ্চল অনুর্ব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অবনত ভূমিকমল হচ্ছে অবনত ভূমিকমল বা উপলব্ধি করা যায়।



চিত্র ১. প্রাকৃতিক ভূমিকমল

বায়ুপ্রবাহ ও ভূগোষ্ঠ প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। একসঙ্গে চলার পাশে ভূ-পৃষ্ঠের মাটির কণা বহন করে নিয়ে যায়। এ জন্য যে পরিমাণ মাটির ক্ষয় হয় তা খুবই সন্দেহ এবং ভূগোষ্ঠের হয় না। হয়ত তাই ভূমির এই ক্ষয়ের কথা হয় বাতাবিক ক্ষয়। প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় মাটি পঠন প্রক্রিয়ায়ই একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়। মাটি পঠন ও ভূমিক্ষয়ের মধ্যে একটি ভিন্নতারা রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ভূমিক্ষয়ের কালে কৃষিকাজ একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে।

প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয়ের প্রেক্ষিত

ভূমিক্ষয়কে প্রধানত দুই প্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। কলা:

ক. ভূগোষ্ঠজনিত ভূমিক্ষয় এবং

খ. বায়ুপ্রবাহজনিত ভূমিক্ষয়

ক. ভূগোষ্ঠজনিত ভূমিক্ষয় : ভূগোষ্ঠের কারণে বাংলাদেশে ব্যাপক ভূমিক্ষয় হয়। এই ভূমিক্ষয়কে নিচের চারটি প্রেক্ষিতে ভাগ করা যায়:

i) আভ্যন্তরীণ ভূমিক্ষয়

ii) বিল ভূমিক্ষয়

iii) নদী বা গালি ভূমিক্ষয়

iv) নদী জলস্রাব

নিচে এই ভূমিক্ষয়গুলোর আলোচনা করা হলো:

i) আভ্যন্তরীণ ভূমিক্ষয় : যখন বৃষ্টি পানি বা সেচের পানি উঁচু স্থান থেকে ঢাল বেয়ে জমির উপর দিয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তখন জমির উপরিভাগের সার ও উর্বর মাটির কণা কেটে পাড়লা আবেগের বা আভ্যন্তরীণের মধ্যে চলে যায়। একেই কলা হয় আভ্যন্তরীণ ভূমিক্ষয়। বৃষ্টির কালে যে ভূমিক্ষয় হয় তা সহজে চোখে পড়েন। কিন্তু কয়েক বছরের পর যোকা যায় যে জমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে। আর এর কারণ হলো আভ্যন্তরীণ ভূমিক্ষয়।

ii) বিল ভূমিক্ষয় : বিল ভূমিক্ষয় আভ্যন্তরীণ ভূমিক্ষয়েরই দ্বিতীয় ধাপ। প্রচুর ভূগোষ্ঠের কালে পানি বেশি বলে জমির ঢাল বরাবর লবাকৃতির রেখা সৃষ্টি হয়। যা অনেকটা হাতের রেখার মতো। এই ছোট ছোট রেখা কালক্রমে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বৃদ্ধি পাবে। বৃষ্টির পানির প্রাচুর্যের উর্বর মাটি জমি থেকে স্থানচ্যুত হয় কালে জমি উর্বরতা হ্রাস এবং কৃষি বহনশক্তি ব্যবহারেও অসুবিধার সৃষ্টি করে।



চিত্র : বিল ভূমিক্ষয়

iii) নদী বা গালি ভূমিক্ষয় : এই ভূমিক্ষয় আভ্যন্তরীণ ভূমিক্ষয়ের তৃতীয় ধাপ। অর্থাৎ বিল ভূমিক্ষয় থেকেই নদী বা গালি ভূমিক্ষয়ের উদ্ভব। দীর্ঘকাল ধরে বিল ভূমিক্ষয়ের কালে এর ছোট ছোট নালারূপে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর কালের মাটিও বেশি ক্ষয় হতে থাকে। একসময় এগুলো নদী বা ছোট নদীর মতো দেখায়। ভূগোষ্ঠের পরিমাণ বৃদ্ধি হলে নদী বা গালি ভূমিক্ষয় ততই বেশি হবে। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে এখন ভূমিক্ষয় দেখা যায়।

iv) নদীভাঙন : নদীভাঙন বাংলাদেশের জমিকরের একটি উদ্বেগবোধ্য কারণ। টাঙ্গপুর, শিরাঙ্গপুর, গোয়ালন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতি বছরই নদীভাঙনে শত শত হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে। বর্ষার শুরুতে কিংবা বর্ষার শেষে নদীতে প্রবল প্রোত সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে নদীতীরের কৃষিজমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।



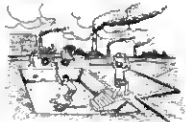
চিত্র : নদী ভাঙন

খ. বাতুলনাক্রান্তিত জমিকর

পতিশীল বায়ু প্রবাহে কর্তৃক এক স্থানের মাটি অন্যত্র বয়ে নেয়ার প্রক্রিয়াকে বাতুলনাক্রান্তিত জমিকর বলে। যেসব এলাকা সমতল, ভূতলমূলকভাবে গাছপালা কম এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম, সেসব এলাকায় বাতুলনাক্রান্তিত কারণে জমিকরের প্রকোপ দেখা যায়। যেসে ও যেসে সোতীশ মাটি আদলা ও হালকা। কাজেই প্রবল বেগে বায়ুবহিত হলে এসব মাটি সহজেই উড়ে যায়। আর যে স্থানে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ একেবারেই কম সে স্থানের বাতুলনাক্রান্তিত জমিকর আরও বেশি।

ময়ূরুসিতে বাতুলনাক্রান্তিত জমির ক্ষেত্রে বাসি নিষ্ক্ষেপ করে অনুর্য করে ফেলে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে শিরাঙ্গপুর - রাজশাহী অঞ্চলে চৈত্র, বৈশাখ মাসে বাতুলনাক্রান্তিত জমিকরের প্রকোপ সাধারণ দেখা যায়। এর ফলে বায়ু প্রবাহে অবশিষ্ট জমির উর্বরতা করে যায়।

২। ময়ূর কর্তৃক জমিকর : ময়ূরের বাঁচর জন্যে খালের প্রয়োজন। খাল উৎপাদনের জন্যে ময়ূর মাটিকে যথেষ্ট ব্যবহার করে আসছে কৃষি সমাজায় সুচলার থেকে। জমিকর্ষণ, পানি সেচ, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজে কৃষিকারের মূল অংশ। এ কাজগুলো ঘরা মাটিতে প্রতিমিত্র উৎপাদন করা হচ্ছে। ফলে জমিরূপে প্রাকৃতিক শক্তির অর্থাৎ বৃষ্টি ও বাতাসের নিকট উদ্ভেদিত করছে এবং ক্ষয় হচ্ছে। মাটিকে মত ব্যবহার করা হবে ততই এর ক্ষয় হতে থাকবে। অন্যক্ষেত্রে মাটি বৃষ্টি, বায়ু, কন্যা, একসোয় আক্রমণের শিকার। পার্শ্বিকি একসোয় ক্ষয় চাষের ফলে



চিত্র : ময়ূর কর্তৃক জমিকর

বা খাপ করে চাষ করার ফলে মাটি আদলা হয়ে যায়। মূলধনায় বৃষ্টির ফলে সেখানকার মাটিতে পাহাড়ি খস নামে। এতে বিপর্যয় আকারে জমিখন হয়। ক্ষু ভাই নয়-এতে জল মালেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভা'হা'দা পর্বতপিত্ত বিভবকালে অনেক মূল্যবালি উড়ে যায়। মেরোমবে চলার সময়ও মূল্যবালি উড়ে।

জমিকরের ক্ষতির বিভিন্ন দিক

জমিকরের ক্ষতিকর দিকগুলো নিম্নরূপ:

- (১) জমিকরের কারণে জমির পুষ্টিসমৃদ্ধ উপরের স্তরের মাটি অন্যত্র চলে যায়। ফলে মাটির উর্বরতার ব্যাপক অপচয় হয়।

- (২) জমিকরের কলে মচিত্রে পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। কলস্রুতিতে কলসের বৃদ্ধিতে ব্যাধাত ঘটে।
- (৩) ক্রমশঃ জমিকরের কারণে নদী-নালা, হাওর-মিল ভরাট হয়ে যায়। ফলে সেখানে প্রায়ই বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে কলস, পলপশি, বাচ্চিকরের অনেক ক্ষতি হয়।
- (৪) জমিকরের বিরাট অংশে নদীতে জমা হয়। এতে নদীর গভীরতা কমে যায় এবং নৌ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।
- (৫) এবার আদম যে উপর মাটির ক্ষয় সত্যকার ক্ষয়।

জমিকরের কারণ

অনেক কারণেই জমিকর হয়। উপরের জমিকরের প্রধান থেকেও অনুধাবন করা যায় জমিকরের কারণ কী কী। নিচে জমিকরের কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (১) বৃষ্টিপাত | (২) জুঁনি ঢাল |
| (৩) মাটির প্রকৃতি | (৪) শস্যের প্রকৃতি |
| (৫) জরি চাষের পদ্ধতি | (৬) শিবিড় চাষ |
| (৭) বাহু | (৮) হালুখের কার্যাবলি। |

বৃষ্টিপাত: বৃষ্টিপাত চাষ-বাসের জন্য যেমন ভালো তেমনি জমিকরের প্রধান কারণ। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, সংখ্যা ও পরিমাণ জমিকরকে প্রভাবিত করে। দুকলস্রুতির বৃষ্টি হলে বৃষ্টির তেঁটি বড় হয় এবং মাটিতে সলোরে বাখাত করে আর একে মাটির কলস্রুতি হয়। মাটি বদল পানি শোষণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন অতিরিক্ত পানি একটি প্রকারে সৃষ্টির মাধ্যমে উপর থেকে অশোষণীয় নিচের দিকে ধাবিত হয়। যাওয়ার পথে পানির সঙ্গে অলস্রুতি ও নরম মাটি ছানোভরিত হয়। পানির বেগ বড় বেশি হলে মাটির ক্ষয়ও ভয় বেশি হবে।

জুঁনি ঢাল: অধিক ঢালু মাটিতে অধিক বেগে পানি নিচের দিকে ধাবিত হয়। একজন পার্শ্বত্যা এলাকার সমস্ত এলাকার চেয়ে জমিকরের পরিমাণ বেশি। বাংলাদেশের হালুখবন, বাপড়ামহি ও হাওরাটি এলাকার সাধারণত জুঁনি চাষ করা হয়। কলে জুঁনি চাষ এলাকার মাটি খালসা হয় এবং বৃষ্টিপাতের ফলে এই মাটি বৃষ্টির পানির সাথে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে ঢলে যায়। অতএব বছরের মধ্যে জুঁনি চাষের স্থানটি অধুনা হয়ে পড়ে।

মাটির প্রকৃতি: জমিকর মাটির কাঠামো, কুনট ও জৈব পদার্থের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। খেসে-মোআশ মাটি অধিক সক্রিয়তা হলে সম্পূর্ণ বৃষ্টির পানি সহজেই হলে নিচে পড়ে। তাই এই মাটির জমিকর কম। কিন্তু কাঁচা ও ভারী মাটি সক্রিয়তা কম থাকায় এর শোষণক্ষমতাও কম। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেও মাটির উপরে পানি জমে যায় এবং জুঁনি ক্ষয় করে মাটি নিচের দিকে ধাবিত হয়।

চাষ পদ্ধতি ও শস্যের প্রকৃতি: পাহাড়ি জমিতে চাষের আকস্মিক চাষ না করে বসি ঢালেন বরাবর চাষ করা হয়, তবে বৃষ্টিপাতের ফলে জমিকর হয়। বাঁকা পাহাড়ের পায়ে বাঁধ সৃষ্টি করে কলসের চাষ করা হয়। কিন্তু যদি তা না করে সাধারণভাবে জমি চাষের চেষ্টা করা হয় তবে পাহাড়ি জমিদান বা জমিকরের শিকার হয়। জমি যত দূর চাষ করলেও জমিকর হয়।

যেসব কলস মাটি ঢেকে রাখে, সেগুলো মাটিতে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন টিলাবাদাম, মাসকলাই, খেসারি ইত্যাদি। কিন্তু আশ, তুটী, খান, পল ইত্যাদি প্রাথমিক পর্যায়ে মাটিকে ঢেকে রাখেনা। ফলে জমিকর হয়।

বাই গ্রবাই : যে অঞ্চলে পাহালা কম সে অঞ্চলে বায়ুগ্রবাই বাতাস কৃষিকর হয়। বাংলাদেশের রাজশাহীও দিনাজপুর অঞ্চলে এরূপ কৃষিকর হয়।

মানুষের কার্যবলি : কৃষিকরের একটি কারণ মানুষ নিজে। স্থায়ী অন্ন যোগাড় করতে মানুষ জল পরিষ্কার করেছে শুষ্ক করে। তাতে মাটির উপরিস্থ উল্লুহ হয় এবং কৃষিকরেরও সূচনা হয়। আছাতা মানুষ বরষাতি, বর্ষাঘাট ইত্যাদি নির্ধারণ করেছে কৃষিকরমি বিনষ্ট করেছে এবং কৃষিকর করেছে।

কৃষিকরগোণের কার্যকরী উপায়সমূহ

কৃষিকরের অন্যতম একটি প্রযুক্তি হলো কৃষিকরগোণ করা। এই প্রযুক্তি কৃষিকর গোণের কতগুলো পদ্ধতির সমষ্টি। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

পানিগ্রবাই প্রসারণ

- ১) কৃষিকর কমাতে পানি গ্রবাইয়ের বেশ কমানো অনুষ্ঠি। বিভিন্নভাবে পানি গ্রবাইয়ের বেশ কমানো যায়। যথা, বাঁধ বা আল দিলে পানির বেশ কমে আসে, মাটি পানি শোষণের সময় পায় ও কৃষিকর বেশ হয়।
- ২) বিল কৃষিকরের কমে যে যেটি যেটি নাগার সৃষ্টি হয় তা ভরাট করে সমান করে দিলে পানির বেশ কমে যাবে এবং কৃষিকরও বেশ হবে।
- ৩) বড় নাগার মধ্যে আশাছ জলাভূমি সেতুর এক শেষ প্রান্তে খুঁটি পুতে ডালের জাল বঁসলে পানির বেশ কমে যাবে।
- ৪) উপরোক্ত ডালের জালের সুপে বড়কুচী কেপলে পানির বেশ একেবারেই মছর হবে এবং কৃষিকর বেশ হবে।

পানি শিকারসের সুবন্দোবস্তকরণ

জমিতে পানি জমা থাকলে এর সাথে বৃষ্টির পানি যোগ হলে প্রচুর সৃষ্টি হয় এবং জমির মাটি আলপা হয়ে সারে যায়। কাজেই কৃষিকরমি কয়েক খণ্ডে জল করে ব্রুতি খণ্ড হতে পানি সরাস্রে জমির এপ্রণ ক্ষয়হীন করা সম্ভব হবে।

জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কৃষিকরম

জমিতে জৈব পদার্থ অধিক মাত্রার প্রয়োগ করলে মাটির লবণবদ্ধন হলে হয়। বৃষ্টির পানি মাটিকে কম লা করে সহজেই নিচের নিচে চলে গেছে পারে। যে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম সে জমির মাটি সহজেই কম হয়।

পাছাতে খাণে খাণে কল চাষ করা

জমি চাষের কলে পাছাতেই মাটি সহজেই আলপা হয় ও কৃষিকর হয়। জমি চাষ না করে যদি পাছাতের পারে চতুর্দিক ঘিরে সমতল চিড়ি বা ধপ করে চাষাবাস করা হয় তা হলে বৃষ্টির পানি পাছাতের মাটির ক্ষয় করতে পারবে না।

কস্টোর পদ্ধতিতে চাষ করা

এই পদ্ধতিতে পাছাতের ঢালের আড়াআড়ি সমন্বিত লাইনে জমি চাষ করা হয়। ঢালের আড়াআড়ি জমি চাষ হয় বলে বৃষ্টির পানির গতি কম হয়। মাটি স্থানান্তরিত না হলে কস্টোর পোড়ান মাটিকে থাকে।

কাজ : ১. শিকারীবা নিজ এলাকার কৃষিকরমি কতের কারণ এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে।

২. শিকারীবা লগদতভাবে কৃষিকর গোণে সহজলভ্যকূলক পোড়ান লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ বীজ সংরক্ষণ

বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া

বীজ উৎপাদন থেকেই বীজ সংরক্ষণের শুরু। জমিতে এর বপন বা রোপণের মাধ্যমে বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শেষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে বীজ সংরক্ষণ কালতে বীজের উৎপাদন, তকানো, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ, বিপণন যাকতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা থেকেই বোঝার।

বীজ সংরক্ষণের পর্যায়সূত্র

বীজ উৎপাদন

বীজ শস্য উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মনে রাখা মরকার:

- ১) কেবল বীজের জন্যই ফসলের চাষ করা;
- ২) নির্বাচিত জমির আশপাশের জমিতে ঐ নির্দিষ্ট বীজ ফসলের অন্য জাতের আবাদ না করা;
- ৩) বীজ উৎপাদনের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিক্রিয়া থেকে বীজ সংগ্রহ করা;
- ৪) বীজের চারা বৃদ্ধিকালে জমি থেকে ভিন্ন জাতের গাছ কুসে ফেলা;
- ৫) বীজের ক্ষেত ঘন বন পরিদর্শন করা যাতে (ক) আশ্রয় লবন (খ) ভিন্ন জাতের গাছ ফোলা ও (গ) রোগ-বালাই ও পোক-মাকড়ের উপস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া যায়;
- ৬) ফসলের পরিপক্বতায় মিকে দৃষ্টি রাখা;
- ৭) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে ফসল কাটা, হাঙাই করা ও ভাঙা।

বীজ তকানো

বীজকে শীর্ণাধু দাস ও পোকের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বীজকে তকানো প্রয়োজন। বীজের জীবনীশক্তি ও অক্সিডেশন ক্ষমতা হাকৃততে বীজ তকানোর কোনো বিকল্প নেই। প্রকৃতপক্ষে বীজের অর্পিতা একটি স্ট্যান্ডার্ড মাত্রার আনার জন্যই বীজ তকানো হয়। ক্ষেত থেকে বন্দ ফসল কাটা হয় তখন এর অর্পিতা থাকে ১০% থেকে ৪০% পর্যন্ত; এই অর্পিতা বীজের জীবনীশক্তি না হয়ে ফেলে। তাই বীজকে পরবর্তী যৌনমে ব্যবহারের নিমিত্তে বীজের অর্পিতাকে ১২% বা তার নিচে রাখিয়ে আনা আবশ্যিক। আর এ জন্যই বীজ তকানোর প্রয়োজন হয়।

বীজ তকানোর পদ্ধতি

দুই প্রকারে বীজ তকানো যায়। যথা: (১) প্রকৃতিক বা স্বাভাবিক বাতাসে তকানো এবং (২) উত্তপ্ত বাতাসে তকানো।

বীজের চারিপার্শ্ব বাতাসের অর্পিতা যদি বীজের অর্পিতা থেকে বেশি হয় তবে বাতাস থেকে অর্পিতা বীজের মধ্যে প্রবেশ করে হতফল পর্যন্ত না বীজ ও বাতাসের অর্পিতা সমান হয়। বীজের অর্পিতা প্রয়োজনীয় মাত্রায় রাখতে হলে চারিপার্শ্ব বাতাসকে তকানো রাখা প্রয়োজন।

বীজ তকানোর সময় নির্ভর করে (১) বীজের অর্পিতার মাত্রা (২) বাতাসের তাপমাত্রা ও অর্পিতার মাত্রা (৩) বাতাসের গতি এবং (৪) বীজের পরিমাপের উপর।

মনে রাখতে হবে যে, (১) বেশি তাপমাত্রার বীজ শুকালে বীজের সবুজ ক্ষতি হয়। যেমন- বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়। (২) অপর্যাপ্ত তাপে বীজ শুকালেও একই রকম ক্ষতি হয়। অর্থাৎ বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়।

পরিমিত তাপে শুকতার সাথে বীজ শুকালে-

- সর্বোচ্চ মানের বীজ পাওয়া যায়।
- বীজ দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়।
- বীজের ব্যবসায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ

ফসল কাটার পর ফসলের সাদাকে বীজে পরিণত করা এবং পরবর্তী বপনের পূর্ব পর্যন্ত বীজের উন্নতমান ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য বীজের সর্বপ্রকার পরিচর্যাকে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। বীজ শুকিয়ে মাস ও আকার অনুযায়ী তালু করা এবং সর্বশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ।

বীজকে সুদৃঢ়ভাবে প্রক্রিয়াজাত করলে যে সুফল পাওয়া যায়

- ১) বীজের বিকস্মতা বৃদ্ধি পায়।
- ২) বীজ দেখতে আকর্ষণীয় হয়।
- ৩) বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে।

বীজের মান নিয়ন্ত্রণ

বীজের মান নিয়ন্ত্রণ বলতে কৃষিতাত্ত্বিক ক্যাম্বোলীশন প্রয়োগ করে বীজ উৎপাদন হয়েছে কি না, সঠিকভাবে ফসল কর্তন, হাড়াই ও হাড়াই হয়েছে কিনা, সঠিকভাবে বীজ শুকিয়ে নির্দিষ্ট আর্দ্রতার মানা হয়েছে কি না বোঝায়। প্রতিটি কাজেই বীজের ওপাওপ নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা রয়েছে।

বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করা আবশ্যিক।

একটি বীজের নমুনার মধ্যে (১) বিতর্য বীজ (২) ঘাসের বীজ (৩) অন্যায় শস্যের বীজ ও (৪) পাথর থাকে। এই চারটি ভাগের মধ্যে বিতর্য বীজের শতকরা হার বেশি করাই বীজের বিতর্যতা পরীক্ষা।

বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা

নমুনা বীজের শতকরা কতটি বীজ গরম তা বের করাই বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা। যখন বীজের অর্ধেক ৩৫ - ৬০% বা তার উপর হয় তখন অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। এর হার শতকরায় প্রকাশ করা হয়। ১০০ টি বীজ তাপে একটি বেলে ম্যাট্রিপূর্ণ হাটির পাঠে রেখে বা পানি খারা ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রতিদিন দেখতে হবে পানি যেন শুকিয়ে না যায়। নির্ধারিত সময় পরে বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হবে। যতটি বীজ গজাবে ততটি হবে বীজের অঙ্কুরোদগম হার।

বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা

বীজ থেকে অর্ধেক বের করে দিগে ততো কতটুকু অর্ধেক তাহে তা জানবার পদ্ধতিকে বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা বলা হয়। তা শতকরায় হারে নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{সূত্র: আর্দ্রতার শতকরা হার} = \frac{\text{নমুনা বীজের ওজন} - \text{নমুনা বীজ শুকাবার পর ওজন}}{\text{নমুনা বীজের ওজন}} \times 100$$

सोडियम धीरमेवति श्रीपुत्र

এই পরীক্ষার জন্য বীজ গম্বাণের একটি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এই প্রতিকূল অবস্থায় যে বীজ বেশি গম্বাণে সে বীজেরই জীবনীশক্তি বেশি বলে প্রতীক্ষ্যার হয়ে।

दीर्घ विप्लव

বীজ বিপণন বীজ প্রযুক্তির একটি উদ্ভাবনোপায়। বীজ বিপণন বলতে বীজ সংরক্ষণ, প্যাকেজ করা, বিকি-পূর্ব সংরক্ষণ, বিজ্ঞপ্তি, বিকি এবং ক'লকে এক কথায় বিপণন বলে। বীজ বিপণনকালে প্রেক্ষাপটের নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করতে হবে।

- বীজের জাত নির্ধারণ
- বীজের পরিমাণ নির্ধারণ
- বীজ অনুপোষণমূলক বা প্রত্যক্ষ কি বা
- বীজের অম্লরোপণের হার
- বীজের বিস্ফোরণের হার
- বীজের আর্দ্রতা
- বীজের জীবনকাল
- বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার নাম
- বীজ অনুপোষণ সংস্থার নাম
- বীজ বণ্টনের শক্তি
- সংরক্ষণের নির্দেশ
- বীজের মূল্য

বীজ সংরক্ষণের কাজ

বীজ জীবন অনুবৃত্তিবদ্ধ। একটি অসংকীর্ণতা জন্য বিপুল পরিমাণে বীজ নষ্ট হয়। কৃষকরা তার নিজস্ব অবিচ্ছিন্ন অনুবৃত্তি বীজ সংরক্ষণ করেন। একটাই উদ্দেশ্য সাধনের পৌনঃপুন্যে যাতে সুস্থবল বীজ বাজারে বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু তবুও উদ্ভদের বীজের জীবনীশক্তি বাড়ে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। ফলস্বরূপে মাছাই ও পরিবহনকালেই বীজ নষ্ট হয় বেশি। ইস্রু, পাণি, হুমাত, অর্থাৎ উদ্ভাবিত সরলে প্রায় সম ভাগ ফলস্বরূপ নষ্ট হয়। এছাড়াও বীজের সাথে ধূলাবালি, নীচি পাথরও বীজের সংশ্লিষ্ট নষ্ট করে।

বীজ সংরক্ষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বীজের গুণবৈশিষ্ট্য রক্ষা করা এবং বেসব বিধার বীজকে অতি দ্রুত পাবে সেগুলো সম্পর্কে সর্বাঙ্গ হওয়া ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

वीर्य गहनधारणं भवति

বাংলাদেশে বীজ সংরক্ষণের অনেক পদ্ধতি আছে। এক এক কসমেব বীজের জন্য এক এক ঠকম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন দাশগুপ্তী-র শকট-ধান, গম, ছুটী, বীজের জন্য ধানপোলা, ডোল বাড়ির পায়ে, চট্টের সন্ধা, পলিযোগ্য ও হেড ব্যবহার করা হয়।। সিনে কলস সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের কথা হলো।

वीर्य चर्याना च भर्तुः कर्मा महेन्द्र

বীজ চকানো অর্থ হচ্ছে বীজ থেকে অন্তর্নিহিত অর্ধেকটা সরানো এবং পরিমিত বাতায় আনা। অর্ধেকতার মাত্রা ১২ - ১৩% হলে ভালো হয়। বাংলাদেশে বীজ চকানো হয় গ্রোয়ে বা সূর্যতাপে। এই অর্ধেকতা ১২-১৩ পদার্থে মাত্রায়ে বীজতলোকে প্রায় তিনগুণ প্রকার রঙেতে তলাতে হয়। গ্রিনমতো চকিরেছে কিনা তা বীজে কামড় দিয়ে পরখ করতে হবে। বীজে কামড় নেওয়ার পর যদি 'কট' করে আওয়াজ হয় তবে মনে করতে হবে বীজ ভালোমতো চকিরেছে। অতঃপর বীজতলোকে চট্টার বস্তার নিয়ে গোলা মতো রাখা হয়। বীজ গোকার উপস্থর থেকে হাকার জন্য বীজের বস্তার নিম্নের পাতা, নিম্নের পিকড়, আগলে বীজের চট্টা, বিপকাটালি ইত্যাদি বেগানো হয়।

ধানশেলার সংরক্ষণ

ধান সংরক্ষণের জন্য ধানের শেলা ব্যবহার হয়ে থাকে। ধান শেলার অন্ততন কীটের পরিমাণের উপর নির্ভর করে নির্মাণ করা হয়। বীজ রাখার আগে ধান শেলার ভিতরে ও বাইরে পোবর ও মাটির মিশ্রণের গ্রাসেপ দিয়ে বীজ রাখার উপযুক্ত করতে হবে। বীজগুলো এমনভাবে ভরতে হবে যেন এর ভিতর কোনো বাতাস না থাকে। সেই জন্য ধানশেলার সুখ বন্ধ করে এর উপর পোবর ও মাটির মিশ্রণের গ্রাসেপ দিতে হবে।

ডোলে সংরক্ষণ

ডোল আকারে ধান শেলার চেয়ে ছোট। ডোল ধানশেলার চেয়ে কম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ পাত্র। এটি বাঁশ বা কাঠ দিয়ে শেলাকার করে তৈরি করা হয়। ধানশেলার মতোই ডোলের বাইরে ও ভিতরে পোবর ও মাটির মিশ্রণের গ্রাসেপ দিয়ে ডোলাভাবে ঢাকিয়ে বীজ রাখার উপযুক্ত করা হয়।

পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ

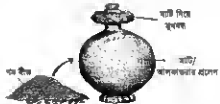
আজকাল পাঁচ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন পলিথিন ব্যাগে বীজ সংরক্ষণ করা হয়। এই ব্যাগ আরতিআরএস কর্তৃক উদ্ভাবিত। সাধারণ পলিথিনের চেয়ে বীজ রাখার পলিথিন অর্পোকাভূত বেটটি হয়। অতএব বীজ এমনভাবে পলিথিন ব্যাগে রাখতে হবে থাকে কোনো কীট না থাকে এবং ব্যাগ থেকে সম্পূর্ণ বাতাস বেরিয়ে আসে। অতঃপর ব্যাগের সুখ আগের সাহায্যে এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাইরে থেকে ভিতরে বাতাস প্রবেশের সুযোগ না থাকে।



চিত্র : ডোলে বীজ সংরক্ষণ

মটকার সংরক্ষণ

মটকা মাটি নির্মিত একটি শেলাকার পাত্র। গ্রাম বাংলার এটি বহুল পরিচিত। এটি বেশ পুরু এবং মজবুত। মটকার বাইরে মাটি বা ভালকাকার গ্রাসেপ সেতরা হয়। শেলা ঘরের সড়ক নিপাতি স্থানে মটকা থেকে এর ভিতর কোনো বীজ পুরোপুরি ভর্তি করা হয়। অতঃপর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে উপরে মাটির গ্রাসেপ দিয়ে বায়ুপ্রাচক করা হয়।



চিত্র : মটক কলসে বীজ সংরক্ষণ

মাক্তির কান্না : শিক্ষার্থীরা মাক্তির কলসে কীভাবে বীজ সংরক্ষণ করে সে শক্তির সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে প্রেপিতে লম্বা দিনে এবং উপস্থাপন করবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খাদ্য সংরক্ষণ

মাংসের খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মাছ চাষকে লাভজনক করতে হলে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাইরে থেকে সেওয়া সম্পূরক খাদ্য সরোপ করতে হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে যা খরচ হয় তার ঠাট শতকরা ৬০ তাপই খরচ হয় খাদ্য রচনা করতে। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে সাধারণত যে উপাদানগুলো ব্যবহার করা হয় তা হলো- চালের হুঁড়া, গমের ভুলি, সরিষার বৈল, ডিমের বৈল, ফিশমিল, পটু-ভালসের রক্ত ও মাড়ি-হুঁড়ি, জলজ উদ্ভিদ যেমন-কক্ৰিগালা, ভুলিগালা ইত্যাদি। এসব উপাদান প্রয়োজনমতো মিশ্রিত করে চাষিরা মন্থ্য খাদ্য তৈরি করে। কচিখানার তৈরি বংশিখিক খাদ্যও মন্থ্য খাদ্যের ব্যবহার করা যায়। যে ধরনের খাদ্যই মাছ চাষের পুকুরে ব্যবহার করা হোক না কেনো তার গুণগতমান ভালো হওয়া আবশ্যিক। খাদ্যের গুণগতমান ভালো না হলে সুস্থমনস গোলা ও মাছ হবে না, মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হবে এবং মাংসের মুক্তাঙ্কর অনেক বেড়ে যাবে। আবার মাংসের নুড়িও অংশিদুরণ হবে যা। খাদ্যের গুণগতমান ভালো রাখার জন্য যথাযথ নিয়মে খাদ্য উপকরণ বা তৈরি খাদ্য সংরক্ষণ ও গণায়াজ্যতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নলিখিত নিয়ামকসমূহ খাদ্য সংরক্ষণ ও গণায়াজ্যতকরণের সময় খাদ্যের গুণগতমান এবং এজনকে অক্ষিগ্রস্ত করে-

- ১। খাদ্যের অর্প্রজা: খাদ্যে অর্প্রজার পরিমাণ ১০% এর বেশি থাকলে ছত্রাক বা পোকা-মাকড় জগুতে পারে।
- ২। খাদ্যের অপ্রজিক অর্প্রজা: খাদ্যে অপ্রজিক অর্প্রজা ৬৫% এর বেশি থাকলে খাদ্যে ছত্রাক বা পোকা-মাকড় জগুতে পারে।
৩. জাপমাত্রা: অতিরিক্ত জাপমাত্রায় খাদ্যের পুষ্টিমান নষ্ট হয়। পোকা-মাকড়সমূহ ২৬-৩০° সে: জাপমাত্রায় খুব ভালো জগুতে পারে এবং এরা খাদ্য খেয়ে ফেলে ও তাদের ফলস্বরূপ করা ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক্তে পারে।
- ৪। সূর্যালোক: সূর্যালোকে খোলা অবস্থায় খাদ্য জখলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মারা করেক মিসিটের মধ্যে কিছু কিছু ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।
- ৫। অক্সিজেন: খোলা অবস্থায় খাদ্য রাখলে বাতাসের অক্সিজেন খাদ্যের রেসিডিটি (চর্বির জারন মিনা) হ্রাসতে পারে যা খাদ্যের গুণগতমানকে অক্ষিগ্রস্ত করে। অক্সিজেন ছত্রাক ও পোকা-মাকড় জগুতেও সহায়তা করে।

সঠিক খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

ক) তরকো খাদ্য ও খাদ্য উপাদান

- ১) খাদ্য বাহুরোধী পলিথিনের বা জটের অথবা কোনো সুখ বন্ধ পাত্রে ঈষা ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। সাথে সাথে এই খাদ্য পুনরায় গোলে গঠিয়ে নিলে ভালো হয়।
- ২) খাদ্য পরিচাষ, তরকো, নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যন্ত বাতাস চলারসের করে রাখতে হবে।

- ৩) ওলম্বা ঘরে সরেক্ষিত খাদ্য মেঝেতে না রেখে ১২ থেকে ১৫ সেমি. উপরে কাঠের পাটাতনে রাখতে হবে।
- ৪) পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যের বস্তুর খিটে এবং আশপাশে ছাই ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
- ৫) খাদ্য তিন মাসের বেশি ওলম্বা রাখা যাবে না। এর মধ্যেই এটি ব্যবহার করে ফেলা উচিত।
- ৬) ইস্রুর বা অন্যান্য প্রাণীর উপস্থিতিতে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৭) খাদ্য কীটনাশক ও অন্যান্য বিধাতক পদার্থের সংঘর্ষে রাখা যাবে না।

খ) অর্ধ/তৈরি খাদ্য উপাদান

- ১) খাদ্য তৈরির জন্য ডাঙ্গা গ্রেট হাফ হলে ডায়েনিক খাওয়ারতে হবে, অন্যথায় রেজিডারেটে রেখে দিতে হবে।
- ২) তৈরি/চর্বিযুক্ত খাদ্য কাছাকাছি রাখার বা অবশ্য পাত্রে নির্ধারিত তাপমাত্রার রেখে দিতে হবে।
- ৩) ডিটার্মিন ও বনিক লবনসমৃদ্ধ হারাস এবং অ্যাসোসিবিট্রিন পাত্রে রেজিডারেটে রেখে দিতে হবে।

কাছা শিকারীরা খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করবে এবং পেশটার পেশারে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ: রেসিডিউ

পতলাখির খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

কোনো খাদ্যের ওপাতন ও পুষ্টিমান ঠিক রেখে কবিতার ব্যবহারের জন্য খাদ্যকে প্রক্রিয়াকার করে রেখে দেওয়াতে খাদ্য সংরক্ষণ হলে। জাবার তৈরি করা পতলাখির ওপাতন ঠিক রাখার জন্যও ওলম্বাজাত করা মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।

খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশটির খাদ্যের বেশির ভাগ ভুঁই শস্যের উপজাত। এসব উপজাত শস্য মাড়াই বা শস্যাদান প্রক্রিয়াকার করার পর খাওয়া যায়। বর্ষা মৌসুমে অনেক খাদ্য উপজাত হওয়ায় আ পঞ্চাশতক খাওয়ানোর পরও অতিরিক্ত থেকে যায়। জাবির শীতকালেও অতিরিক্ত শিম পোড়ান খাদ্য উপাদান হয়। তাই এই অতিরিক্ত খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। বর্ষা খাদ্যের অর্জন হতে তখন এই সংরক্ষিত খাদ্য পঞ্চাশতক সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যকে রোগজীবাণু ও পচনের হাত থেকে রক্ষা করা। পতলাখির দানাদার খাদ্যকে অর্ধাংশ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সংরক্ষণ করে বেশি দিন ওপাতন ঠিক রেখে সংরক্ষণ করা যায়। খাদ্যের অর্ধাংশ বেশি হলে এতে ছত্রাক জন্মায়। ছত্রাক জন্মানো খাদ্য খেলে পতলাখির মধ্যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কলে অনেক সর্ব পত্র অসুস্থ হয়ে কৃত্রিমকরণ করে।

খাদ্য সংরক্ষণের উপায়ের বিভিন্ন ধাপসমূহ

ক) যে তৈরির মাধ্যমে সবুজ খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও নিম্নে যে তৈরির বিভিন্ন ধাপগুলো দেওয়া হলো-

- ১। যে তৈরির জন্য শিম পোড়ান খাদ্য যেমন, সবুজ খেসারি, মাসকলাই বেশি উপযোগী।

২। ফুল আসার সময় ঘাস কাটতে হয়।

৩। ঘাস রোমে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১৫-২০% এর মধ্যে রাখা হয়।

৪। ঘাস শুকিয়ে সাচর উপর শুশুপাকারে বা মাল্যাকৃত করে সংরক্ষণ করা হয়। খ) সাইলেন্ড তৈরির মাধ্যমে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাইলেন্ড তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
কবুও নিম্নে সাইলেন্ড তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো-

১। সাইলেন্ড তৈরির জন্য ছুই, পেমিয়ার, খিনি ঘাস বেঁধে উপযোণী।

২। ফুল আসার সময় রসাল অবস্থায় ঘাস কাটতে হয়।

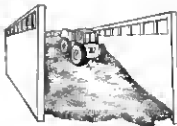
৩। ঘাস কেটে বাহুনিরোধক স্ট্রো বা সাইলো পিটে রাখা হয়।

৪। সাইলো পিটে ঘাস রাখার সময় কোলাকড়ের ঠাব দিট্টে দিতে হয়।

৫। ফারপর বাহু ঢোলায় বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।



চিত্র। সাইলেন্ড তৈরির জন্য ছুই: কাটন উপযুক্ত অবস্থা



চিত্র। সাইলো পিটে সবুজ ঘাস পরিপূর্ণ করা হচ্ছে

গ) বড় তৈরির মাধ্যমে কসলের বর্গী সংরক্ষণ করা হয়। অমাদের দেশে বেশিরভাগ কৃষক পরিবারে গরুর জন্য খাদ্য হিসাবে বড় ব্যবহার করা হয়। গরুর দৈনিক ৩-৪ কেজি শুকনো বড় দেওয়া হয়। এটি আঁশজাতীয় খাদ্য। নিম্নে বড় তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো-

১। শস্যপাছ (ধান, ভুট্টা, খেসারি ইত্যাদি পাছ) ক্ষেত থেকে কাটার পর সেগুলো মড়াই করে শস্যপাছ আলাদা করে ফেলা হয়।

২। বর্গী গছগুলো রোমে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১৫-২০% এর মধ্যে এনে বড় তৈরি করা হয়।

৩। বড় সাধারণত গাদা করে রাখা হয়।

ঘ) দানাশস্য ও বৈদ্যবীজের উপজাত সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়। ধান, গম, ভুট্টা, খেসারি, কলাই ইত্যাদি দানাশস্যের উপজাতসমূহ বেমন, চালের কুঁড়া, গমের ছসি, চালের খোলা, লো ইত্যাদি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়।

ঙ) কারখানায় প্রক্রিয়াকৃত করে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। বেমন, শোস্ট্রির জন্য দানাদার খাদ্য প্রক্রিয়াকৃত করে মেশ, পিলেট ও ক্রান্দ স্কিড তৈরি করা হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ মাছের সম্পূরক খাদ্য

মাছের সম্পূরক খাদ্যের পরিচিতি ও এরয়োজনীয়তা

নেমের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য মাছ পুকুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে কাইটোপ্রাংকটন (উদ্ভিদকণা), জু-প্রাংকটন (প্রাণীকণা) পুদিপানা, ছোট জলজ পতঙ্গ, পুকুরের তলদেশের কীট, লার্ভা, কঁকড়া, ছোট ছোট শামুক, ভিন্দুক, বৃত্ত জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিسابে গ্রহণ করে। কিন্তু মাছ চাষের ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য পুকুরে অধিক ঘনত্বে পোনা ছড়া হয়। এ অবস্থায় তপু প্রাকৃতিক খাদ্য মাছের স্ত্রুত বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উৎপাদন পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি সার প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক খাদ্য বৃদ্ধি করলেও তা যথেষ্ট হয় না। এক্ষণে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাহির থেকে অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হয়। একে সম্পূরক খাদ্য বলে। যেমন-ডালের ভুঁড়া, সরিষার তৈল, কিশু মিল ইত্যাদি। এসবকারি ও সরপুটি মাছ উদ্ভিদভোজী বলে এসেের জন্য পুদিপানা, ফুটি পানা, শাকসবজির নরম পাতা, ঘাস কেটে সম্পূরক খাদ্যের হিসাবে পুকুরে দেওয়া মাছ। মাছকে সরবরাহকৃত সম্পূরক খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন-অম্লিষ, রৌহ বা তেল, শর্করা, খনিজ লবণ ও ভিটামিনের মাত্রা যেন চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যে সম্পূরক খাদ্যের এ সকল পুষ্টি উপাদান যথাযথ মাত্রায় যোগে তৈরি করা হয় তাকে সুস্থ সম্পূরক খাদ্য বলে।

মাছের সম্পূরক খাদ্যের উৎস

মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান ব্যবহার করা হয়। উৎসের উপর ভিত্তি করে এসব উপাদানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ক) উদ্ভিদজাত খ) প্রাণিজাত। নিচে এসেের কিছু উপাদান দেওয়া হলো-

ক) উদ্ভিদজাত: উদ্ভিদজাত খাদ্য উপাদানের মধ্যে কিছু উদ্ভেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে- ডালের ভুঁড়া, গম ও ডালের মিহিসুসি, সরিষার তৈল, কিসের তৈল, লুচি, চিনিকড়, পুদিপানা, রসুন ঘরের উজিই, বিভিন্ন নরম পাতা যেমন- মিষ্টিমুড়া, কলাপাতা, বাঁধা কপি ইত্যাদি।

খ) প্রাণিজাত: প্রাণিজাত করেকটি খাদ্য উপাদান হচ্ছে জটকি মাছের ভুঁড়া বা কিশমিল, রেশম কীট মিল, চিড়ির ভুঁড়া (প্রিন্স মিল), কাঁকড়ার ভুঁড়া, মাঁকুর চুর্বি (খোন মিল), শংখুরের খাসে, পর্বাদিপত্র রক্ত (রোড মিল) ইত্যাদি।

সম্পূরক খাদ্যের উপকারিতা

- ১। মাছকে নিয়মিত সম্পূরক খাদ্যের সরবরাহ করলে অধিক ঘনত্বে পোনা ও বড় মাছ চাষ করা যায়।
- ২। অল্প সময়ে বড় আকারের সুস্থসবল পোনা উৎপাদন করা যায়।

- ৩। শোনার বাঁচার হার থেকে বার।
- ৪। মাহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- ৫। মাহের দ্রুত সৈনিক বৃদ্ধি পায়।
- ৬। মাহ পুষ্টির অন্তরঙ্গতার রোগ থেকে দূর থাকে।
- ৭। সর্বাধিক কল সময়ে জলাশয় থেকে অধিক মাহ ও অর্থিক সুলাভা পাওয়া সম্ভব হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সহজলভ্য করেকটি খাদ্য উপাদান সন্নিবেশ করে এবং উপাদানের নাম ব্যাখ্যা লিখবে।

মাহের পুষ্টি চাহিদা ও সম্পূর্ণক খাদ্য ভূমিকা

মাহের প্রজাতি, বয়স ও আকারের উপর নির্ভর করে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা বিভিন্ন হয়। প্রজাতি তেলে বিভিন্ন মাহের রেনু শোনার জন্য সেহেরে তাকনের ১০-২০%, আনুলে শোনার জন্য ৫-১০% এবং বড় মাহের জন্য ৩-৫% হারে সম্পূর্ণক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। লুহ-সকল মাহ ও এর দ্রুত সৈনিক বৃদ্ধির জন্য মাহের খাবারে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যোগ্য আবশ্যিক। এদের উপাদানের মধ্যে আমিষ বা প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাবহুল। এটি খাবারে বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। এজন্য মাহের পুষ্টি চাহিদা কলতে প্রখ্যাত আমিষের চাহিদাকে বোঝায়। মাহের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান যেমন-শর্করা, তেল ও খনিজ লবণ কম-বেশি বিদ্যমান থাকে। এদের খাদ্যে আমিষের চাহিদা পূরণ হলে অবশ্য পুষ্টি উপাদানগুলোর খুব একটা অভাব হয় না। খাদ্যে আমিষের এই চাহিদা প্রজাতি ও জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তর তেলে কার্প বা দুই জাতীয় মাহের জন্য ২০-৩০%, চিড়ির জন্য ৩০-৪৫% ও ক্যাটফিশ (ঘাঁশ বিহীন লতা ঠিকমত মাহ) বা মাহের জাতীয় মাহের জন্য ৩২-৪৫% থাকে।

একটি পুষ্টি সম্পূর্ণক খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে যখন মাহ উপাদান করা হয় তখন ঐ খাদ্য কী পরিমাণে মাহ করা ব্যবহৃত হচ্ছে (মাহ খাচ্ছে) এবং তা থেকে কী পরিমাণে মাহ উপাদান হচ্ছে তা খাদ্য রূপান্তর হার বা একসিটার (Food conversion ratio, FCR) নির্ধারণের মাধ্যমে হিসাব করা যায়। এভাবে একাধিক খাদ্যের FCR নির্ণয় করে তুলনা করলে কোন খাদ্য অধিক ভালো তা বোঝা যায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে খাদ্য রূপান্তর হার বা একসিটার হচ্ছে খাদ্য প্রয়োগ ও খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবের সৈনিক বৃদ্ধির অনুপাত। অর্থাৎ ১ কেজি মাহ পেতে দত কেজি খাবার খাওয়ার হার, তাই খাদ্য রূপান্তর হার।

$$FCR = \frac{\text{মাহকে গ্রহণকৃত খাদ্য}}{\text{সৈনিক বৃদ্ধি}}$$

সৈনিক বৃদ্ধি = আহার্যকালীন খেট তাকন - মুহুরকালীন খেট তাকন

ধরা যাক, একটি পুকুরে কিছু মাছের পোনা ছাড়া হলো বার মোট ওজন ১ কেজি। নিয়মিত খাদ্য গ্রহণের পর ৬ মাস পর আহরণের সময় মোট ১৫ কেজি মাছ পাওয়া গেল। এ ৬ মাসে মোট ২১ কেজি খাদ্য গ্রহণ করা হলো।

$$\text{সুজন্য, } \text{FCR} = \frac{21}{15 - 1} = 1.4$$

FCR-এর মান সবসময় ১ এর চেয়ে বড় হয়। যে খাদ্যের FCR এর মান বড় কম সে খাদ্যের গুণগত মান তত ভালো অর্থাৎ, সে খাদ্য ব্যবহার করে অধিক বার উপাদান করা যায়।

ফার্ন বা কই জাতীয় মাছ চাষের ক্ষেত্রে নিম্নের উপাদানগুলোর হিসেবে সুখর সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়-

উপকরণের নাম	শতকরা হার (%)
ফিশমিল	১০-২১
সরিষার কৈল	৪৫-৫৩
চালের হুঁড়	২৮-৩০
জিটামিল ও বনিজলকণ	০.৫-১.০
চিটামুড় ও আটা	৫
মোট	১০০

মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে ভালো মান সম্পন্ন নির্ধারিত খাদ্য উপাদানসমূহ সংগ্রহ করতে হবে। উপাদানসমূহ প্রত্যেকভাবে আটা শেষা মেশানো বা টেকিরে ভালো করে চূর্ণ বা ভেঁড়া করে নিতে হবে এবং চালমি দিয়ে চেলে নিতে হবে। সূর অনুযায়ী খাদ্য উপাদানসমূহ একটি একটি করে মেশে নিয়ে বিস্তার মেশিনে বা একটি বড় পাট্রে ভালোভাবে মেশাতে হবে। মেশানো উপাদানগুলোতে পানি দিয়ে ভালোভাবে সেদ্ধে মগ তৈরি করতে হবে। এখন মগ ছোট ছোট বন্ডের মতো তৈরি করে ঢেঁকা বা অর্ধ খাদ্য হিসাবে মাছকে দিতে হবে। মাছকে সরবরাহকৃত খাবার পানিতে বেশি দ্বি-ত্রিশ মিনিটের জন্য বাইতায় হিলাবে আটা বা ময়লা বা টিটামুড় ব্যবহার করা যায়। ঢেঁকা বা অর্ধ খাবার প্রতিদিন গ্রহণের পূর্বে পরিমার্জন্যে তৈরি করতে হবে।

আবার এই মগ দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে বড় মূল্যে দেশীয় পিলেট মেশিনের সাহায্যে পিলেট বা দানাদার খাবার তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পিলেট বা দানাদার খাবার রোনে চকিরে দিতে হবে এবং পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য বায়ুপ্রাচী প্রাচীক ব্যাপে সুরক্ষণ করতে হবে। খেলে কিছু বিশাখ উপাদান থাকে, যা মাছের জন্য ক্ষতিকর। তাই খেলে একদিন পানিতে ডিঙ্কিয়ে রেখে ব্যবহার করতে হয়। খেলে ঢেঁকানো পানি মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে না। সুখর খাদ্য তৈরির জন্য নির্ধারিত খাদ্য

উপাদানের সাথে ০.৫-১% ভিটামিন ও খনিজ লবণের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ কিনতে পাওয়া যায়।

মাছের সম্পূর্ণ খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

- ১। মাছ দিনের বেলায় খাবার গ্রহণ করে। একসাথে মাছের পুকুরে দিনের প্রায়োগিক খাবার সমান দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকালে এবং অন্য ভাগ বিকালে দিতে হবে। অন্যদিকে চিড়ি নৈশজোড়ী বসে এসেবকে সন্ধ্যার বা রাত্রে খাবার দিতে হয়।
- ২। প্রচাতি জেদে বিভিন্ন মাছের সেনু পোনার জল মেহের ওজনের ১০-২০%, আনুসে পোনার জল ৫-১০% এবং বড় মাছের জন্য ৩-৫% হারে সম্পূর্ণ খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। পোনা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় ১ বাস এবং বিপ্রচাষের ক্ষেত্রে ১৫ দিন বা সাত ১ বাস জাল টেনে করে একটি মাছের পড় ওজন নিয়ে পুকুরে সর্বমোট কতটি মাছ ছাড় হতেছিল তা নিয়ে গণ করে পুকুরে যেট মাছের ওজন পাওয়া যাবে। এভাবে দৈনিক বৃদ্ধির সাথে সবসময় করে খাবারের পরিমাণ ঠিক করে দিতে হবে।
- ৩। পুকুরে গ্রাসকর্ষ ও সরপুটি চাষ করা হলে এসেবকে খুনিপাখা, কুটিপাখা, সবুজ বাস, মেসেজা, কুমুদিপাখার সরম অংশ ও বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা বেগুন-বাঁগাকপি, পুঁইশাক, কলাপাতা কেটে পুকুরে সরবরাহ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বাঁগের টুকরা বা পাছের ডালদিয়ে বর্ণাকারে একটি ফ্রেম তৈরি করতে হবে। ফ্রেমটি একটি খুঁটির সাহায্যে পুকুরের পাশে স্থাপন করতে হবে যেন এটি সবসময় একই স্থানে থাকে। এই ক্রিিং ফ্রেম বা ক্রিং-এ উপরোক্ত খাদ্য দিতে হবে। মাঝে মাঝে এটি পরিষ্কার করতে হবে।
- ৪। সকালে খাবার পানির উপরে দ্রুতই এবং অর্ধ বা ডেলা খাবার পানির ৩০-৬০ সেনি. দিবে স্থাপিত খাদ্য লাগি, ট্রে বা মালার প্রয়োগ করতে হবে। এতে খাদ্যের অপচয় কম হবে।
- ৫। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পুকুরের চারশাশে ০-৪ টি নির্দিষ্ট স্থানে খাবার দিতে হবে। এতে করে খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হবে।
- ৬। পীঠকালে মাছের বৃদ্ধি কম হর হলে খাদ্য প্রয়োগের হার স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক বা তিনভাগের একভাগ কমিয়ে আসতে হয়।
- ৭। পুকুর অত্যধিক সবুজ হয়ে গেলে খাবার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।
- ৮। খাদ্য প্রয়োগের ঘণ্টা সময় পর খাবার থেকে গেলে বুঝতে হবে খাদ্যের পরিমাণ বেশি হয়েছে। সেক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে।



চিত্র : বায়োসানি বা ঐ



চিত্র : কিলিং ফ্রেম/রিং

কাজ : শিকাগীরা নিকটস্থ যে কোনো মতলা বাঘায়ে গিয়ে বাঘের সম্পূর্ণ খাদ্য তৈরি করা এবং প্রায়শ পছন্দি দেখবে। এর উপর হাতিবেলন গিঁথে করা গিঁথে।

নতুন শব্দ : ব্লাক মিল, বোন মিল, ব্রিস্ক মিল, কিলিং ফ্রেম/রিং, বায়োসানি, বায়োক্যাক্সর হার (PCR)

পতপাখির সম্পূর্ণ খাদ্য

পতপাখির উৎপাদন মতলা বৃদ্ধির জন্য এসেছে প্রচলিত বাঘায়ের সাথে বিশেষ খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এতে পতপাখির প্রুত বৃদ্ধি ঘটে এবং পাত পরিপুষ্ট লাভ করে। পতপাখির মালে, ডিম ও পুখ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই পতপাখি পালনে সম্পূর্ণ খাদ্যের অধিক গুরুত্ব রয়েছে।



চিত্র : ইউরিয়্য মিশ্রিত পানি দ্বারা ভেলা বন্ধ



চিত্র : ইউরিয়্য মিশ্রিত পানি ঝড়ে মেশানো হচ্ছে

বিভিন্ন সম্পূর্ণ খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ পদ্ধতি-

ক) ইউরিয়্য মোলাসেস বন্ধ : ইউরিয়্যর সাহায্যে খত হাতিবান্যাকরণ-

উপকরণ

খড় : ২০ কেজি,

ইউরিয়া : ১ কেজি,

পানি : ২০ লিটার,

একটি মাঝারি আকারের পাত্র, বস্তা ও মোটা পলিথিন।

তৈরির পদ্ধতি

- ১। প্রথমে একটি বাসতিতে ১ কেজি ইউরিয়া ২০ লিটার পানিতে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ২। ডোলের চারদিকে পোক ও কালো মিশিয়ে লেপে তকিরে দিতে হবে।
- ৩। এবার ডোলের মধ্যে অল্প অল্প খড় দিয়ে ইউরিয়া সেখানে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- ৪। সমস্ত খড় সম্পূর্ণ পানি দ্বারা মিশিয়ে ডোলের দুখ বস্তা ও মোটা পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।
- ৫। দশ দিন পর খড় বের করে যেসে তকিরে সরেক্ষণ করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি

- ১। একটি গহুকে দৈনিক ২-৩ কেজি ইউরিয়া সেখানে খড় ব্যবহারে হবে।
- ২। বড়ুর সাথে দৈনিক ৩০০ গ্রাম ডোলা-খড় মিশিয়ে দিতে হবে।

খ) ইউরিয়া সোল্যসেস ব্লক : মনোলাব খালের সাহায্যে ইউরিয়া সোল্যসেস ব্লক তৈরিকরণ-

উপকরণ

গমের কুসি : ৩ কেজি

ফোলাগড় : ৬ কেজি

ইউরিয়া : ৩০ গ্রাম

লবণ : ৩৫ গ্রাম

খাবার চুন : ৫০০ গ্রাম

ভিটামিন মিনারেল মিশ্রিত : ৫০ গ্রাম এবং

কাঠের ছাঁচ (১ কেজি ব্লক তৈরির জন্য)



চিত্র : ইউরিয়া সোল্যসেস ব্লক তৈরির উপকরণ

তৈরির পদ্ধতি

- ১। প্রথমে একটি লোহার কড়াইকে সামান্য ভিটামিন মিনারেল মিশ্রণ ফোলাগড়ল ছাঁচ দিয়ে সামান্য দান করতে হবে।
- ২। কড়াই চুলা থেকে নামিয়ে এর মধ্যে ইউরিয়া, চুন, লবণ, গমের কুসি যোগ করে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

- ৩। এরপর ছাঁচের মধ্যে কিছু তুসি ছিটিয়ে মিশ্রিত দুগ্ধজলো ভরে ব্লক তৈরি করতে হবে।
- ৪। ব্লকগুলো শুকনো আলো বাতাসবুক ছায়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রদ্রাঘ পদ্ধতি

- ১। একটি পলুকে দৈনিক ৩০০ গ্রাম ব্লক জিহ্বা দিয়ে ফ্রেটে খেতে দিতে হবে।
- ২। প্রথমে ব্লক জিহ্বা দিয়ে ফ্রেটে খেতে না চাইলে ব্লকের উপর কিছু তুসি এ লবণ হিসিয়ে দিতে হবে।



চিত্র : ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক

গ) পচানিপাতক অ্যালজি বা পেপেলা খাওয়ানো

অ্যালজি: অ্যালজি বা পেপেলা এক ধরনের উদ্ভিদ যা অকস্মে এককোষী থেকে বহুকোষী হতে পারে। তবে এখানে দুটি বিশেষ প্রজাতির এক কোষী অ্যালজির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা বাবে। এদের মধ্যে প্রধান হলো ফ্রোকেলা। এরা সূর্যশোক, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জৈব নাইট্রোজেন আহরণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার বেঁচে থাকে। এরা বাংলাদেশের মতো উষ্ণ জলবায়ুতে দ্রুত বর্জনশীল।

অ্যালজির পুষ্টিমান

অ্যালজি অত্যন্ত সম্প্রদায়বাহ্য পুষ্টির খাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন-মৈদা, গুটি মাছের ভঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। শুষ্ক অ্যালজিতে শতকরা ৪০-৭০ ভাগ আমিষ, ২০-২২ ভাগ চর্বি এবং ৮-২৬ ভাগ শর্করা থাকে। এছাড়াও অ্যালজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং বিভিন্ন ধরনের বি ভিটামিন থাকে। অ্যালজি পানি ব্যবহার করে কম খরচে পলু হাঙ্গ এবং দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ

অ্যালজির বীজ, কৃত্রিম অগাধীর পুকুর বা জলাধার, পরিষ্কার বহু পানি, হাসকলই বা অন্যান্য ভালো তুসি ও ইউরিয়া।

অ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতি

- ১। প্রথমে সমতল ও ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃত্রিম জলাধার তৈরি করতে হবে। জলাধারটি লম্বা ৩ মিটার, চওড়া ১.২ মিটার এবং গভীরতা ০.১৫ মিটার হতে পারে। এর পাঙ্ক ইট বা মাটির তৈরি হতে পারে। এবার ৩.৩৫ মিটার, ১.৫২ মিটার চওড়া একটি বহু পলিখিন বিছিয়ে কৃত্রিম জলাধারটির তলা ও পাঙ্ক টেকে দিতে হবে। তবে জলাধারটির আরওন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে। তাছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাকিতে অ্যালজি চাষ করা যায়।

২। এরপর ১০০ গ্রাম মাসকালাই বা অন্য ডালের তুলিকে ১ মিটার পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে পলিটুকু সংগ্রহ করতে হবে।

এভাবে একই তুলিকে অন্তত তিনবার ব্যবহার করে পরবর্তীতে পলুকে খাওয়ারো যায়।

৩। এবার কুন্ডির পুকুরে ২০০ মিটার পরিমাণ কদের পরিষ্কার পানি, ১৫-২০ মিটার পরিমাণ অ্যালজির বীজ এবং মাসকালাই তুলি ভেজানো পানি ঢালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর ২-৩ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া নিয়ে উক্ত পুকুরের পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

৪। এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর, বিকালে করণকে তিনবার উক্ত অ্যালজির পানিকে নেড়ে দিতে হবে। পানির পরিমাণ কমে সেলে নতুন করে পরিমাণ হতো পরিষ্কার পানি যোগ করতে হবে। প্রতি ৩/৪ দিন পর পর পুকুরে ১-২ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া দিটাসে কলন ভালো হয়।

৫। এভাবে উৎপাদনের ১২-১৫ দিনের মধ্যে অ্যালজির পানি পলুকে খাওয়ারো উপযুক্ত হয়। এসময় অ্যালজির পানির ঝুপড় সবুজ বর্ণের হয়। অ্যালজির পানিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি পলুকে খাওয়ারো যায়। প্রতি ১০ বর্গমিটার পুকুর থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫০ মিটার অ্যালজির পানি উৎপাদন করা সম্ভব।

৬। একটি পুকুরের অ্যালজির পানি খাওয়ারো পর উক্ত পুকুরে আগের নিচম অনুমাত্রী পরিমাণ হতো পানি, সার এবং মাসকালাই তুলি ভেজানো পানি দিয়ে নতুন করে অ্যালজি চাষ শুরু করা যায়, এ সময় নতুন করে অ্যালজি বীজ দিতে হয় না।

৭। যখন অ্যালজি পুকুরে পানির ঝুপড় সবুজ বর্ণ থেকে বাগমি বর্ণ হয়ে যায় তখন বুকতে হবে যে উক্ত কালচারটি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে।

খাওয়ারো পদ্ধতি

১। সব বয়সের পলুকে অর্ধ ঘণ্টার, বাড়তি পলু, দুধের বা পর্বতী গাভী, হালের বলদ সবাইকে সাধারণ পানির পরিবর্তে অ্যালজির পানি খাওয়ারো যায়।

২। এ ক্ষেত্রে পলুকে আলাদা করে পানি খাওয়ারোয় প্রয়োজন নেই।

৩। অ্যালজি পানি মানিয়ার খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ারো যায়।

৪। অ্যালজির পানিকে পত্রর করে খাওয়ারো উচিত নয়, একে অ্যালজির খাদ্যস্থান নষ্ট হতে পারে।

৫। খাদ্যের এটি পলুর জন্য এটি কুন্ডির পুকুরে অ্যালজি চাষ করতে হয় যাতে একটির অ্যালজির পানি শেষ হলে পরবর্তীতে খাওয়ারোয় উপযুক্ত হয়।

ঘ) বাক্সের তৈরি সম্পূর্ণ খাদ্য : পতপাখির উৎপাদন চলমান রাখার জন্য এদেরকে বাক্সের তৈরি বিভিন্ন সম্পূর্ণ খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

১. আদিম সম্পূর্ণ খাদ্য - বোরন, প্রোটিন কম্বসেন্ট্রট

২. খনিজ সম্পূর্ণ - ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স

৩. খাদ্যগ্রাণ সম্পূর্ণ - ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স।

৩) বাছুরের সম্পূর্ণক খাদ্য তালিকা-

মিল্ক রিপ্লেসার (Milk Replacer) : বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এক ধরনের তরল পণ্যবাদ্য যাতে দুধের উপাদান থাকে এবং বাছুরের জন্য দুধের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। এতে ২০% আমিষ ও ১০% এর অধিক চর্বি থাকে। এর উপাদানসমূহকে গরম জ্বিল মিখে বা পানিতে মিশ্রিত করা হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি : বাছুরের বয়স অনুসারে দৈনিক ০.৫ থেকে ৩ লিটার পর্যন্ত খাওয়ানো যায়।

মিল্ক রিপ্লেসার (Milk Replacer) তৈরির একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রমিক	উপকরণ	রেশন-১ (%)	রেশন-২ (%)
১	জ্বিল মিছ	৬৫	-
২	জ্বিল মিছ পাউডার	-	৬
৩	পানি	-	৬০
৪	উত্তিক তেল	২০	২০
৫	হানার দুধ	১০	৯
৬	ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স	০৫	০৫
	মোট	১০০	১০০

কাল্ফ স্টার্টার (Calf Starter) : বাছুরের খাবার উপযোগী বিশেষ সন্মিলিত খাদ্য মিশ্রণ যাতে ২০% এর অধিক পরিমাণে আমিষ ও ১০% এর কম কাঁশযুক্ত খাদ্য থাকে। কাল্ফ স্টার্টারের একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রমিক	উপকরণ	পরিমাণ (%)
১	তুলাধীরা	৩৬
২	কুট্টা	৩০
৩	কব	১০
৪	হানার ভঁড়া	১০
৫	গমের ভুসি	১০
৬	হাড়ের ভঁড়া	১
৭	খাদ্য লবণ	১
	মোট	১০০

স্বাক্ষর : শিক্ষার্থীর পর্বাসিগতর বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি : বাছুরের বয়স অনুসারে দৈনিক ০.৫ থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত খাওয়ানো যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ধরনের হাটিকে আলু উৎপাদন বেশি হয় ?

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| ক. সোরাঁশ হাটিকে | খ. বেলে সোরাঁশ হাটিকে |
| গ. পলি হাটিকে | ঘ. সোরাঁশ ও বেলে সোরাঁশ হাটিকে |

২. উদ্ভিদকোষী মাছ কোনটি ?

- | | |
|--------------|-----------|
| ক. হুই | খ. মৃগেল |
| গ. তেলাপিয়া | ঘ. সরপুটি |

৩. বীজের বজায় রাখার উপস্থর থেকে বক্ষার জন্য বেশদো হয় -

- i. নিমের পাতার ঝুড়া
- ii. আশেপাশের বীজের ঝুড়া
- iii. কমলাও বীজের ঝুড়া

নিচের কোণটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | গ. i ও iii |
| খ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড় ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

আসকি কসীর ধারের একটি জমিতে আলুর চাষ করে গসেছিলেন। প্রথম নিকে তার জমি থেকে আশানুরূপ ফলন পেলেও বর্তমানে তার জমির ফলন কমে যাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করেন। কৃষি কর্মকর্তা তাকে জমির চাষ অংশে অপোভাবে তাইল জৈবিক পরামর্শ দেন।

৪. ভাস্কির জমির কলন কমে যাওয়ার কারণ -

- জমির উর্বরতা হ্রাস
- জৈব পদার্থের অভাব
- মাটির অন্ত্রায়ত পঠন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. কৃষি কর্মকর্তা ভাস্কিকে জমিতে আল চৈরির পরামর্শ দেওয়ার কারণ কোনটি ?

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| ক. জমির উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ | খ. জমির ক্ষমতার বোধ |
| গ. ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি | ঘ. মাটির পঠনের উন্নয়ন। |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সন্ধ্যা সাহেব তার বন্ধু রফিকের জমিতে উন্নত জাতের মধুন গম দেখে চাখ করায় সিদ্ধান্ত নিশেন। পরবর্তী মৌসুমে চাষের জন্য তিনি তার বন্ধুর নিকট থেকে বীজ সংগ্রহ করলেন। বীজত্বপোর আর্প্ততা পরীক্ষা করার জন্য ১০০ গ্রাম বীজ নিয়ে বীজের সম্পূর্ণ আর্প্ততা বের করে ওজন নিয়ে ৯০ গ্রাম ওজন পেলেন। এরপর লক্ষ্যরোনগম ও সন্তোষতা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হিলে গমের আবাদ করে কাকিত ফলন পান।

- হাতি কাকে বলে?
- FCR এর মান বত কর খাদ্যের গুণগত মান যত ভালো ব্যাখ্যা কর।
- সন্ধ্যা সাহেবের পরীক্ষিত বীজের আর্প্ততার হার নির্ণয় কর।
- সন্ধ্যা সাহেব এর বীজ পরীক্ষার কার্যক্রমটি মূল্যায়ন কর।

২. বিতা পাল মন্য অমিদগরের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে নিজ গুরুত্রে মাছ চাষ শুরু করলেন । তিনি সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করে গুরুত্রে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করেন এবং মাছের উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হন । তার সক্ষমতা দেখে এলাকার অন্য চাষির নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন ।

ক. সম্পূরক খাদ্য কাকে বলে?

খ. মাছ চাষে প্রাকৃতিক খাদ্য কতট মত কেন? ব্যাখ্যা কর ।

গ. বিতা পালের সক্ষমতার কারণ ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. এলাকার অন্য মাছ চাষিদের গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন কর ।

দ্বিতীয় অধ্যায় কৃষি উৎপাদন

কসল কশালের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপকরণ। এদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন বছরের পর বছর কসল উৎপাদন করতে পারি, তেমনই একটি দেশে নতুন কসল আণ্ডীকরণ ও সন্তোষজনক করতে পারি, একটি কস্যের জীবতাত্ত্বিক ওপাঙপ ধরে রাখতে পারি এবং অন্য জীব কোষল প্ররোপের মধ্য দিয়ে উল্লকতর করে তুলতে পারি।



চিত্র : কস বীজ



চিত্র : কস বীজ

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- কসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপকরণ ও ধাপগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- কসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাসের পুঙ্করের বরূপ ও পুঙ্কর প্রকৃতির ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- মাসের পুঙ্কর প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুঙ্করের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা ও বাস্তবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্থায়ী মৌসুমী ও অস্থায়ী পুঙ্কর বর্ণনা এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাসের অভ্যন্তরের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাসের আবাসস্থল রক্ষার কসো সংরক্ষণ আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহশাসিত পানির আবাসন বরূপ এবং আবাসন তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহশাসিত পানির আবাসন তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহশাসিত পানির খাদ্য এবং খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহশাসিত পানির খাদ্য ও খাদ্য তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহশাসিত পানির খাদ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফসল বীজ ও বংশ বিস্তারক উপকরণ

বীজ উদ্ভিদের বংশবিস্তারের প্রধান মাধ্যম। সম্ভারনভাবে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য যে অংশে ব্যবহার করা হয় তাকে বীজ বলে। বীজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে আমরা বীজকে দুইভাবে ভুক্তিতে পারি। যথা-

ক) উদ্ভিদতত্ত্ব অনুসারে, উদ্ভিদের সঞ্চিত ও পরিপক্ব ভিতরকে বীজ বলে। এ ধরনের বীজকে কসল বীজ বা প্রকৃত বীজ বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজও বলে। যেমন:- ধান, পাট, সরিষা, তিল, শিষ, নরবটি, টমেটো, কুমারগি, মরিচ, জিরা, খৈয়া, জাম, কাঁচালা ইত্যাদি।

খ) কৃষিকৃত্ব অনুসারে উদ্ভিদের যে কোনো অংশে (মূল, পাতা, কাণ্ড, কুঁড়ি, শাখা) বা উপযুক্ত পরিবেশে একই জাতের নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে, তাকে বংশবিস্তারক উপকরণ বলে। এ ধরনের উপকরণকে কৃষিভিত্তিক বীজ বা অফসল বীজও বলা হয়। যেমন : আমের কলম, আমুর জল, মিষ্টি আমুর লতা, জামের কাণ্ড, পাখরকুড়ি গাছের পাতা, কাকরোলের মূল, পেলাপের ডাল ও কুঁড়ি, আলাসের সুতুট, কলাপায়ে সাঝার, আমা, হম্বা, রসুল, কড় ও সকল উদ্ভিদভিত্তিক বীজ।

কোনোই দেখা যায় সকল উদ্ভিদভিত্তিক বীজ কৃষিভিত্তিক বীজের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সকল কৃষিভিত্তিক বীজ উদ্ভিদভিত্তিক বীজের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তথ্য : শিকারীরা ধান, পাট, মূলা, চিহ্নিত ফসলের এবং জম্বু, আমা, পাঁচা মূল ও রেহেলীর কাণ্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করবে এবং প্রেক্ষিত লগীকরণে জরী দেবে।

ফসল বীজ উৎপাদনের বাপসমূহ

বীজ উৎপাদন একটি জটিল প্রক্রিয়া। উত্তরমানের বীজ পেতে হলে বর্ষাবধি নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ফসল উৎপাদনের জন্য যে সব বাপ অতিক্রম করা হয় বীজ উৎপাদনের অন্যতম সেতাবেই অগ্রসর হতে হবে। পার্শ্বক্য হলো এই যে, বিভিন্ন ফসলের বীজ যেমন- ধান, পাট, পাট, মূলা, মরিচ ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বাপসমূহের বিশেষ বক্তব্য হলো হত :

- ১। **বীজ জরি নির্বাচন :** বীজ উৎপাদনের জন্য উর্ধ্ব জরি নির্বাচন করা উচিত। জরি অবশ্যই অগাছাযুক্ত ও আলোবাতাসযুক্ত হতে হবে। নির্বাচিত জমিতে পূর্ববর্তী বছরে একই জাতের বীজের চাষ না হয়ে থাকলে আরও ভালো। নির্বাচিত জমিতে অন্তত ২% জৈব পদার্থ থাকা উচিত।
- ২। **বীজ জরি পূর্ববীকরণ :** বীজ উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত জরি ও পার্শ্ববর্তী একই ফসলের জমির মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধান থাকতে হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃত্রিম শস্য বীজের সাথে ফল অন্য জাতের বীজের সন্নিবেশ না ঘটে।
- ৩। **বীজ সংগ্রহ :** বীজ সংগ্রহ বীজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বীজ উৎপাদনের জন্য অবশ্যই প্রত্যাখিত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহের সময় নিম্নোক্ত তথ্য জেনে নিতে হবে।

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ক) জাতের নাম | খ) বীজ উৎপাদনকারীর নাম ও নম্বর |
| গ) অন্য জাতের বীজের শতকরা হার | ঘ) বীজের অধুৰোদগম ক্রমতা |
| ঙ) বীজের অদ্রুততা | চ) বীজ পরীক্ষার তারিখ। |

উল্লিখিত তথ্যগুলো একটি গ্যারান্টি পত্রে ট্যাপ লিখে বীজের বস্তায় বা গ্যাকেটে রাখা হয় :

- ৪। **বীজের হার নির্ধারণ** : বীজের বিতরতা, সজীবতা, অধুৰোদগম ক্রমতা, আকার, বপনের সময়, মাটির উর্বরতা শক্তি এসব বিবেচনা করে হেক্টর প্রতি বীজের হার নির্ধারণ করা হয়।
- ৫। **নির্ধারিত জমি প্রস্তুতকরণ** : এক এক জাতের বীজের জন্য জমির প্রস্তুতি এক এক রকম হবে থাকে। যেমন, রোগা ধানের বীজ উৎপাদন করতে জমি তলোতাভাবে কর্ষিত করে চাষ করতে হবে। আবার গমের বেলার জমি চকসে অবস্থার ৪-৫ বার চাষ করে পরিপাটি করতে হবে। সাদা প্রয়োণের মাছার এক এক বীজের জন্য এক এক রকম হবে।
- ৬। **বীজ বপন** : নির্ধারিত কসলের বীজ উপযুক্ত সরিষে বপন করতে হবে। বীজতলায় প্রতিটি বীজ সমান গভীরতায় বপন করা উচিত। কোন বীজ কত গভীরতায় বপন করতে হবে তা বীজের আকার, আর্দ্রতা ও মাটির উপর নির্ভর করে।
- ৭। **রোপিং বা বাছাইকরণ** : বীজ বপনের সময় যতই বিতরিত বীজ ব্যবহার করা হোক না কেন জমিতে কিছু কিছু অন্য জাতের উদ্ভিদ ও আগছা দেখা যাবে। অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ তুলে ফেলা হবে। তিন পর্যায় রোপিং বা বাছাই করা হয়।
- ৮। **ক।** ফুল আসার আগে **খ।** ফুল আসার সময় **গ।** পরিপক্ব পর্যায়ে।
- ৮। **পরিচর্যা** : বীজের উৎপাদনের জন্য খুব বেশি পরিচর্যা প্রয়োজন হয়। নিচে কয়েকটি পরিচর্যা ধরন উল্লেখ করা হলো।

ক) সুখর সামার সার প্রয়োগ করা	খ) জৈব সার প্রয়োগ
গ) প্রয়োজনমতো সেত সেতর্যা	ঘ) বুট্রি পানি বা সেতের পানি জবলে মিছাশনের ব্যবস্থা করা
ঙ) আগছা পরিষ্কার করা	চ) রোপ ও পোকা ময়ন করা
ছ) সারের উপরি প্রয়োগ করা।	
- ৯। **বীজ সংরক্ষ** : বীজ পরিপক্ব হওয়ার পর পরই কটিতে হবে। ডারপন ছাড়াই করে খেড়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বংশবিস্তারক উপকরণ উৎপাদনের গারপসবুহ

বাংলাদেশে ফুল ও কসের চারা অল্প পদ্ধতিতে উৎপাদনের প্রচলন খুব বেশি। কারণ এসব গাছের বংশবিস্তার প্রকৃত বীজের মাধ্যমে হলে ফুল কল থেকে সরাসরি বেশি লাগে ও মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। এ ছাড়া অনেক কসলের প্রকৃত বীজ দ্বারা বংশবিস্তার ঘটানোও সম্ভব নয়। অল্প পদ্ধতিতে ফুল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, শাখা প্রকৃতি দ্বারা দ্রুত ও অল্পসংখ্যে চারা উৎপাদন সম্ভব। তাই এগুলো হলো কসলের বংশবিস্তারক উপকরণ। কিছু কিছু কসল যেমন- অমরকস, কলা, আলু, আদা, হলুদ প্রকৃতির বংশবিস্তারক উপাদান সরাসরি রোপণ করা যায়। আবার কিছু কসল যেমন- আম, লেবু, লিচু, জামরুল, গোলাপ ইত্যাদির বংশবিস্তারক উপাদান বিভিন্ন ধরনের কলমে তৈরির মাধ্যমে প্রস্তুত করে ব্যবহার করা হয়। নিম্নে

বংশবিজ্ঞানের উপকরণ তথা কৃষিভিত্তিক বীজ হিসাবে বীজ আলু উৎপাদনের ধাপসমূহ উল্লেখ করা হলো:

বীজ আলু উৎপাদন পদ্ধতি

জমি নির্বাচন : বীজ আলুর ভালো কলম পাওয়ার জন্য সুনির্ধারিত বেলে দোআঁশ মাটি সর্বোত্তম। নির্বাচিত জমি অত্যন্ত ফসল দেয়ন, অধিক, উষ্মেটো, ভাষাক ইত্যাদি সেল্যালেসি পোষক ক্ষেত থেকে অন্তত ৩০ মিটার দূরে থাকতে হয়। ৫-৬ টি চাষ ৭ মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ফুরুরা করে আগাছা হ্রাস করতে হবে। চাষ অন্তত ১৫ সেমি. দলীর হতে হবে। মাটি বেশি ঝকনো হলে প্রাক সেচ দিয়ে মাটিতে 'জো' আসার পর আলু লাগাতে হবে।

বীজ শোষণ : হিমাপারে রাখার আগে বীজ শোষণ না হয়ে থাকলে অল্প পচাঘের পূর্বে বীজ আলু বরিক এলিট দিয়ে শোষণ করে নিতে হবে (১ লি. পানি + ৩০ গ্রাম বরিক পাউডার মিশিয়ে বীজ আলু ১৫-২০ মিনিট ভুবিয়ে পরে ছাঁড়ার ঝকতে হবে)।

বীজ প্রকৃতি : বীজ আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে আঁত আলু বপন করা ভালো, কারণ আঁত বীজ রোগের পর একশোর রোগাক্রান্ত হওয়ার আপত্তা কম। আলু কেটে লাগলে প্রতি কিলো গ্রামে অন্তত ২ টি চোখ অবশিষ্ট রাখতে হবে। আলু কাটার সময় ব্যাবহার সাধন পানি খংগা চুটি বা খট্ট পরিষ্কার করা উচিত যাতে রোগ প্রীবাণু এক বীজ থেকে অন্য বীজে সা ছড়ায়। বীজ আলু অ'ফুঅফিলাবে সা কেটে লম্বাখিভাবে কাটতে হবে।

মাটিতে ঝেখ প্ররোণ : ব্যাকটেরিয়া কলিক কলে পড়া রোগ প্রকিরোধের জন্য শেখ চাষের পূর্বে প্রতি শতাংশ জমিতে ৮০ গ্রাম স্টেনল ট্রিটং পাউডার বা ক্রেমোপিজিন আটর সাথে মিশিয়ে সেওয়া উত্তম।

সার প্ররোণ : দুটি কারণে আলুতে সুখ সার প্ররোণ অত্যাশংক : প্রথমত: সুখ সার প্ররোণ করলে আলু উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত বীজ আলুর গুণগত মান ভালো হয়। দ্বিতীয়ত: পাছে কোনো খাদ্যোৎপাদনের অত্যাশংকিত লক্ষণ সৃষ্টি হলে ভাইরাস রোগের উপস্থিতি নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে আলু চাষের জন্য নিম্নলিখিত ছারে সার প্ররোণ করা প্ররোজন। শেখ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া এবং সবটুকু শোষক, টিএসপি, এমএলপি, জিনসার, ম্যাপনেসিয়ার সালফেট, জিক সালফেট, বরিক পাউডার জমিতে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি ইউরিয়া রোগের ৩০-৩৫ দিন পর পাছের পোড়ার মাটি ফুলে সেওয়ার সময় প্ররোণ করে সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	জমি শতাংশ
পচা ঘোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১৪০০ গ্রাম
টিএসপি	৯০০ গ্রাম
এমএলপি	১০৬০ গ্রাম
বরিক পাউডার/ বোরন সার	২৫ গ্রাম
জিনসার/সালফেট	৫০ গ্রাম
জিনসার	৫০০ গ্রাম
ম্যাপনেসিয়ার সালফেট	-

বীজ ছাড় ও রোপণ সময় : বীজছাড় নির্ভর করে রোপণ দূরত্ব ও বীজের আকারের উপর। সাধারণত প্রতি হেক্টরে ১.৫ থেকে ২ টন বীজ আলুর প্রয়োজন (একরে ৬০০-৮০০ কেজি)।

রোপণ দূরত্ব

দূরত্ব	সার আলুর ক্ষেত্রে	কাটা আলুর ক্ষেত্রে
লাইন থেকে লাইন দূরত্ব	৬০ সেমি	৬০ সেমি
বীজ থেকে বীজ দূরত্ব	২৪ সেমি	১০-১৫ সেমি

সেচ ব্যবস্থাপনা : হাটের আশ্রয়ভাৱ উপর ভিত্তি করে ২-৪ টি সেচ প্রদান করা উচিত। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বীজ আলুর অঙ্কুরোদগমের জন্য হালকা সেচ দেওয়া যেতে পারে, তবে সেচ বেশি হলে বীজ পচে যাচ্ছে। রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে কারণ ৩০ দিনের মধ্যে টোলন বের হতে শুরু করে। সাধারণত কেইসের ২/৩ ভাগ পানি ছাড়া ভিক্সিরে দিতে হবে।

আপায়া সময় : রোপণের পর থেকে ৬০ দিন পর্যন্ত আপায়া পরিচর্য গ্রহণতে হবে। সাধারণত পাহ ছোট অবস্থায় থাকাকালীন আপায়া বর্ষাসম্পন্ন সময় করে গ্রহণতে হবে। এছাড়া বনুয়া জাতের আপায়া বা ভাইরাস রোগের বিরুদ্ধে বাধক হিসাবে কাজ করে তা অবশ্যই নির্ণয় করে ফেলতে হবে।

হাট উঠিয়ে দেওয়া : ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করে সেচ দেওয়ার পর হাটিকে 'জো' আসলে ভেলি বরাবর হাট উঠিয়ে দিতে হবে। পর্যবসীকালে প্রয়োজনবোধে আরও এক বার এমনভাবে ভেলি বরাবর হাট উঠিয়ে দিতে হবে যাতে আলু বাহিরে না যায় এবং টোলন ও আলু হাটিক ভিতরে থাকে।

রোপিং : চারা পক্কানোর পর থেকে রোপিং শুরু করতে হবে। রোপাকৃত পাহ শিকড়ের উঠিয়ে সুকিয়ে ফেলতে হবে।

রোপবালাই ও পোকা দমন

(ক) আলুর রোগ : আলুর রোগসমূহের মধ্যে মড়ক রোগ, ব্যাক্টেরিয়াল জনিত রসে পড়া রোগ, দাঁল রোগ, কাণ্ড পড়া রোগ, ভাইরাসজনিত রোগ অন্যতম। নিম্ন তাপমাত্রা, কৃষ্ণশাল্লভ আবহাওয়া ও মেঘলা আকাশ আলুর জন্য ক্ষতিকর। এতে আলুর মড়ক রোগ (সেইট ব্রুইট) আক্রমণ বেশি দেখা যায়। আলু ফসলকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য স্পর্শক (কন্টাক্ট) জাতীয় দ্রব্যবস্তুতে নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

(খ) কাইই পোকা : এ পোকায় কীড়া আলুর প্রধান ক্ষতিকর পোকা। এরা পাহ কেটে সেচ এবং আলু আক্রমণ করে।

- খুব সকালে যে সব পাহ কাটা পাওয়া যায় সেগুলোর গোড়ার হাট সন্ধিরে পোকায় কীড়া বের করে ফাটতে হবে।
- আক্রমণ কীর্তি হলে অনুমোদিত দ্রব্যের কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

(গ) জাব পোকা : জাব পোকা পাছের রস খায় এবং ভাইরাস রোগ ছড়ায়। বীজ আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাব পোকা দমন অত্যন্ত জরুরি। এক্ষণে পাছের পাক্তা পক্কানোর পর থেকে ৭-১০ দিন পর পর জাব পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। জাব পোকায় আক্রমণ এড়াতে ৭০-৮০ দিনের মধ্যেই আলু সংগ্রহ করা উচিত।

ফসল সঞ্চার এবং পরিচর্যা : আধুনিক জাতে পরিণততা আসতে ৮৫-৯০ দিন সময় লাগে। তবে বীজ ভালুকে সঞ্চারের অন্তর ১০ দিন আগে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

(ক) হায় পুলিশ : মাটির উপরের পাতের সম্পূর্ণ অংশকে উপড়ে ফেলাকে হায় পুলিশ বলে। আলু সঞ্চারের ৭-১০ দিন পূর্বে হায় পুলিশ করতে হবে। এতে সম্পূর্ণ শিকড়সহ পাহ উপরে আসবে কিন্তু আলু মাটির নিচের থেকে থাকে। হায় পুলিশ এর ফলে আলুর ঢুক শক্ত হয়, রোগাক্রান্ত পাহ থেকে রোগ বিস্তার কম হয় ও আলুর সরেক্ষণতন বৃদ্ধি পায়। বীজ আলুর অবশ্যই হায় পুলিশ করতে হবে, তবে খাবার আলুর লোয়ার হায় পুলিশ জরুরি নয়।

(খ) আলু উত্তোলন : আলু উত্তোলনের পর পরই ব্যক্তিকে গিঁড়ে আসা উত্তম। আলু হোল্ডার পর কোনো অবস্থাতেই কেতে জুগাকারে রাখা যাবে না, কারণ কেতে আলু খোসা রাখলে তা বিভিন্ন প্রকার রোগ ও শোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে পরে (যেমন-সুতলি শোকা) ভিস পড়তে পারে।

(গ) আলু সরেক্ষণ : আলু উত্তোলনের পর ব্যক্তিকে এসে সাথে সাথে কাটি, দালি ও পড়া আলু আদান। তবে বেমে ফেলতে হবে। তারপর ৭-১০ দিন যেথেকে আলু বিহিরে রাখতে হবে। অতঃপর আবারও দালি ও পড়া আলু বেমে বাদ দিয়ে আলো আলু বজার করে ছিলাঘরে পাঠাতে হবে।

এছাড়া বীজ আলু উৎপাদনের আরও কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেমন-

(ক) টিন্যু কালচার পদ্ধতি

(খ) স্টার্টার ও টপ চীট কাটিং পদ্ধতি

(গ) বিনাচাষে বীজ আলু উৎপাদন

(ঘ) আলুর প্রকৃত বীজ উৎপাদন।

ফসল বীজের ভরুত্ব : ফসল উৎপাদনে ফসল বীজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সব ফসল ফসল বীজের মাধ্যমেই কল্যাণে সব্ব সে ক্ষেত্রে উদ্ভিদের বংশরক্ষার্থে ফসল বীজের বিকল্প নেই। এছাড়াও-

১। ফসল বীজ ফসল উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ।

২। ফসল বীজ মানুষসহ পশু পাবির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৩। বিভিন্ন ফসল বীজ রোগ, পোকামাকড় ও অগাছ বিস্তার রোধ করে।

৪। ফসল বীজের মাধ্যমে উন্নত জাতের ফসল উৎপাদন সম্ভব।

৫। ফসল বীজের মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশধারা সিক থাকে।

৬। কোনো কোনো বীজ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৭। ফসল বীজ অনেক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বংশবিস্তারক উপকরণের ভরুত্ব : অবিকাশে ফসলের বংশবিস্তার বীজ দ্বারা সম্ভব হয় না বা সম্ভব হলেও দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে ফলন পাওয়া যায়। কাজেই জনবহুল কোর্সে দেশের জন্য ফসল ম্রুত পাওয়ার জন্য বংশবিস্তারক উপকরণ তথা কৃষিজাতিক বীজের বিকল্প নেই। এতে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, শাখা, পাতা, শিকড়, ফুঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে বংশবিস্তার করা হয় বলে হাক্কুশাফল বজায় থাকে। একই গাছে একাধিক জাতের সহযোগিতা ঘটানো যায়। যেমন : খিচি ও টক তুল একই গাছে এবং লাগ, হলুদ, কালা ও দাদা তুল একই গোলাপ গাছে কেটিসো সম্ভব। এছাড়াও এ উপকরণ ব্যবহার করে বীজবাহিত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অল্প সময়ের ও কম খরচে সহজে মূল, ফল পাওয়া যায়। কাজেই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কৃষি উৎপাদনে ফসল বীজ সঞ্চার করতে এবং বীজের বর্ণনা ব্যাভার লিখবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাছের পুকুর

পুকুর হচ্ছে ছোট ও অগভীর বৃদ্ধ জলাশয়, যেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মাছ চাষ করা যায় এবং এরোজনে এটিকে সহজেই সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়ে ফেলা যায়। এক কবের পুকুর হচ্ছে চাষযোগ্য মাছের বাসস্থান। পুকুরে পানি স্থির অবস্থায় থাকে। তবে বাতাসের প্রভাবে এতে অল্প ঢেউ সৃষ্টি হতে পারে। পুকুরের আয়তন কয়েক শতাংশ থেকে কয়েক একর হতে পারে। তবে ছোট ও মাঝারি আকারের পুকুর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক এবং এই ধরনের পুকুর অধিকতর উৎপাদনশীল হয়।

আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য

মাছ চাষের পুকুরের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা সরকার বা চাষ প্রক্রিয়াকে লাভজনক করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। একটি আদর্শ মাছ চাষের পুকুরের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন-

- ১। পুকুরটি বন্যামুক্ত হবে। একজন পুকুরের পত্র যথেষ্ট উঁচু হতে হবে।
- ২। পুকুরের মাটি সোঝাশ, পলি- সোঝাশ বা রীটেল- সোঝাশ হলে সবচেয়ে ভালো।
- ৩। সারা বছর পানি থাকে এমন পুকুর চাষের জন্য অধিক উপযুক্ত।
- ৪। পুকুরের পানির গভীরতা ০.৭৫-২ মিটার সুবিধাজনক।
- ৫। পুকুরটি খোলামেলা স্থানে হলে ভালো হয় এবং পাড়ে কোনো বড় গাছপালা বা লাগানে আসে হয়। এতে পুকুর গ্রন্থর আসো-যাতায়াত পাবে। কলে পুকুরে স্যালোকসপ্রেসন বেশি হবে ও মাছের খাদ্য বেশি কৈরী হবে। পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন বিস্তার। উচ্চ-মন্ডিশনুদী পুকুর সুর্য্যলোক বেশি পাবে।
- ৬। পুকুরের তলায় অভিরিক্ত ফসল থাকার উচিত নয়। তলার কালার পুরু ২০-২৫ সেমি. এর বেশি হওয়া ঠিক নয়।
- ৭। চাষের পুকুরের আয়তন ২০-২৫ শতক হলে ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। পুকুরের আকৃতি আয়তাকার হলে ভালো। এতে করে জাল টেনে মাছ অ'ছল করা সহজ হয়।
- ৮। পুকুরের পাড়গুলো ১:২ হারে ঢালু হলে সবচেয়ে ভালো। অর্থাৎ পুকুরের তলা হতে পুকুরের পাড় যতটুকু উঁচু হবে পাড় ঢালু হবে পুকুরের কলার নিকে বিভ্রম দূরত্বে গিরে বিশবে।

মাছ চাষের পুকুরের পানির গুণাগুণ

মাছের বেঁচে থাকা, খাদ্যগ্রহণ ও আশানুগুণ বৃদ্ধির জন্য পুকুরের পানির গুণাগুণ অনুকূল মাত্রায় থাকা সরকার। পুকুরে পানির গুণাগুণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১) প্রাকৃতিক গুণাগুণ ২) রাসায়নিক গুণাগুণ। মাছ চাষে এদের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১। জৈব ভগ্নাণ

- ক) পতীৰতা: পুঙ্কর বেশি পতীর হলে সূর্যের আলো পুঙ্করের অধিক পতীৰতা পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। ফলে অধিক পতীর অফলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রাহকটিন তৈরি হয় না। আবার সেখানে অক্সিজেনের অভাব হতে পারে। অন্যদিকে পুঙ্কর অসতীর হলে বীষকালে পুঙ্করের পানি অভিরিক্ত গরম হয়ে যায়। এসব কারণে মাছের কতি হতে পারে ও উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।
- খ) তাপমাত্রা: তাপমাত্রার বৃদ্ধির উপর মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। যেমন- শীতকালে মাছ খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে নেত ফলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায়। একারণে শীতকালে পুঙ্করে সার ও খাদ্য প্রয়োণের পরিমাণ কমিয়ে নিতে হয়। সুই জাতীয় মাছের বৃদ্ধি $24-30^{\circ}$ সে. তাপমাত্রা সবচেয়ে ভালো হয়।
- গ) খেলাঙ্ক: কাঙ্গা কপার কারণে পুঙ্করের পানি খেলা হলে পানিতে সূর্যলোক প্রবেশে ব্যাধ পায়। এতে করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়।
- ঘ) সূর্যলোক: যে পুঙ্করে সূর্যলোক বেশি পড়ে সেখানে সালোকসংশ্লেষণ ভালো হয়। ফলে সেখানে ফাইটোপ্ল্যাটন বেশি উৎপাদিত হয় ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২। রাসায়নিক ভগ্নাণ

- ক) প্রবীকৃত অক্সিজেন: পুঙ্করের পানিতে প্রবীকৃত অক্সিজেন মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানক ফাইটোপ্ল্যাটিন ও জলক উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অক্সিজেন তৈরি করে পুঙ্করের পানিতে প্রবীকৃত হয়। বায়ুমালা হতে সরাসরি পানির উপরিভাগেও কিছু অক্সিজেন মিশ্রিত হয়। পুঙ্করে বসবাসকারী মাছ, জলক উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী এ অক্সিজেন দ্বারা খাদ্যকার্য চালায়। মাছে সূর্যলোকের অভাবে সালোকসংশ্লেষণ হয় না ফলে পানিতে কোনো অক্সিজেন তৈরি হয় না। এজন্য সকালে পুঙ্করে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় ও ফিকলে বেশি থাকে। মাছ চাষের জন্য পুঙ্করের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমপক্ষে ৫ মিলি গ্রাম/লিটার (৫ শিপিএম বা ১ মিলিয়ন ভাগের পাঁচ ভাগ) থাকা প্রয়োজন।
- খ) প্রবীকৃত কার্বনডাই অক্সাইড: পুঙ্করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য ফাইটোপ্ল্যাটিনের উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত প্রবীকৃত কার্বন ডাই অক্সাইড থাকা প্রয়োজন। তবে স্বাভাবিকিত কার্বন ডাই অক্সাইড মাছের জন্য ক্ষতিকর। পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা ১২ মিলি গ্রাম/লিটার (১২ শিপিএম) নিচে থাকলে তা মাছ ও চিংড়ির জন্য বিধাক নত। মাছের কাশো উৎপাদন পানির জন্য পুঙ্করের পানিতে ১-২ শিপিএম কার্বন ডাই অক্সাইড থাকা প্রয়োজন।
- গ) পিএইচ (P^H): পুঙ্করের পানির P^H মান নির্ণয় করে অনুভব বা স্মারকুর মাত্রা বোঝা যায়। মাছ চাষের জন্য পুঙ্করের পানির P^H ৬.৫ হতে ৮.৫ এর মধ্যে হলে ভালো হয়। P^H ৪ এর নিচে বা ১১ এর উপরে হলে মাছ মারা যায়। পানির P^H কমে অতীর হলে সেলে পুঙ্করে চুন (১-২ কেজি/শতক) প্রয়োগ করতে হবে। পুঙ্করে P^H বেড়ে অসীম অবস্থা বেশি বেড়ে গেলে এমেনিফাইং সালফেট বা তেতুল পানিতে গলে পুঙ্করে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- ঘ) কসকরাস: প্রাকৃতিক পানিতে অতি অল্প পরিমাণ কসকরাস থাকে। এই কসকরাস কসফেটে রূপান্তরিত হয়। পরিমিত কসকেষ্টের উপস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণ ফাইটোপ্ল্যাটিন জন্মায়।

পুকুরের প্রকারভেদ ও এর বিভিন্ন জর

পুকুরের প্রকারভেদ

পানি ধারণক্ষমতা, পুকুরের মাছের ধরন, পুকুরের আয়তন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পুকুরকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায়। নিচে পুকুরের প্রধান প্রধান শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো-

১। পানির স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে পুকুরের শ্রেণিবিভাগ

- ক) স্থায়ী বা বার্ষিক পুকুর:** এসব পুকুরে সারা বছর পানি থাকে। এ ধরনের পুকুর অধিক গভীর হয়। এসেব মাটি সবসময় পানি ধরে রাখতে পারে। যেমন- এঁটেল ও দোঁদাশ মাটির পুকুর। এসব পুকুরে দৈনিক কার্য কাতীর মাছ, যেমন- ছুই, কাতলা, মৃগেল, কার্পিও ইত্যাদির মিশ্র চাষ, ললদা চিটড়ি ও কার্পের মিশ্র চাষ করা যায়।
- খ) অস্থায়ী বা মৌসুমি পুকুর:** এসব পুকুরে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় (৩-৮মাস) পানি থাকে। এগুলো বেশি গভীর হয় না। এসেব মাটি বেশি সময় পানি ধরে রাখতে পারে না। যেমন- বেলে মাটির পুকুর। এসব পুকুরে হ্রত বর্ধনশীল মাছ যেগুলো এক বছরের কম সময়ে বাজারজাত করার উপযোগী হয়ে সেসব মাছ চাষ করা যায়। যেমন- সিলভার কার্প, ডেলশিয়া, সরপুটি, শিং, মাঝারি ইত্যাদি।

২। চাষকৃত মাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ

মাছের পোমাকে বয়স ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা- ডিম পোমা, রেণু পোমা, খালী পোমা ও আঙুলে বা চাড়া পোমা। ডিম ফুটার পরের অবস্থাকে ডিম পোমা বলে। এসেব পেটের নিচে একটি থলি থাকে। থলি থাকা অবস্থায় (২-৩দিন) এরা বাইরে থেকে কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। কুসুম থলি শেষ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থাকে রেণু পোমা বলে। রেণু পোমা অল্প বড় হয়ে থাকে মতো আকার (যেমন- ২ বা ২ সেমি এর উপর বড়) হলে একে খালী পোমা এবং আঙুলের মতো লম্বা (৭ সেমি এর উপর) হলে একে আঙুলে বা চাড়া পোমা বলে। এ বিভিন্ন আকারের পোমার প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন পরিবেশের পুকুর প্রয়োজন। নিচে এসেব বর্ণনা দেওয়া হলো-

- ক) আঁতুড় বা নার্সারি পুকুর:** যে পুকুরে রেণু পোমা থেকে খালী পোমা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে আঁতুড় বা নার্সারি পুকুর বলে। এখানে শতক হ্রি ৫০-১০০ গ্রাহ রেণু পোমা থেকে ১৫-৩০ দিন চাষ করা হয়।
- খ) শালন পুকুর:** যে পুকুরে খালী পোমা থেকে চাড়া বা আঙুলে পোমা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে শালন পুকুর বলে। শালন পুকুরের আয়তন ২০ থেকে ১০০ শতক ও গভীরতা ১.৫-২ মিটার হতে পারে। এ পুকুরে শতক হ্রি ২৫০০-৪০০০ টি খালী পোমা থেকে ২-৩ মাস চাষ করা হয়।



ডিম পোমা



রেণু পোমা / খালী পোমা



চাড়া পোমা / আঙুলে পোমা

চিত্র : মাছের পোমার বিভিন্ন পর্যায়

- গ) **মছল পুকুর:** এটিই মাদ্র চাষের প্রধান পুকুর। যে পুকুরে ধানী বা আদুলে গোলা ছেড়ে বড় মাছ পালিত করা হয় তাকে মছল পুকুর বলে। এর আয়তন ৩০ শতকের উপরে এবং পল্লীরতা ২-৩ মিটার হয়। এখানে সাধারণত ১ বছরের উপরে মাছ লালন না করা হয় ভালো। কারণ খাল্য মিলেও এ সময়ের পর মাছের বৃদ্ধির হার কম হয়।

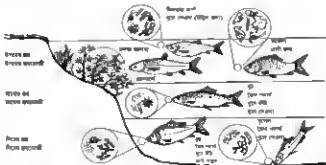
এছাড়া আদুলের উপর ভিত্তি করেও পুকুরকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায়। যেমন- মিনি পুকুর বা ছোট পুকুর (১-৫ শতক), মাঝারি পুকুর (১০-৩০ শতক) এবং বড় পুকুর (৩০ শতকের উপর)।

পুকুরের বিভিন্ন স্তর

পুকুরের পানির বিভিন্ন পরীক্ষা করে ভাপনমাত্রা, অক্সিজেন, ও গ্রাফটনের ভারতীয় গাট। পুকুরে বিচরণকারী বিভিন্ন স্তরও বিভিন্ন পরীক্ষার থাকে ও খাল্য গ্রহণ করে। এই স্তর ভারতীয় অনুমারী পুকুরকে ৩টি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা- (১) উপরের স্তর (২) মধ্যস্তর এবং (৩) নিম্নের স্তর।

- ১) **উপরের স্তর বা উপরিভাগ:** পুকুরের উপরের স্তর যেহেতু বাতাসের সংস্পর্শ থাকে তাই এই স্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। পুকুরের উপরের স্তরে ফাইটোপ্লাংকটন বেশি থাকে যা মাছের খাদ্য। এই স্তরে সর্পুটি, কাকলা, সিলবুর কার্প, বিলহের কার্প থাকে ও খাল্য গ্রহণ করে।
- ২) **মধ্যস্তর বা মধ্যভাগ:** এই স্তরে পানির ভাপনমাত্রা ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ উপরের স্তরের চেয়ে কম থাকে। এই স্তরে জু-গ্রাফটন থাকে তবে ফাইটোপ্লাংকটনও থাকতে পারে। চুই মাছ এই স্তরে থাকে ও খাল্য গ্রহণ করে।
- ৩) **নিম্নের স্তর বা ভলসেশ:** এই স্তরে দ্রবীভূত অক্সিজেন ও ভাপনমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। পুকুরের ভলসেশে জু-গ্রাফটন, উটপতলের লার্ভা, মৈত্র-মাকরজা, কঁকড়া, শামুক-খিসুক পাওয়া যায়। মুগেল, কালবাউশ, কর্ণিক ও বা কমন কার্প, চিট্রি, পাশাশ, শিং, মাকর এই স্তরে বাস করে ও খাল্য গ্রহণ করে।

কিছু মাছ আছে যারা পুকুরের সকল স্তরেই বিচরণ করে যেমন- জেলাপিলা। অন্যদিকে এল কার্প পুকুরের উপরে, পাড়ে বা ভলসেশে কল্লাসে বিভিন্ন সবুজ উদ্ভিদ খাল্য হিসেবে গ্রহণ করে।



চিত্র: পুকুরের বিভিন্ন স্তর

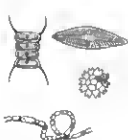
কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পুকুরে তর ভিত্তিক মাছের অবস্থান ও তাদের খাদ্যভান্ডারের উপর ভিত্তি করে পোন্টীর তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : নার্সারি বা অঁতুর পুকুর, লালন পুকুর, অঙ্কন পুকুর, বার্ষিক ও মৌসুমি পুকুর।

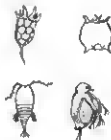
পুকুরের বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়

অবস্থান বা বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় বা জীবকুলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ১) **গ্রাফেটন:** গ্রাফেটন হচ্ছে পানিতে মুক্তভাবে ভ্রমণকারী জীব। এরা দুই প্রকার যথা- ফাইটোগ্রাফেটন বা উদ্ভিদকণা ও জু-গ্রাফেটন বা প্রাণীকণা। পুকুরের পানির ছং সবুজ বা সবুজাভ থাকলে বুঝতে হবে পানিতে ফাইটোগ্রাফেটন আছে। ফাইটোগ্রাফেটনকে এককোষী শৈবাল ও বলে। কয়েকটি ফাইটোগ্রাফেটনের উদাহরণ হচ্ছে- ক্লোরোলা, এন্ডোসেবা, ফাইকোসিসিস ইত্যাদি। আর কয়েকটি উদ্ভেদবোধ্য জু-গ্রাফেটন হচ্ছে ডায়টোমিটা, কপিপোড, জটিকার। পানির ছং বাদামি সবুজ, লালচে-সবুজ বা হলুদটে সবুজ থাকলে বুঝতে হবে ফাইটোগ্রাফেটনের পাশাপাশি পুকুরে জু-গ্রাফেটনের উপস্থানও আছে। পুকুরে গ্রাফেটনের উপস্থানদের জন্য পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে নিয়মিত সার ব্যবহার করতে হয়। সার হিসাবে জৈব ও অজৈব এ দুধানের সারই ব্যবহার করা যায়।



চিত্র: কয়েকটি ফাইটোগ্রাফেটন



চিত্র: কয়েকটি জু-গ্রাফেটন

- ২) **সাঁতারু বা নেফেটন:** এরা মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে পারে। এরা সমস্ত পানিতে চরে বেড়ায় এবং খাদ্য খুঁজে পায় যেমন- মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি। অবশ্য এদের ভিন্ন ও আর্থের বৈশিষ্ট্য গ্রাফেটনের মতো।
- ৩) **তলবাসী বা বেন্থোস:** পুকুরের তলদেশে কাদার উপরে বা ভিতরে যে সব জীব থাকে তাদেরকে তলবাসী বা বেন্থোস বলে। যেমন- পাচলকণী, ব্যাকটেরিয়া, শাদুক, ঝিনুক ইত্যাদি। তলবাসী প্রাণী পুকুরের তলা থেকে গ্রাফেটনের পুষ্টি উপাদান সাইট্রোজেন ও ফসফরাস মুক্ত করতে সাহায্য করে। ফলে পানিতে গ্রাফেটনের পুষ্টি উপাদান বাড়ে বা মাছ চাষের জন্য ভালো।

৪) **জলজ উদ্ভিদ:** পুকুরে বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। যেমন—

ক) **শেওলা:** অশতীর পুকুরের তলদেশে বা পুকুর পাড়ে বিভিন্ন ধরনের শেওলা জন্মে। যেমন—
স্পাইরোপাইরা।

খ) **জলময়ন উদ্ভিদ:** এ সকল উদ্ভিদ পানিতে ভেসে থাকে। এদের মূল মাটিতে আটকাতে থাকে না। যেমন—
কচুরিপানা, টোপাপালা, বুড়িপায়া ইত্যাদি।



গ) **নির্পদ্মশীল উদ্ভিদ:** এ সব উদ্ভিদেও শিকড় পানির নিচে মাটিতে থাকে কিন্তু পাতা ও ফুলের উপরের অংশ বা শুধু পাতা পানির উপর ভাঁড়িয়ে থাকে বা ভেসে থাকে। যেমন—
শাপলা, পানিভল, তসনি শাক, আড়াইল।



ঘ) **নিমজ্জিত বা ডুবন্ত উদ্ভিদ:** এ ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে থাকে। এদের শিকড় মাটিতে থাকে। এদের পাতা ও ফল কখনো পানির উপরে আসে না। যেমন—
কাঁটা কঁকি, পাতাকাঁকি, কাঁটা শেওলা, নায়াল।



শিরা: পাতা কঁকি



শিরা: নায়াল



শিরা: কাঁটা কঁকি

ঙ) **সহস্রাবো উদ্ভিদ:** এদের শিকড় পুকুরের পাড়ে আটকাতে থাকে এবং কাণ্ড, পাতা পানিতে ভাঁড়িয়ে থাকে। যেমন—
বেলেক, কলমিলতা, মালক।



শিরা: মালক

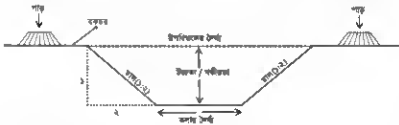
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন এবং প্রস্তুতকরণ

মাছ চাষের জন্য সর্বপ্রথম যেটি প্রয়োজন তা হচ্ছে নতুন পুকুর খনন অথবা বিদ্যমান পুকুরকে চাষের জন্য প্রস্তুতকরণ বা উপযোগীকরণ। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

ক. নতুন পুকুর খনন

কোনো স্থানে পুকুর খনন করতে হলে একটি আদর্শ পুকুরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা সরকার স্বাক্ষর সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রূপে পুকুর খনন করতে হবে। পুকুর খননের সময় পুকুরটি স্বাক্ষর আয়তকার রাখার চেষ্টা করতে হবে। পুকুরের গভীরতা এমন ভাবে করা প্রয়োজন যেন সারা বছর ১.৫ থেকে ২ মিটার পানি থাকে। খননের সময় পুকুরের পাড়ের ঢাল যখন ১:০.৫২ বাধা উচিত। তবে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি হলে ১:০.৩ করা নিরাপদ। অন্যথায় পুকুরের পাড় কেটে দিয়ে ঝড় দিনে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে। পুকুর খননের স্থানে যদি উপরের মাটি ভালো ও উর্বর হয় তবে পুকুর খননের সময় আলোচনা করে সরিয়ে রাখতে হবে। পুকুর খনন শেষ হলে পুকুরের ভাঙ্গা বাসু মাটির উপরে তা বিছিয়ে দিতে হবে। এতে পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পুকুরের পাড়ের উপরিভাগে ২.৫ মিটার চওড়া হলে ভালো। পুকুরের উপরিভাগের ধার ও পাড়ের মধ্যবর্তী কিছু স্থান ভাঁকা রাখা হয়। এই ভাঁজগুলোকে বকুর বলে। পুকুরে তলা সহান স্বাভাবিক একদিকে কিছুটা ঢালু করতে হবে। এতে পানি সেচ ও মাছ আহরণে সুবিধা হবে। নতুন পুকুর খননের পর সরাসরি দিয়ে পিটিয়ে পাড়ের মাটি শক্ত করে দিতে হয়ে এবং পাড় ঘাস লাগিয়ে দিতে হবে। এতে তবে পাড় কেটে ফাটার ঝুঁকি কমে যাবে ও বর্ষার পাড়ের মাটি ক্ষয় হবে না।



চিত্র: পুকুরের প্রস্থচ্ছেদ

খ. পুকুর প্রস্তুতকরণ বা মাছ চাষের উপযোগীকরণ

পুকুর প্রস্তুতি মাছ চাষের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। নতুন পুকুরের পূর্বে বিদ্যমান পুকুর সঙ্কোচের মাধ্যমে ভালোভাবে প্রস্তুত করে দিলে মাছ স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের অনুকূল পরিবেশ পায়। এতে মাছের দ্রুত বৈধিক বৃদ্ধি ঘটে ও রোগ বালাই কম হয়। কমে মাছ উৎপাদন লাভজনক হয়। পুকুর প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। বাণি ক্ষেত্রে নিম্নরূপ—

১. পুকুরের পাড় ও তলদেশ সেরামত

পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বা বর্ষাকালে বন্যার হায়ে ভেঙ্গে যেতে পারে বা হালুসে মাহ মুকতে পারে। তাই পাড় ভাঙা থাকলে সেরামত করতে হবে ও পাড় ঠিক করে বাঁধতে হবে। পাড়ে বড় গাছপাড়া থাকে উচিত নয় বা থাকলেও তা ছোট্টে সিতে হবে। এতে করে পুকুরে সূর্যের আলো পড়তে পারবে এবং পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে। পুকুর পুরানো হবে তলার অতিরিক্ত কীড়া জমা হয়। এ অবস্থায় ২০-২৫ সেনি, কাগা রেখে অতিরিক্ত কীড়া তুলে ফেলতে হবে। পুকুর শুকিয়ে সহজেই তা করা যায়। মাহ চাঁদের পুকুরে ৩-৪ বছর পর পর একবার তলানো উচিত। পুকুর শুকানোর পর কড়া তোলে তলার ফটিল খরাতে হবে। সবুজ হলে পুকুরের তলার চাষ গিয়ে নিতে হবে। এতে করে পুকুর তলা থেকে বিঘাত গ্যাস, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও শোকসাক্ত্য দূর হবে এবং পুকুরের পরিবেশ ভালো থাকবে। এরপর পুকুরে তলদেশ সমান করে নিতে হবে। পুকুরের তলার একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভালো হয়। এতে হায়ে খরতে ও জাল টানতে সুবিধা হবে।

২. জলজ আগাছা দমন

পুকুর পাড়ে ও ভিতরে বিভিন্ন আগাছা যেমন-কচুরিপানা, বুনিশাণ, হোলেন্ডা, কলমি পতা, শেওলা ইত্যাদি থাকলে তা অপোভাবে পরিচালনা করে ফেলতে হবে। আগাছা পুকুরে সেওয়া পর শোষণ করে শেও, সূর্যের আলো পড়তে বাধা দেয় এবং মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা দেয়। আগাছার মধ্যে মাছের শত্রু যেমন- হালুসে মাহ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি লুকিয়ে থাকে ও মাহ ধরে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন-কপার সালফেট বা জুইয়ে, সিঙ্কাসিন ইত্যাদি ব্যবহার করতেও জলজ আগাছা দমন করা যায়। তবে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা কঠিনক মত। গ্রাসকার্প, সরপুটি উদ্ভিদভেদী মাহ। চাষকালীন সময়ে পুকুরে এসব মাহ ছেড়ে জৈবিক পদ্ধতিতেও আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. হালুসে ও অচাষযোগ্য মাহ দূরীকরণ

বিভিন্ন হালুসে মাহ যেমন-পেলে, মোয়াল, ডিকল, কলি, টাকি, পজার ইত্যাদি সরাসরি চাঁদের মাহ খেয়ে ফেলে। এছাড়া পুটি, চাপিলা, ঢাকা ইত্যাদি অচাষযোগ্য মাহ। এরা চাষযোগ্য মাহের জায়গা, খাদ্য, অক্সিজেন সবকিছুকেই জাপ বসায়। এর ফলে চাষকৃত মাহের উৎপাদন কমে যায়। নিচের যে কোনো পদ্ধতিতে হালুসে ও অচাষযোগ্য মাহ একন মাহ দূর করা যায়-

- ক) পুকুর শুকিয়ে: পুকুরের পানি শুকিয়ে সব হায়ে ধরে ফেলা যায়। অনেক মাহ পুকুরের তলার কাটার লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই কড়া রোঁটে পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে।
- খ) জাল ট্রেনে: পুকুরে পানি কম থাকলে বাব মত জাল ট্রেনে হায়ে ধরে ফেলা যায়।
- গ) মাহ হাওয়ার বিশ ব্যবহার করে: একেবারে রোটেনস বা মহুয়ার কেল ব্যবহার করা যায়। এসব দ্রব্য পুকুরে দিলে মাহের কুলকার শ্রিত বন্ধ করে দেয়। ফলে হায়ে মত বন্ধ হবে মাহা যায়। পুকুরে ১ হুট বা ৩০ সেনি, পটীকতার পানির জন্য শতক হ্রস ৩০-৩৫ গ্রাম রোটেনস অথবা ৩ কেজি মহুয়ার কেল ব্যবহার করতে হবে। একজন্য মোট পরিমাণকে জিন অণু করতে হবে। একতাপ দিয়ে কাই তৈরি করে ছোট ছোট বালির পুকুরের বিভিন্ন স্থানে সিতে হবে। বাকি ২ ভাগ পানিতে তলিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে সিতে হবে। এরপর জাল ট্রেনে পুকুরের পানি উঠে-পাল্টা করে সিতে হবে। মাহ ভাসলে শুধু কলসে জাল ট্রেনে ধরে ফেলতে হবে। বিশ সেওয়ার পর ৭-১০ দিন পুকুরের পানি ব্যবহার করা যাবে না ও নতুন মাহ হাড়া যাবে না। রোটেনস ব্যবহারে সুক মাহ খাওয়া যাবে। পুকুরে বিভিন্ন রাসায়নিক বিশ ব্যবহার করেও মাহ মাহা যায় যেমন- কনসাল্লিন ট্যাবলেট। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে মাহ মাহা ঠিক নয়।

৪. চুন প্রয়োগ

পুকুর তরলতার পরে তলার চুন ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরের তলার সমস্ত সেওয়া হয়ে চাকের পিন চুন দিতে হবে। পুকুরে পানি থাকলে আশুঘিনিয়ারের বালতি বা ক্রানে চুন তলার পর ঠাক হয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা: ১) চুন মাটি ও পানির উর্বরতা বাড়ায় ২) পানির পিএইচ ট্রিক রাখে ৩) পানির সোলাডু কমায় ও পানি পরিষ্কার রাখে ৪) মাছের রোগ-বলাই দূর করে এবং ৫) সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

পুকুরের তলদেশের মাটির প্রকারভেদে, পুকুরের বয়স ও পানির পিএইচ মানের উপর চুন প্রয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। যেমন-ইউলফাটে, কাদামাটি ও লাল মাটির পুকুরে চুন একই বেশি সরকার হয়। বিশেষ পিএইচ মানের উপর ভিত্তি করে চুন প্রয়োগের মাঠে সেওয়া হলো-

পুকুর প্রকৃতির সময় চুন প্রয়োগের মাত্রা

পানির পি এইচ মান	চুনের (পুকুরে) পরিমাণ (কেজি/শতক)	সাধারণ প্রয়োগের মাত্রা
৩-৫	১২	সাধারণত আশ্বাসের দেশে প্রতি শতকে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করা হয়।
৫-৬	৮	
৬-৭	২	

৫. সার প্রয়োগ

সার প্রয়োগের কালে পানিতে সারের প্রাকৃতিক গাঢ়তা তৈরি হয়। মাছের প্রথম প্রাকৃতিক খাবার হচ্ছে ফাইটোপ্লাংকটন ও জুপ্লাংকটন। সার প্রয়োগের কালে পানিতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন-কসকরাস, পটাসিয়াম পানিতে মিশে। এ পুষ্টি উপাদান ব্যবহার করে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটন তৈরি হয়। আর ফাইটোপ্লাংকটনের উপর নির্ভর করে জু-প্লাংকটন তৈরি হয়। সার দুই প্রকার। ক) জৈব সার, যেমন-গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, খ) অজৈব সার, যেমন-ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ইত্যাদি। চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হয়। রোস্টোম্বল দিনে সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত। সার পানিতে গলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পুকুর প্রকৃতির সময় সার প্রয়োগের মাত্রা

জৈব সার		অজৈব সার	
সারের নাম	মাত্রা (শতক প্রতি)	সারের নাম	মাত্রা (শতক প্রতি)
গোবর	৫-৭ কেজি	ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
অথবা		টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম
মুরগির বিষ্ঠা	৩-৪ কেজি	এমওপি	২০ গ্রাম

৬. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পুকুরে গোলা মছদের পূর্বেই সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কয়েকটি পদ্ধতিতে এটি করা যায়।

ক) সেকিডিক: ২০ সেমি. ব্যাসবৃত্ত টিনের একটি সাদা-কালো খাল্য (একে সেকিডিক বলে) সুতা দ্বারা পানিতে ডুবানোর পর যদি ২৫-৩০ সেমি. পটীততার খাল্য না দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে। যদি ৩০ সেমি. এর অধিক পটীততা সেকিডিক দেখা যায় তবে বুঝতে হবে খাবার অনেক কম।

খ) হাত পটীকা: পানিতে হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে খাল্য পরিমাণ মতো তৈরি হয়েছে।

গ) গ্রাস পটীকা: একটি বাক্স কাতের গ্রাস দ্বারা পুকুরের পানি নিয়ে সূর্যের আলোর দিকে ধরলে যদি পানির রং সবুজ বা কাদামি সবুজ দেখা যায় এবং পানিতে অসংখ্য সূক্ষ্ম কণা ও ছোট পোকের মতো দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাণ মতো তৈরি হয়েছে।

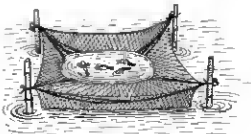
পরীক্ষা করার পথও যদি দেখা যায় খাল্য তৈরি হয়নি তবে আরও ২-৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপরও খাল্য তৈরি না হলে পুনরায় সার প্রয়োগ করতে হবে।



চিত্র: সেকিডিক ও গ্রাস পটীকা

৭. পানির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা

যে পুকুরে রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করে বাছ মারা হয়েছে সেখানে পোনা মজুদের ১ দিন পূর্বে পুকুরে ছাণা ছাণন করে অথবা কালকিতে বা গাভিলে পুকুরের পানি নিয়ে তাতে ১০-১৫টি পোনা ছেড়ে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখতে হবে। এসময় পোনা মারা না গেলে যোকা বাবে পুকুরের পানিতে কোনো বিধিক্রিয়া নেই। তখন পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।



চিত্র: পানির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা পদ্ধতি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ মাছের অভয়াশ্রম

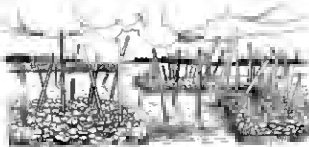
দ্বীপীয় মাছের আশ্রয়স্থানের এই বাংলাদেশে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের অভয়াশ্রয়ী জলাশয় যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং আরও রয়েছে ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিমি এর সুবিশাল বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের অভয়াশ্রয়ী জলাশয়ের শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগই হচ্ছে মুক্ত জলাশয় যেমন— নদ, নদী, বিল, সুন্দরবনের জলাভূমি, খাড়াই লেক, হাওর ও প্রাকৃতিক ভূমি। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ৪০.২৫ লক্ষ হেক্টর। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয় রয়েছে প্রায় শতকরা প্রায় ১২ ভাগ যার মধ্যে রয়েছে পুকুর, দিঘি, ডোবা, হাওর ও চিলিচি বাঘার। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ৬.৭৮ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ আসে অভয়াশ্রয়ী জলাশয় হতে এবং ২০ ভাগ আসে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ হতে।

সুন্দর ভাষাতে প্রাকৃতিকভাবে এসেগেল অভয়াশ্রয়ী মুক্ত জলাশয়সমূহে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ ধরা পড়ত। হাটের দশকে এর পরিমাণ ছিল মোট মৎস্য উৎপাদনের ৮০%। কিন্তু কয়েক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার, কৃষিকাজে কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্পায়নের ফলে পানি মূষণ, অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, নির্বিকারে তিস্তাঘাটা ও পোলা মছ মিলন, নদীতে অপরিষ্কার বর্জ্য ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিবেশের জনসাময়িকতার কারণে বর্তমানে অভয়াশ্রয়ী মুক্ত জলাশয় হতে এ উৎপাদন নেমে গিয়েছে প্রায় ৩৫% এ। বাকি উৎপাদনের ৪৭% আসে বিভিন্ন বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ থেকে এবং ১৮% আসে সামুদ্রিক মৎস্য হতে। মুক্ত জলাশয়ে ৬৭ উৎপাদনই নয় সে সাথে মাছের জীবাশ্মেচিহ্নও মিলে দিলে প্রায় পাঁচগুণ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে মোট ২৬০ প্রজাতির বাস্তুশিল্প মাছের মধ্যে ১২টি চরম বিপন্ন, ২৬টি বিপন্ন ও ১৫টি ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। যে প্রজাতি প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে অধিরূপে বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি মোকাবেলা করতে থাকে চরম বিপন্ন প্রজাতি (যেমন— পটপটী, মহাশোল, বাঘাখিড়), আর যে প্রজাতি অনুন্নত ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করতে থাকে বিপন্ন প্রজাতি বলে। অন্যদিকে যে প্রজাতি বিপন্ন বা হলেও বর্তমানে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করতে থাকে ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি বলে। বাংলাদেশের কয়েকটি বিপন্ন প্রজাতির মাছের উদাহরণ হচ্ছে— জামি, পাবনা, টেঁকো ইত্যাদি। আর ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হচ্ছে কলি, জলশা, কালশি, মেনি ইত্যাদি। মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবাশ্মেচিহ্ন সংরক্ষণের জন্য মাছের নিরাপদ আবাসস্থল বা অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। মৎস্য অভয়াশ্রম হচ্ছে কোনো জলাশয় বা এর একটি নির্দিষ্ট অংশ যেমন— কোনো হাওর, বিল বা নদীর কোনো অংশ যেখানে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বা সারা বছর বা জীবাশ্মেচিহ্নের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা পিছিত করা হয়। অনেক সময় উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে মাছ আহরণ যেন বা করা যায় একত্রে পাছের ডালপালা, বাঁশ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এতে করে সেখানে মাছ নিরাপদ আশ্রয় পায়, মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারে ও অবাধ প্রজনন ঘটতে পারে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভয়াশ্রয়ী মুক্ত জলাশয়ে প্রায় ৫০০টির মতো অভয়াশ্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের প্রণালী

১. মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের বা যেকোনো মাধ্যমে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নির্মিত করা যায়।
২. মাছের অবাধ প্রজনন ও বিচরণের সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ করা যায়।
৩. মাছের নিরাপদ আশ্রয় তৈরির মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রায় বা মাছের বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ করা যায়।

৪. মাছের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চিত করা যায়।
৫. প্রজননকর মাছকে বন্ধক মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ও মন্থন বৃদ্ধি করা যায়।
৬. ভালত পরিবেশে মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যায়।



চিত্র: মৎস্য অভয়প্রস্থ

ঝাঝ : শিক্ষাবীরা মৎস্য অভয়প্রস্থ প্রতিষ্ঠান ভবুৎ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করবে।

মতুল শব্দ : চরম বিপন্ন প্রজাতি, বিপন্ন প্রজাতি, বৃদ্ধিশূন্য প্রজাতি, অত্যন্তইঃ দুক্ত জল্যশয়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

দিনে দিনে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং সে সাথে ব'ড়ছে মাছের চাহিদাও। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কালে জেলেরা দেশের বিভিন্ন জলাশয় হতে গাছ ঘেঁটি বন্ধ সব মাছই ধরছে। এ থেকে রেহাই পাচ্ছে না পোনা মাছ ও প্রজননকর মাছও। কালে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে ক্রমাগতের মাছ উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এমনকি কিছু প্রজাতি হারিয়ে যেতে বসেছে। মাছের উৎপাদন ও জীব বৈচিত্র্য ধেন কমে না যায় বরং বৃদ্ধি পায় বা একটি প্রকল্পযোগ্য পর্যায়ে থাকে প্রজন্য সরকার মাছের আকার, প্রজনন ও বৃদ্ধির সময়, নিচনশঙ্কে ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করে ১৯৫০ সালে "মৎস্য তক্ষা ও সংরক্ষণ আইন- ১৯৫০" প্রণয়ন করে। এটি সংশোধনভাবে 'মৎস্য সংরক্ষণ আইন' নামে পরিচিত। পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য নিমিসমূহ হলো-

- ১। জলের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রতি বছর : ক) ছুলাই হতে ডিসেম্বর (আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেপ্টেম্বরের (৯ ইঞ্চি) নিম্নের কাতলা, দুই, মুগেল, কালবাউস, ঘনিয়া; খ) নভেম্বর হতে মে (কর্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি

মাস পর্যন্ত ২০ সেটিমিটারের (৯ ইঞ্চি) নিম্নের ইলিশ (বা “জটিকা” নামে পরিচিত); গ) নভেম্বর হতে এপ্রিল (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি) মাস ২৩ সেটিমিটারের (৯ ইঞ্চি) নিম্নের পাশাণ; ঘ) কেমুয়ারি হতে জুন (মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ৩০ সেটিমিটার থেকে (১২ ইঞ্চি) ছোট আকারের সিলন, বোয়াল ও আইড় মাছ ধরা, নিম্নের দখলে রাখা, পরিবহন বা বিক্রি করা নিষিদ্ধ।

- ২। চাষের উদ্দেশ্যে ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল-বিলে সংযোগ আছে এমন জলাশয়ে প্রতি বছর ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে আগস্ট (চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হতে চাদ্র মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত পোল, পল্লর, টাকি মাছের পোনার ঝাঁক বা মা মাছ ধরা ও ফলে করা যাবে না।
- ৩। জলসেচ, কন্যা নিরূপণ বা মর্গদার উদ্দেশ্যে ব্যতীত নদী-নালা, খাল এবং বিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী বাঁধ বা কোনোরূপ অবরোধের ব্যবস্থা করা যাবে না।
- ৪। নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপত্য মাধ্যমে (কিন্তু ইট-কিট) কন্যা আহরণ করা যাবে না, এমনকি ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপনা অপসারণ এবং বাজেরাজ করা যাবে।
- ৫। অভয়ারণ্য অধ্যক্ষকে বিধি প্রস্তুত, পরিবেশ সুস্থ, বাসিন্দিক বর্জ্য বা অন্যবিধ উপায়ে মাছ ফেলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।
- ৬। মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেটিমিটার বা কম ব্যাস বা সের্ভের বর্গে বিশিষ্ট বর্গসমাক (প্রচলিত নাম-কারেট জাল) ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- ৭। ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণ: সরকার ঘোষিত ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকার বছরের নির্ধারিত সময়গুলোতে কোনো ব্যক্তি কোনো মাছ ধরতে বা ধরার কার্যে লিপ্ত করতে পারবে না।
- ৮। ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ: ইলিশ মাছের জাতি প্রজননের সুযোগ সেওয়ার জন্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলোতে প্রতি বছর ১৫-২৪শে অক্টোবর (১-১০ই আশ্বিন) ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।
- ৯। শক্তি: (ক) প্রথমবার আইন তফসিলের শক্তি হবে কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের সশ্রম কার্যসমূহ এবং তদনন্তর সর্বোচ্চ ১০০০/- টাকা জরিমানা। (খ) পরবর্তীতে প্রতিবার আইন তফসিলের জন্য কমপক্ষে ২ মাস হতে সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কার্যসমূহ এবং তদনন্তর সর্বোচ্চ ২০০০/- টাকা জরিমানা।

নতুন শব্দ : জটিকা, কারেট জাল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ গৃহপালিত পাখির আবাসন

হাঁস-মুরগির আবাসন

পরিবারিকভাবে ১০-১৫টি হাঁস-মুরগি পালনের জন্য শুষ্ক ঘরেত্রে আশ্রয়ের জন্য ছোট বৌরায় বা বাসস্থান তৈরি করা হয়। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে খামারভিত্তিক হাঁস-মুরগি পালন করতে হলে এদের জন্য আবাসন বা বাসস্থান প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলোকে সাধনে রেখে পাখির বাসস্থান করা হয়ে থাকে। যথা-

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ১। অস্বাসনয়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। | ২। নিষিক্তভাবে বয়স নেওয়া যায়। |
| ৩। সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য। | ৪। খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা। |
| ৫। টিকা দেওয়া সহজ হয়। | ৬। বন্য পতপাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। |
| ৭। চোবের হাত থেকে রক্ষা করা। | ৮। ডিম সংরক্ষণ করা সহজ হয়। |
| ৯। খাদ্য ও পানি সরবরাহ সহজ হয়। | ১০। হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা। |
| ১১। লিটার সহজে পরিষ্কার করা যায়। | ১২। প্রতিক কম লাগে। |

হাঁসমুরগির আবাসনে তৈরি বাসস্থান

- ১। হাঁস-মুরগির আবাসনের স্থান নির্বাচন করা।
- ২। ঘরের ডিজাইন নির্বাচন করা।
- ৩। হাঁস-মুরগি পালনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঘর তৈরির পরিকল্পনা করা।
- ৪। হাঁস-মুরগির ঘর তৈরিকরণ।
- ৫। হাঁস-মুরগিকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেওয়া।

কাজ : শিক্ষার্থীরা, হাঁস-মুরগি আবাসন তৈরির বাসন্য লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

হাঁস-মুরগির আবাসনের স্থান নির্বাচন করা। হাঁস-মুরগির বাসস্থান বা ঘর এমন জায়গায় তৈরি করতে হবে যেখানে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে। যথা-

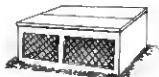
- ১। উষ্ণ ও বন্যাসূক্ত এলাকা হতে হবে।
- ২। বাজার, বাসাসূক্ত ও ব্যক্তি থেকে দূরে হবে।
- ৩। ডিম ও মাংস বাজারজাত করার সুবিধা থাকতে হবে।
- ৪। ভালো বাতাসাধিক ব্যবস্থা থাকবে।
- ৫। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা থাকবে।
- ৬। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা সম্পন্ন স্থান হতে হবে।
- ৭। অবিশেষত খামার বন্ধ করার সুযোগ থাকবে হবে।

ঘরের ডিজাইন

হাঁস-মুরগি পালনের জন্য আয়তাকার ঘর সবচেয়ে ভালো। হাঁসমুরগির সংখ্যার উপর ঘরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। তবে ঘরের দৈর্ঘ্য যদি হোক না কেন ৪.৫-৯.০ মিটারের মধ্যে হতে হবে। হাঁস-মুরগির ঘর পূর্ব পশ্চিমে পশাধুনি এবং দক্ষিণদুই হতে হবে। ঘরের ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে দু'ধরনের মুরগির ঘর বেশি দেখা যায়। যেমন-

- ১। গ্যাবল টাইপ
- ২। পেজ টাইপ

শেড টাইপ : শেড টাইপ বা একতলা ঘর খুব সহজেই তৈরি করা যায়। খোলা অবস্থার বা অর্ধ-আবদ্ধ অবস্থার হাঁস-মুরগি পালনের জন্য এ ধরনের ঘর খুবই উপযোগী।



চিত্র : শেড টাইপ ঘর



চিত্র : বাতুল টাইপ ঘর

প্যাকল টাইপ : প্যাকল টাইপ বা মোড়াল ঘর তৈরিতে খরচ বেশি হয়। এ ধরনের ঘরের ছাদ ঢালু থাকে। সাধারণত ঘের সব অঞ্চলে বেশি পুষ্টিশালী হয়, সেখানেকার জন্য প্যাকল টাইপ ঘর খুবই উপযোগী।

ঘরের ভিত্তিহীন যে প্রকারের হোক না কেন, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হাঁস-মুরগির খামারে নিম্নলিখিত ধরনের ঘর থাকবে। যথা-

- ১। **বাতুল ঘর বা ব্রুজার ঘর** -এখানে সত্যি ফোঁটা বাতুলের জন্য থেকে ৪ বা ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কুরিমভাবে তাপ রপ্তান, টিকা, সিঁটার, খাবার ও পানির ব্যবস্থা করতে হয়।
- ২। **বাতুল হাঁস-মুরগির ঘর বা ব্রুজার ঘর** -এখানে ডিম উৎপাদনকারী হাঁস-মুরগির বাতুলকে ৫/৭ সপ্তাহ থেকে ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।
- ৩। **বিষপাত্তা হাঁস-মুরগির ঘর** -এখানে ডিম উৎপাদনকারী হাঁস-মুরগি ২১ থেকে ৭২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

হ্যাচারি ঘর : যে খামারে বীজ ডিম থেকে ইনকিউবেটরের সাহায্যে বাচ্চা ফোটানো হয়, তাকে হাঁস-মুরগির হ্যাচারি খামার বলে এবং যে ঘরে বাচ্চা ফোটানো তাকে হ্যাচারি ঘর বলা হয়।

ব্রুজার ঘর : যে খামারে হাঁস উৎপাদনকারী ব্রুজার মুরগি পালন করা হয় তাকে ব্রুজার খামার বলে এবং যে ঘরে পালন করা হয় তাকে ব্রুজার ঘর বলা হয়। ব্রুজার ঘরে মুরগিকে ৪ বা ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

ঘর তৈরিকরণ

ছাদ বা ঢালা : ডিম, অ্যান্‌বোটাস এবং কয়েকশেটিক শিট দিয়ে ঘরের ছাদ তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে বালিগুটি উদ্দেশ্যে সিমেন্ট ও কংক্রিটের তৈরি ছাদ সবচেয়ে ভালো। গ্রামীণ পরিবেশে পারিবারিক হাঁস-মুরগির খামারে ছাদ ও উপযুক্ত পালের পাতা ব্যবহার করা যাবে।

মেঝে : ঘরের বেতের ওপর রাখার জন্য হাঁস-মুরগিকে ইটের মেঝে বা সাড়ার উপর রাখা উত্তম।

সেতাল : মুরগির ঘরের সেতাল ছাট, বঁশ, কঠ, ইট, তারের বেট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা যায়। সেতালের উচ্চতা ব্রুজারের ক্ষেত্রে ০.৩ মিটার (১ ফুট) ও হাঁসের ক্ষেত্রে ০.৬ মিটার (২ ফুট) পর্যন্ত দেওয়া যেতে

পারে। আর দেয়ালের উপরের অংশে তারের নেট দেওয়া হয়ে থাকে। তবে শীতের দিনে উপরের নেটের অংশটুকু চুষ্টের বস্তা বা ত্রিগল দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

দরজা : হাঁস-মুরগির ঘরের দরজা দক্ষিণ দিকে থাকতে হবে। ঘরের দরজা অকারে বড় হওয়া উচিত।

জানালা : ঘরের দখলদি পাশে নেট থাকার জানালা থাকে না। তবে, গ্রন্থ পাশ দেয়াল ছাড়া বন্ধ থাকলে জানালা দিয়ে হবে।

হাঁস-মুরগির প্রয়োজনীয় জায়গা : ঘরে হাঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। বয়সভেদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

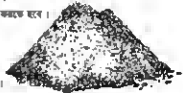
বয়স (বাস)	প্রতিটির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ (বর্গমিটার)		
	লিটার পদ্ধতি	খাঁচা পদ্ধতি	মাঠা পদ্ধতি
০-১ (১৫ দিন থেকে বয়স পর্যন্ত)	০.০৫ - ০.২৮	০.০২ - ০.০৭	০.০২ - ০.১৯

নকুল শব্দ : আবাসন, শেড টাইপ ঘর, গ্যানবল টাইপ ও হ্যাচারি ঘর

সপ্তম পরিচ্ছেদ গৃহপালিত পাখির খাদ্য

দেহের বৃদ্ধি, ভরণপোষণ ও উৎপাদনের জন্য খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যিক। মানব শস্য ও এদের উপজাতসমূহ গৃহপালিত পাখির (হাঁস-মুরগির) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হাঁস-মুরগির খাদ্যের পরিচালনায় যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তার ৭০ ভাগই খরচ হয় খাদ্য ক্রয় ব্যয়ে। নিম্নে খাদ্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

- ১। দান্যশস্য ও এদের উপজাতসমূহ ডাঙ্গা ও মানসম্মত হতে হবে।
- ২। খাদ্যে পাখির প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকবে।
- ৩। খাদ্য জীবাণু, ফটক ও পরজীবী মুক্ত হতে হবে।
- ৪। প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।
- ৫। খাদ্য স্বচ্ছমোশ্য ও সহজলভ্য হবে।
- ৬। খাদ্য খুব সুশীল হতে হবে।
- ৭। খাদ্যের উৎপাদন খরচ কম হতে হবে।
- ৮। খাদ্যকে যে কোনো প্রকার দূর্ণ্বসূক্ত হতে হবে।
- ৯। খাদ্য উপকরণ সহজলভ্য হতে হবে।



চিত্র : ফিল ফিল

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে পাখির রেশন তৈরি করা হয়। রেশন হচ্ছে ২৪ ঘন্টার কোনো পণ্ড বা পাখি দ্বারা পূর্তীয় খাদ্য। রেশন অবশ্যই পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ হতে হবে। যে রেশনে পাখির প্রয়োজনীয় পর্ক্যা, আমিষ, চর্বি, খনিজ দ্রব্য ও ভিটামিন উপস্থিত থাকে তাকে সুস্থ রেশন বলে। সুস্থ খাদ্য বা রেশনের কাজ নিম্নে দেওয়া হলো।

- ১। খাদ্য বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।
- ২। খাদ্য পরীয়ে শক্তি ছোপায়।
- ৩। খাদ্য দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- ৪। দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে।
- ৫। দেহ কোষের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে।
- ৬। দেহের পানির সমতা বজা করে।
- ৭। দেহে রক্ত চৈরিত্তে সাহায্য করে।
- ৮। দেহের রোগ প্রতিরোধ করে।
- ৯। ডিম ও মাংস উৎপাদনে সাহায্য করে।



চিত্র : লিনাক/ পাথরের ঝাঁড়া

মুরগির খাদ্য

যেহেতু মুরগি ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়, তাই ডিমপাড়া মুরগি ও ব্রহ্মার মুরগির জন্য পৃথক পৃথক রেশন তৈরি করা হয়। ডিমপাড়া মুরগি বা লেয়ার মুরগির ও প্রকার রেশনের নাম নিম্নে দেওয়া হলো।

১। সেয়ার স্টার্টার বা গ্রাফিক রেশন : ০-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত

২। বাড়ন্ত মুরগির রেশন : ৯-১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত

৩। ডিমপাড়া বা সেয়ার মুরগির রেশন : ২০-৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত

ত্রয়লার মুরগিকে ৩ প্রকার রেশন সরবরাহ করা হয়:

১। ত্রয়লার স্টার্টার বা গ্রাফিক রেশন : ০-২ সপ্তাহ পর্যন্ত

২। ত্রয়লার গ্রোয়ার বা বাড়ন্ত ব্যাকার রেশন : ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত

৩। ত্রয়লার ফিনিশার রেশন : ৫-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত

খাদ্য উপকরণ: মুরগির খাদ্য তৈরিকে প্রধানত সামান্যতা ও এদের উপভোগ্য ব্যবহার করা হয়। বেশন তৈরির জন্য সামান্যতা হিসাবে প্রধানত গম, ছুটা ও ছুলি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বসন্তকালিতে পরিবারিক মুরগি পালনে যে কোনো শস্যচারা যেমন, ধান, চাল, পুন্, ডাল, সরিষা ইত্যাদি মুরগিকে খেতে দেওয়া হয়। খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান, প্রাপ্যতা ও ব্যাকারের বিরোধনা করে বেশন তৈরির জন্য নির্বাচন করতে হবে। নিম্নে পুষ্টি উপাদানের বিষয় বিবেচনার রেখে খাদ্য উপকরণের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

পুষ্টি উপাদান	খাদ্য উপকরণ
শর্করা	গম, ছুটা, ধান, চাল, চালের কুঁড়া, গমের ছুলি ইত্যাদি।
কার্বিন	সুঁতি মাছের খঁড়া, তিলের বেল, সরিষার বেল, সরষিন তিল, তরুণ ভঁড়া ইত্যাদি।
প্রোটিন	বিভিন্ন উদ্ভিদ তৈল বেরন: পাম তৈল, তিলের তৈল, সরষিন তৈল ইত্যাদি।
খনিজ পদার্থ	খাদ্য লবণ, ভিন্দুক খোসা ছুরি, হাড়ের পুঁক, তিমের খোসা, চুনা পাথর ইত্যাদি।
ভিটামিন	শাকসবজি, ভিটামিন-মিশ্রিত প্রিমিক্স ইত্যাদি।
পানি	পরিষ্কার বিশুদ্ধ জীবাণুহীন পানির মত।

মুরগির খাদ্য গ্রহণ: সেয়ার ও ত্রয়লার মুরগির সৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ মুরগির জাত, বয়স, তাপমাত্রা, খাদ্যের মান, বাসস্থান, খাদ্যের আকার ও পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

বয়স	মুরগি (গ্রাম/দিন)	ত্রয়লার (গ্রাম/দিন)
প্রথম সপ্তাহ	১০	২৫
দ্বিতীয় সপ্তাহ	২০	৬৫
তৃতীয় সপ্তাহ	২৫	১০০
চতুর্থ সপ্তাহ	৩০	১৩০
পঞ্চম সপ্তাহ	৩৫	১৬০
ষষ্ঠ সপ্তাহ	৩৭	১৬৫
সপ্তম সপ্তাহ	৪০	---
অষ্টম সপ্তাহ	৪৫	---
নবম সপ্তাহ	৭০	---
বয়স	১১৫	---

কাজ : ১০০টি বাড়ত সেয়ার মুরগি ৭ সিনে কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা এককভাবে তা হিসাব করে প্রেসিডে উপস্থাপন করবে।

খাদ্য তৈরির নিয়মাবলি

গম বা ছুটাকে প্রথমে মেসিনে ভেঙে নিতে হবে। খেলকেন্ড ভালোভাবে ঠুঁড়া করে নিতে হবে। খাদ্য উপকরণ খাপর পাত্র ব্যবহার করতে হবে। খাদ্য তৈরির জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। প্রথমে গম বা ছুটা মেখে মেকতে ভালতে হবে। তারপর চালের বিহিকুঁড়া ও গমের তুসি, তুসির উপর চটকি মাছের ঠুঁড়া, তার উপর খৈল ও সরষাঝিন মিলে ভালতে হবে। এভাবে সবগুলো উপকরণ ভালার পর খাদ্যের ছুপটিকে একটি পিরামিডের মতো দেখা যাবে। এবার কিনুকের ঠুঁড়া, হাড়ের ঠুঁড়া ও লবণ ঐ পিরামিডের উপর ছিটকে দিতে হবে। এবার খাদ্য কেজি খাদ্য অলোয়া করে নিয়ে তার মধ্যে ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স উত্তমরূপে মিশ্রিত করতে হবে। এরপর মিশ্রিত ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স পিরামিডের উপর সমস্ত খাদ্য ছিটকে দিতে হবে। সরষাঝিন তৈল সেওয়ার প্রয়োজন হলে তা পিরামিডের চারদিকে ঢেলে দিতে হবে। এবার খাদ্যে ছুপটির ভিতরে বাত বাত ছুকিয়ে সবগুলো উপকরণ ভালো ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মিশ্রিত এ খাদ্য খাদ্যমি জরের দেখাবে।

মুরগির জন্য বর্ষাবাসে বিভিন্ন বাণিজ্যিক খাদ্য বাজারে পাওয়া যায়। এসব খাদ্য অত্যাধুনিক কিত মিলে তৈরি করা হয়। মুরগির বরস ও উৎসাহ অনুসারে বাজারে খাদ্য (পাউডার), ক্র্যাফল (দানা) ও শিলেট (যকি) আকারের খাদ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

সেয়ার বা ডিমপাড়া মুরগির খাদ্য তালিকার বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মিশ্রণ-

উপকরণের নাম	শতকরা হার (%)
গম/ছুটা কণ্ডা	৪৫-৫৫
গমের তুসি	৮-১২
চালের বিহিকুঁড়া	১০-১৫
ঝিলের খৈল	১০-১৫
চটকি মাছের ঠুঁড়া	১০-১২
কিনুকের তুঁড় ও হাড়ের ঠুঁড়া	১.৫-৭
লবণ	০.৫

বিশেষ প্রাণিক

১। ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ : উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় এ খাদ্যতালিকার সাথে যোগ করতে হবে।

২। জীবাণুনাশক বিতক পানি : পর্যাপ্ত পরিমাণ

বিভিন্ন বয়সের ত্রয়দার দুগ্ধদার খাদ্য জালিকা :

উপাদান	প্রারম্ভিক রেশন (%)	কৃতি রেশন (%)
গম/জুটা ভাঙ্গা	৬০	৬২
চালের মিহি কুঁড়া	১৫	১২
ভিলের খেল	১২	১০
গুটকি মাছের গুঁড়া	১৪	১২
সয়াবিন মিল	৮	৯
সয়াবিন তৈল	-	২
হাড়ের গুঁড়া	১.৫	২.৫
খাদ্য লবণ	০.৫	০.৫
সর্বমোট	১০০	১০০

তথ্য :

শিক্ষার্থীরা এককভাবে ১০০টি ত্রয়দার দুগ্ধদার ১৪ দিনের প্রারম্ভিক রেশন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

বিশেষ নোট

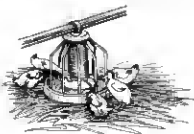
১। ডিটারিঙ্গ-বলিঙ্গ বিশেষ : উপাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষিক যত্না খাদ্যজালিকার সঙ্গে যোগ করতে হবে।

২। জীবাণুহীন বিচ্ছিন্ন পানি। পর্যাপ্ত পরিমাণ

লবন স্বাদ : ভরণপোষণ স্টার্টার রেশন, প্রেরার রেশন, ভিভিয়ার রেশন, লোয়ার রেশন। ম্যান, ক্র্যাফল ও গিলেট খাদ্য

ইসের খাদ্য

ইসকে জলাজ পানি বলা হয়। এরা খাল, বিল, পুকুর, হাওর ও নদীর ছোট জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। ইস খুললতা এবং খাবারের উচ্ছ্রীকরণে খেয়েও জালো উপাদান নিতে পারে। ইসের খাবারের সাথে পানি মিশিয়ে খাওয়ানতে হয়। ইস শুষ্ক খাবারের চেয়ে ভেজা খাবার খেতে খুব পছন্দ করে। তাই এসেরকে সবসময় গুঁড়া ও ভেজা খাদ্য সেওয়া উচিত। প্রথম ৮ সপ্তাহ ইসকে প্রচুর পরিমাণে খেতে সেওয়া উচিত। পরবর্তীতে সকালে ও সন্ধ্যায় মিলে দুইবার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। ইসের খাদ্যকে জলাশয়ের পর প্রথমে কয়েক দিন হতে তুলে খাওয়ানতে হয় যাতে করে বাজারা খাবার খাবার শিথিলে পাবে।



চিত্র : ইসের খাদ্য খাওয়া হচ্ছে



চিত্র : ইসকে খাদ্য সেওয়া হচ্ছে

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে সুরশির মতো হাঁসের রেশন তৈরি করা হয়। হাঁসের ৩ প্রকার রেশনের নাম নিচে দেওয়া হলো।

- ১। হাঁসের বাচ্চার বা আরম্ভিক রেশন : ০-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত
- ২। বাড়ন্ত হাঁসের রেশন : ৫-১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত
- ৩। ডিমশাড়া হাঁসের রেশন : ২০ সপ্তাহ থেকে বাকি সময় পর্যন্ত

হাঁসের খাদ্য গ্রহণ : হাঁসকে বরস ও উদ্দেশ্য অনুসারে ৩ প্রকার রেশন সরবরাহ করা হয়। হাঁসের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হাঁসের জ্ঞাত, বয়স, খাদ্যের মান, বাসস্থান ও খাদ্যের আকার ও পরিবেশনের উপর নির্ভর করে।

বয়স	হাঁস (গ্রাম/দিন)
প্রথম সপ্তাহ	১৫
দ্বিতীয় সপ্তাহ	২৫
তৃতীয় সপ্তাহ	৩০
চতুর্থ সপ্তাহ	৩৫
পঞ্চম সপ্তাহ	৪০
ষষ্ঠ সপ্তাহ	৪৫
সপ্তম সপ্তাহ	৫০
অষ্টম সপ্তাহ	৫৫
বাড়ন্ত	৮৫
বয়স্ক	১২৫

বিভিন্ন বয়সের হাঁসের রেশন

উপকরণের নাম	উপকরণের শতকরা হার (%)
জুয়ার গুড়া	৪৫-৫০
ধানের কুঁড়া	১০-১৫
খৈল	১০-১৫
সয়াবিন মিল	৮-১০
উটকি মাছের গুঁড়া	৮-১০
শামুকের খোসা চূর্ণ	১.৫-৬.৫
খাদ্য লবণ	০.৫

নোট : একটি বয়স্ক হাঁস ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত যেটি কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা এককভাবে তা হিসাব করে প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ পৰাদিপত্তৰ খাদ্য

এণী বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য আবশ্যিক। যা কিছু মেয়ে স্বাভাৱিকৰূপে গৃহীত হয় এবং পরিপাক, শোষণ ও বিশাৰণৰ মাধ্যমে দেহে ব্যবহৃত হয় বা শক্তি উৎপাদন কৰে তাকে খাদ্য বুলে। যেমন- গম, ভুট্টা, বাস, খৈল, ছুঁই ইত্যাদি।

প্রচলিতভাবে পৰাদি পত্তৰ খাদ্যকে প্রধানত নিম্নোক্ত দুইভাৱে ভাগ কৰা যায়।

১। আঁশ জাতীয় খাদ্য (Roughage feed)

২। দানাভাৱ খাদ্য (Concentrate feed)

আঁশ জাতীয় খাদ্য

হাফেলজাতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ আঁশ (Fiber) এবং কম পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। যেমন- যে কোনো খড়, প্রাকৃতিক বা চাষ কৰা সবুজ ঘাস, বে, সহীসেজ প্রভৃতি। হাফেল জাতীয় খাদ্য পৰাদিপত্তৰ চাৰপকুঁমি থেকে পেয়ে থাকে বা ঘাস কেটে পতকে সৰুসৰু কৰা হয়। ছুঁইখাদ্যৰ বিচাৰে সিটিং জাতীয় ঘাস যেন- বাসফা-বাসফা, ফাইলি, ফোৰি, বাসফাই, ইণ্ডি-ইণ্ডি ইত্যাদিতে বেশি পৰিমাণ প্রোটিন, শক্তি, ভিটামিন ও অনিষ্ট পৰ্য্যায় সাধনৰ ঘাসৰ চেয়ে বেশি থাকে। সাধাৰণ ঘাসৰে যথো ভুট্টা, পেঁচিয়ার, গুয়া, জাৰ্মান প্রভৃতি প্রকাশ। এ জাতীয় ঘাসেৰে সুবিধা হ'লে হেঁচৰ এটি এৰ ফলন খাদ্যৰ ঘাসেৰ চেয়ে বেশি হয়।

দানাভাৱ খাদ্য

যে খাদ্যে কম পরিমাণে আঁশ এবং বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায় তাকে দানাভাৱ খাদ্য বলা হয়। দুখাল বা ঘাসে উৎপাদনকাৰী পৰাদি পত্তৰ কেমে জু আঁশজাতীয় খাদ্য সৰুসৰু কৰলে কাৰিকৰ ফল পাতয়া থাকে না। সেয়েহে পৰ্য্যায় পরিমাণে দানাভাৱ খাদ্য সৰুসৰু কৰাৰে হবে।

দানাভাৱ খাদ্যকে নিম্নোক্ত উপাৰে ভাগ কৰা যায়-

ক) প্রাচীন উল-কিমিল, ব্রাইলি, ফেনার মিল প্রভৃতি।

খ) উলিউ উল-গম, ভুট্টা, বাৰ্লি, সৰুগম, খুস, খৈল, ছুঁই, ছুঁই প্রভৃতি।

এ ছাড়াও পৰাদি পত্তৰ খাদ্যে বনজ উপাদান হিচাবে কিছু কিছুকৈৰ ভঁড়া, ফিমের খোঁসৰ ভঁড়া, হাঁড়ের ভঁড়া প্রভৃতি, ভিটামিন হিচাবে পাখাজাতীয় সবজি, ভিটামিন- কিলকিল হিচাবে এবং খাদ্য অনুৰূপ হিচাবে কিছু এণ্টিবায়োটিক, হৰমোন প্রভৃতি প্ৰয়োগ কৰা হয়।

বাংলাদেশে পৰাদিপত্তৰ খাদ্যেৰে প্রাণভাৱ স্বত্ব হেমে পৰ্য্যায় পৰিচালিত হয়। সবুজ ঘাস বছৰেৰে একটি নিৰ্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায় এবং একলো যদি সঠিকভাবে সৰুসৰু কৰে তাখা যায় তাহলে সারা বছৰ সবুজ ঘাসেৰ অপব্যৱস্থা থাকবে না।

সুই পদ্ধতিতে ঘাস সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

ক। সাইলেন্স

খ। হে

সাইলেন্স

রসায়ন অবস্থার ফুল আসার সময় সবুজ ও সতেজ ঘাসকে কেটে টুকরা করে সেগুলো বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করতে সাইলেন্স বলে। বাণিজ্যিকভাবে সাইলেন্সিটে সাইলেন্স সংরক্ষণ করা হয়। ভুট্টা, নবগাম, আলকা-আলকা থেকে প্রস্তুতকৃত সাইলেন্সে বেশি পরিমাণে পানি পাওয়া যায়।

সাইলেন্স ব্যবহারের সুবিধা

- ১। দীর্ঘ দিন পুষ্টিমান অক্ষুণ্ণ থাকে।
- ২। সঠিক সময়ে ঘাস কেটে সেগুলো জার্করী খাবার হিসাবে পর্বাসিপত্যের সরবরাহ করা যায়।
- ৩। এতে হে-এর তুলনায় কম পুষ্টিমান অগতঃ হয়।
- ৪। সাইলেন্স তৈরির ফলে ঘাসের জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়।
- ৫। সাইলেন্স ঠাণ্ডা ও অর্ধ্র আবহাওয়াতেও তৈরি করা যায়।

সাইলেন্স তৈরির পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরনের ঘাস দিয়ে সাইলেন্স তৈরি করা যেতে পারে। ভুট্টা ও আলকা-আলকা দিয়ে তৈরি সাইলেন্স অত্যন্ত উন্নত মানের হয়। ভুট্টার সাইলেন্স পর্বাসি পত বিশেষ করে দুগ্ধ পাণ্ডের জন্য অত্যন্ত উপকারী। ভুট্টার সাইলেন্সে বেশি পরিমাণে পুষ্টি উপাদান থাকে।

ভুট্টার গাছের গোড়ার কাগের গাছ আসার সাথে সাথে সাইলেন্স প্রস্তুতের জন্য ভুট্টা কাটার উপযোগী হয়। এ সময়ে ভুট্টা গাছের বয়স পর্বাসির পরিমাণ ৩০-৩৫% হয়। ভুট্টা গাছগুলোকে ছুঁই থেকে ১০-১২ সেমি উঁচুতে কাটা হয়। এরপর একতরফে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়। টুকরা করা ঘাস পরে বায়ুরোধী অবস্থায় রেখে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। তবে বর্তমানে গরুর পরিবারে পলিথিন দিয়ে তৈরি বস্ত্র আকরের ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়। টুকরা করা গাছগুলো ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে বায়ু মুখ বন্ধ করে সেগুলো রাখতে বাতাস চলাচল করতে না পারে। এভাবে সংরক্ষণ করলে কোনো পুষ্টি উপাদান না হারিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময়ে পান্ডকে সরবরাহ করা যায়।

সাইলেন্স তৈরির সময় পাছ টুকরা করা ও বায়ুরোধী করার উদ্দেশ্যে:

- ১। পান্ডের জন্য বেশি পরিমাণে গাছের সুগার অবশ্যই হতে পারে।
- ২। বায়ুরোধী হলে সুস্থভাবে পান্ড সম্প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয়।

কোনো খাদ্য উপাদানের অপর ব্যতিরেকে যার সংরক্ষণের জন্য এটা একটা কার্যকর ব্যবস্থা। সাইকেল বায়ুবোদী পরিবেশে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ অল্পই হলেও কঠিনকর ইস্ট, মোত, ব্যাকটেরিয়ার সংশ্লেষণ থেকে দীর্ঘদিন রক্ষা করে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

হে

হে অতি পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত খাদ্য বা সারা বছর খাবার পদার্থকে সংরক্ষণ করা যায়। সবুজ ঘাসকে শুকিয়ে এর আর্দ্রতা ২০% বা তার নিচে নামিয়ে এনে হে প্রস্তুত করা হয়। হে তৈরির জন্য এক বা একাধিক লিপিউম জাতীয় ঘাস চাষ করা যায়। লিপিউম ঘাসে সাধারণ ঘাসের তুলনায় বেশি মাথার হোটিম, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকে। লিপিউম ঘাসের মূলো জাইলোবিরাম নামক ব্যাকটেরিয়া বায়ুজলের লাইট্রোজেন ধরে রাখে যা হোটিম পর্বনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে লিপিউম ছাড়াও সাধারণ ঘাস দিয়ে হে তৈরি করা যেতে পারে।

গুণগত মানের হে-এর বৈশিষ্ট্য

হে এর খাদ্যমান ঘাসের গুণগতমানের উপর নির্ভর করে। হে-এর গুণগতমান ঘাসের পুষ্টিগুণ, পাতার পরিমাণ, ঘাসের হাং প্রকৃতি দ্বারা স্থগায়ন করা হয়ে থাকে।

- ১। হে এর জন্য ব্যবহার করা পাতা সবুজ হতে হবে। হে পর্বতি পরিমাণে শুক হতে হবে। পাতার পরিমাণ এমন হতে হবে যাতে দুই-তৃতীয়াংশ পুষ্টি উপাদান পাতার মধ্যে থাকে।
- ২। হে শুকান সবুজ বর্ণের হতে হবে যাতে এর পরিমাণে কলোরোটিন বা ভিটামিন এ বিদ্যমান থাকে। বেশি আর্দ্রতা হওয়ার কারণে বা অত্যধিক শুকনের কারণে হে বাদামি বর্ণের হতে পারে যেটা পুষ্টি উপাদান কমে যাওয়ার নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হবে।
- ৩। হে আগাছামুক্ত হতে হবে।
- ৪। হে মোড় ও খুশা বালিহীন হতে হবে।
- ৫। হেতে খাওয়ার উপযোগী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পত্র থাকতে হবে।

হে তৈরির পদ্ধতি

গাছ কাটার সময় : হে তৈরির জন্য সঠিক পুষ্টিগুণ প্রাপ্তির সময়ে গাছ কাটতে হবে। যত কম বয়সে গাছ কাটা যাবে, হে এর গুণগতমান তত বেশি হবে। যত বেশি বয়সে গাছ কাটা যাবে, হে এর গুণগতমান তত কমে যাবে। তবে মূল আলার সময় কাটাই উত্তম।

সঠিকভাবে চকানো : হে তৈরির সময় গাছকে সঠিকভাবে চকাতে হবে যাতে করে মোত মুক্ত ও অতিরিক্ত আগাছা অবশ্যই সংরক্ষণ করা যায়। গাছগুলোকে হ্রত চকতে হবে এবং অতিরিক্ত সূর্যের আলো পরিহার করতে হবে যাতে করে আলো মানের হে এর বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে রাখা যায়। গাছ কেটে গেলে উলটাপালট করে এমনভাবে সেড়ে দিতে হবে যাতে করে অভিস্রাবের পাতা করে না যায়। সবুজ ঘাসে সাধারণত ৭৫-

১০ ভাণ্ড অর্ধভা থাকে। সেখানে ভালো মানের হে তে সর্বোচ্চ ২০-২৫ ভাণ্ড অর্ধভা থাকে। রোনে শুকানোর সময় কৃষ্ণের পাকিতে ভেজানো যাবে না।

হে সংরক্ষণ : হে অবশ্যই শুক অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কাজ : ১। শিকারীরা আশঙ্কাতীর বাসের পরিবর্তে শুধু খানাদার খাল্য সরবরাহ করে গবাদি পশু পালন সত্ত্ব্য কিনা এ বিষয়ে প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।

২। শিকারীরা সাইলেন্স টেরি কবরে এবং এর দাপড়লো লিখে জমা দিবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আঙ্গুর কোন রোগে ব্যাপক ক্ষতি করে ?

ক. আঙ্গুর মড়ক রোগ

খ. ভলে পড়া রোগ

গ. কাঁড়পড়া রোগ

ঘ. ভাইরাসজনিত রোগ

২. পুরুষের পানিতে প্রবীড়িত অগ্নিবেশ কত গ্রাম হওয়া প্রয়োজন ?

ক. ২ মি গ্রাম/লিটার

খ. ৩ মি গ্রাম/লিটার

গ. ৫ মি গ্রাম/লিটার

ঘ. ৭ মি গ্রাম/লিটার

৩. গোল আঙ্গুর মড়ক রোগ দেখা দেয় -

i. শিল্প তাপসম্মত

ii. ফল কুয়াশায়

iii. অতিরিক্ত সূর্যের সময়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দেশ্যকটি পড় ও ৩ ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফরিদা বেগম তার বাড়ির দক্ষিণ পাশের ১৫ শতকের একটি পুকুর ঘাছ চাষের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি তার পুকুরে উপযুক্ত মাত্রার সার ও তুলন প্রয়োগ করেন। শোলা ছাড়ার পর সেখা সেল অধিকাংশ শোলাই মাঝা দিয়েছে।

৪. ফরিদা বেগমের পুকুরের জন্য কয় কেজি তুলন প্রয়োগ করতে হবে?

ক. ২০ কেজি

খ. ২৫ কেজি

গ. ৩০ কেজি

ঘ. ৩৫ কেজি

৫. পুকুরের শোলা দূরীকরণের কারণ—

i. পানির তাপমাত্রার পার্থক্য

ii. অক্সিজেনের পরিমাণের আক্রমণ

iii. অক্সিজেনের তীব্রতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন

২. কনক বড়ুয়া পদ্ম পালকের জন্য চাষের জমি ভৈরি করেছেন। কচা মৌসুমে তার চাষের জমিতে ব্যাপক ছাড়ে দান উৎপাদন হলো ৩০০ কচ মৌসুমে দানের চাষের মৌসুমে পানির দান। এক্ষণে তার পদ্মপালের সারা বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য কচা মৌসুমে বর্ধিতপদ্ধতিতে পদ্মপালের ব্যবস্থা করলেন। এরপর কনক বড়ুয়া তার প্রতিবেশী অনেককেই উক্ত পদ্ধতিতে পদ্ম-খাদ্য সংরক্ষণের উদ্বুদ্ধ করলেন।

ক. পদ্ম-খাদ্য কাকে বলে?

খ. দান্যজাতীয় খাদ্য ফীভাবে পদ্ম উৎপাদন করার ব্যাখ্যা কর।

গ. কনক বড়ুয়ার পৃথক পদ্ধতিটির বৈধি কৌশল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কনক বড়ুয়ার কার্যক্রমটি সুপায়ন কর।

২. বেকার যুবক মহিবুদ্দাহ বজড়া পট্টী উন্নয়ন একাডেমী থেকে মনো চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে মাহ চাষের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ৫০ শতাংশের পুকুর সংস্কার করে কার্প জাতীয় মাহ চাষের জন্য প্ররম্ব করেন। এয়োজনীর সার এয়োনের পর মাহের পোনা বহুল করেন। বহুল পরবর্তী সময়ে সার এয়োনের জন্য সেকিডিক ব্যবহার করে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করে এয়োজনীর সার এয়োণ করেন। বর্তমানে সকল মতগ্য চাষি হিসাবে তিনি এলাকার পরিচিত।

ক. মাহের চাষের জন্য পুকুরের পানিতে প্রতি লিটারে কী পরিমাণ প্রবীকৃত অক্সিজেনের প্রয়োজন।

খ. চুন পাথরের পানির শুপলত রাস বৃদ্ধি করে ব্যাপ্য কর।

গ. মহিবুদ্দাহ তার পুকুর প্ররম্বের সময় ককটুকু সোকার এয়োণ করেছিল হিসাব করে দেখাত।

ঘ. মহিবুদ্দাহের পুকুরে সার এয়োণ পদ্ধতি অর্ধের অগার রোম করে বেশি উৎপাদনে সাহায়ক বিশ্রেবণ কর।

তৃতীয় অধ্যায় কৃষি ও জলবায়ু

এ অধ্যায়ে প্রথমে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া সহিষ্ণু কসল ও কসলের জাতের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে কসল, মসল ও পতপাখি উৎসাহননে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষ দিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কসল, মসল ও পতপাখির অভিযোজন কৌশল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আশে-

- বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু কসলের জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
- বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু কসলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কৃষি ক্ষেত্রে (কসল, মসল ও পতপাখি) উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
- কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কসল, মসল ও পতপাখির অভিযোজন কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কসল, মসল ও পতপাখির অভিযোজনের উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিরূপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু কসল ও কসলের জাত

অইম প্রেসিডে আরব্বা প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া সম্পর্কে স্নেহেহি। কসলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বহুধর বিত্তিন্ন সনহে বিত্তিন্ন ধরনের প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়া বিরাজ করে। শীতকালে অতি শৈত্য বা কম শৈত্য পড়়া, গ্রীষ্মকালে অতি উচ্চ তাপমাত্রা, ধরা, লবণাক্ততা, বন্যা বা জলবিচ্ছতা হলো বাংলাদেশের কসল উৎপাদনে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া। পূর্বপ্রকৃতি ও যদাবধ ব্যবস্থাপনা না থাকলে এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ বা বিরূপ আবহাওয়ার ফসলের কসল ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। বিরূপ আবহাওয়া বা প্রতিকূল পরিবেশে কসল উৎপাদনের পূর্ব শর্ত হলো উপযোশী কসল বা কসলের জাত নির্বাচন। বিত্তিন্ন ধরনের বিরূপ আবহাওয়া বা প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু কসল বা কসলের জাত রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু কসলের প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু নতুন জাত ঘের করেছেন এবং আরও জাত ঘের করার জন্য পরবেষণা চলিয়ে যাচ্ছেন। আরব্বা এখন বিত্তিন্ন ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়া-সহিষ্ণু কসল বা কসলের জাত নিয়ে আলোচনা করব।

শৈত্য সহিষ্ণু কসল

বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল। শীতকালে দেশের সবিন্ন আশময়্যা জামুচারি মাসে হয়ে থাকে। শীতকালে সর্বোচ্চ পড়় তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন পড়় তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। জামাদের দেশে শৈত্য বেশি পড়়লে এবং শৈত্যজা নির্বহুয়ী হলে শীতকালীন কসল, যেমন-গোলামালু ও পমের কসল ভালো হয়। তবে গোলা আমম ও বোরো ধানের পরাণাকণ ও লামা গঠনের সময় শৈত্য বেশি পড়়লে অর্থাৎ আশময়্যা কমে গেলে ডিটী হয়ে কসল কমে যায়। এ সময় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে এবং কমেককিম এ ধবহা হুয়ী হলে কসল ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এ জন্য সঠিক সময়ে বীজ বপন ও চারা গোপন করতে হবে। প্রি ধান ৩৬ ও প্রি ধান ৫৫ এ দুটি শৈত্য সহিষ্ণু ধানের জাত। এর মধ্যে ১টি জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো:

প্রি ধান ৫৫ : এ জাতটি ২০১১ সালে অনুমোদন লাভ করে। আগম ও উচ্চকসলশীল এ জাতের গাছের উচ্চতা ১০০ সেমি, বোরো বৌসুমে হেটর হরি পড়় কসল ৭ টন এবং অউশ বৌসুমে ৪.৫ টন। বোরো বৌসুমে জাতটি থাকিপ্রি শৈত্য সহ্য করতে পারে বলে দেশের শৈত্য-একল এলাকায় চাষ করা যায়। তাছাড়া জাতটি শাকারি লবণাক্ততা এবং খরাও সহ্য করতে পারে। জাতটির জীবনকাল বোরো বৌসুমে ১৪৫ দিন এবং অউশ বৌসুমে ১০০ দিন।

ধরা সহিষ্ণু কসল

আমরা জানি পড়় বৌসুমে একটানা ২০ দিন বা তার অধিক দিন কোনো বুটিপাত না হলে তাকে ধরা বলে। অন্যবুটি বা বুটিপাতের বহুতার কারণে জ্বিতে পানির ঘটিতি দেখা দায়। ফলে উদ্ভিদ সেহে প্রয়োজনীয় পানির ঘটিতি দেখা দেয়। এ অবস্থাকে ধরা কবলিক বলা হয়। প্রতিবছর দেশে রবি, বরিণ-১ ও বরিণ-২ বৌসুমে ৩০-৪০ লাখ হেটর জমি বিত্তিন্ন যাত্রার করার সমুখীন হয়। এতে করে করার উত্ত্বতা অনুযায়ী ১৫-২০ তাণ কসল ঘটিতি হয়ে থাকে। ধরাপ্রবণ এলাকার কসল চাষের কল্যাকৌশল সম্পর্কে আমরা অইম

প্রেমিতে বিস্তারিত জেনেছি। সেসব কৌশলের মধ্যে অন্যতম কৌশল হলো খরা এবং এলাকার খরা সহিষ্ণু কলস বা ফসলের জাত চাষ করা। সাধারণত খরা সহিষ্ণু কলসের মূল খুব দৃঢ় ও শাখা-প্রশাখামুক্ত এবং গভীরমূলী হয়। এ সব ফসলের শাখা ছোট, সরু, পুরু বা শেঁচালো হয়ে থাকে। পেছুর, কুশ, অড়ের, ডরমুজ, অনেক জাতের গম ইত্যাদি খরা সহিষ্ণু কলস। এখন আমরা প্রথম প্রথম কয়েকটি খরা সহিষ্ণু কলসের জাত সম্পর্কে জাণেচেনা করবো।

কাজ : শিক্ষার্থীরা খরা ও শৈত্য-সহিষ্ণু কলসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে এবং খরা-সহিষ্ণু কলস ও ফসলের জাতের আপেক্ষা তৈরি করে প্রেমিতে উপস্থাপন করবে।

খরা সহিষ্ণু ধানের জাত :

ত্রি ধান ৫৬ ও ত্রিধান ৫৭ দুইটি খরা সহিষ্ণু ধানের জাত। এর মধ্যে ত্রি ধান ৫৭ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

ত্রি ধান ৫৭ : এ জাতটি গোপা আমন। গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেমি জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। প্রসারণ পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৮-১৪ সিন বৃষ্টি না হলেও কলসের ভেতর কোনো ক্ষতি হয় না। খরা অবসিত অবস্থার জাতটি হেট্রোমর্ফি ৩.০-৩.৫ টন এবং খরা না হলে ৪.০-৪.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। ত্রি ধান ৫৬ ও ত্রি ধান ৫৭ এর জীবনকাল কম হলে এরা খরা সহ্যের শাখাশাখি খরা ঝড়াতের পারে।

খরা সহিষ্ণু গমের জাত :

বারি গম ২০ (গৌরব) ও বারি গম ২৪ (প্রদীপ) দুইটি খরা সহিষ্ণু গমের জাত। এর মধ্যে বারি গম ২৪ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

বারি গম ২৪ (প্রদীপ) : এ জাতটি অম্বর বাটো, উচ্চ ফলনশীল এবং খরা সহিষ্ণু। এ জাতের পাতা চওড়া, বাকানো ও হালকা সবুজ রঙের। জাতটির জীবনকাল ১০২-১১০ দিন এবং ফলন ৪.০-৪.১ টন/হেক্টর।

ঈশ্বরদী ৩৫ : এ জাতটির ফলন ৯৪ টন/হেক্টর। আখের অন্যান্য খরা সহিষ্ণু জাতের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৭, ঈশ্বরদী ৩৯ ও ঈশ্বরদী ৪০ ইত্যাদি।

খরা সহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত :

বারি ছোলা-৫ (গাবনাই) : হালকা সবুজ রঙের এ জাতের গাছের উচ্চতা ৫০ সেমি বীজ ছোট, মনুণ ও মূলর বানামি রয়েছে, জীবনকাল ১২৮-১৩০ দিনের এবং ফলন ২.৪ টন/হেক্টর হয়ে থাকে। খরাগ্রস্ত বসন্তে এলাকার অটোবরের শেষ সত্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সত্তাহের মধ্যে এ জাতের ছোলা বপন করতে হয়। খরা সহিষ্ণু অন্যান্য জাতের মধ্যে রয়েছে বারি বার্লি-৬, বারি বেজন-৮, বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ ও বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, সবকি বোল্ডান ইত্যাদি।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু কলস

লবণাক্ত মাটি থেকে কলসের পানি সত্তাহ করতে অসুবিধা হয়। লবণাক্ততার মাত্রা বেশি হলে কলস জন্মতে পারে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের দক্ষিণ-পূর্বের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত সহিষ্ণু কলস বা ফসলের জাতের আবাদ এলাকা বাড়তে হবে।

নিচের ছকে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও লবণাক্ততার সন্তোষজনক কিন্তু ফসলের তালিকা দেওয়া হলো :

উত্তম লবণাক্ততা সহিষ্ণু	মধ্যম লবণাক্ততা সহিষ্ণু	লবণাক্ততা সন্তোষজনক
নারিকেল	শিমি আলু	শিম
সুপারি	গোল আলু	লেবু
ভাল	মরিচ	কমলা
হার্শি	করবটি	গাজর
খেজুর	মুগ	পিঁপাজ
সুপারবিট	খেসারি	স্ট্রবেরি
শালগম	মটর	মসুর
তুলা	বর	আম
বৈকর	ছুটা	ডালিহ
শালখোক	টমেটো	
	আমড়া	
	পেয়ারা	

উপকূলীয় লবণাক্ততা এলাকার খান প্রথমে কলস। খানের কিছু স্থানীয় ও উন্নত জাত রয়েছে যারা বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। স্থানীয় জাতের মধ্যে রয়েছে- হাজশাইল, কাজলশাইল, বাজাইল, কালামানিক, পরজা, পাবুগা ইত্যাদি। বাংলাদেশ খান পরবেলা ইন্সটিটিউট ইতোমধ্যে বেশ কিছু লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের খান বের করেছে। যেমন- প্রি খান ৪০, প্রি খান ৪১, প্রি খান ৪৭, প্রি খান ৫৩, প্রি খান ৫৪ ও বিনা খান ৮। এইসব জাতের মধ্যে ২টি প্রধান জাতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

প্রি খান ৪৭ : ২০০৬ সালে এ জাতটি লবণাক্ততাক্ষম এলাকার বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। এ জাত চারা অবস্থায় বেশি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং বরফ অবস্থায় নিম্ন হতে মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। জাতটির গাছের উচ্চতা ১০৫ সেমি জীবনকাল ১৫২ দিন এবং লবণাক্ত পরিবেশে হেটেরোটি ৬ টি কলন দিতে সক্ষম।

বিনা খান ৮ : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি পরবেলা ইন্সটিটিউট থেকে ২০১০ সালে লবণাক্ততা সহনশীল এ জাতটি বের হয়। বোরো মৌসুমের এ জাতটির জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। লবণাক্ত এলাকার হেটেরোটি কলন ৪.৫-৫.৫ টি। জাতটির বিভিন্ন ধরনের রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাও রয়েছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সন্তু উপকূলবর্তী এলাকায় চম উপযোগী লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে প্রেসিডে উপস্থাপন করবে।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু অন্যান্য কস্যের জাত

বারি আলু-২২ (সেকত) : এ জাতের আলুর আকার লম্বাটে গোলা এবং লাল রঙের। জাতটির ফলন ২৫-৩০ টন/হেক্টর।

বারি মিষ্টি আলু-৬ ও ৭ : এ জাত দুটোর আলুর খোসার ঝেঁ পাত্ কমলা রঙের, ভিতরটা হালকা কমলা রঙের। আলুতে মধ্যম মাত্রার ক্যালোসিনি এবং শুক পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। ফসল সাড়েই ভরবে ১২০-১৩৫ দিন সময় লাগে। জাত দুটি সাধারণ পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৪০-৪৫ টন এবং লবণাক্ত পরিবেশে ১৮-২০ টন ফলন দিতে পারে।



চিত্র : বারি আলু ২২



চিত্র : বারি মিষ্টি আলু ৬

বারি সরিষা-১০ : এ জাতের সরিষার গাছ খাটো, উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি, জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন এবং ফলন ১.২-১.৪ টন/হেক্টর। জাতটি লবণাক্ততার পাশাপাশি খরাও সহ্য করতে পারে।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু আরেক জাত

ঈশ্বরদী ৩৯ ও ঈশ্বরদী ৪০ এর মধ্যে ঈশ্বরদী ৪০ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ঈশ্বরদী ৪০ : ঈশ্বরদী ৩৯ জাতের মতো এ জাতটিতেও উচ্চমাত্রার চিনি পাওয়া যায়। উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম পরিপক্বতা ওপসম্পন্ন এবং অল্পল ভেঙ্গে ফলন ৮৫-৯৫ টন/হেক্টর। এ জাতটিও লবণাক্ততার পাশাপাশি খরাও সহ্য করতে পারে।



চিত্র : ঈশ্বরদী ৪০

বন্যা বা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসল

বাংলাদেশে প্রতিবছর কম-বেশি বন্যা হয়ে থাকে। বন্যাজনিত সাময়িক জলাবদ্ধতা ছাড়াও দেশের কিছু অঞ্চলে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন-পুলশ ও বশের জেলার ভবনই এলাকা। বন্যার কারণে বা অন্য কোনো কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা, জলায় উদ্ভিদ ছাড়া বেশিরভাগ উদ্ভিদ সহ্য করতে পারে না।

দেশের বিস্তৃত বন্যাপ্রাণ এলাকার প্রধান ফসল ধান। বন্যা সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের গভীর পানির আমদ ধানের মধ্যে রয়েছে- বাজাইল ও সুলকড়ি। কয়োর পানির উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে এ সব জাতের ধান পাড়ের উচ্চতাও বাড়তে থাকে। এমনকি দিনে ২৫ সেমি প্ৰকৃত বাড়তে পারে এবং ৫ মিটার গভীরজাতও বেঁচে থাকতে পারে। উঁচু জাতের আমদ ধানের মধ্যে আছে ব্রি ধান ৪৪। এ জাতের ধান জেলার-ভাটি অঞ্চলে ৫০ সেমি উচ্চতার প্রাচন সহ্য করতে পারে।

বন্যপ্রাণ এলাকার বন্যার পানি নেমে গেলে নদী জরতের অধীন খান চাষ করে বন্যার ক্ষতি পুষ্টিয়ে নেওয়া যায়। নদী জরতের মধ্যে রয়েছে-বিআর ২২ (কিরণ) ও বিআর ২৩ (দিশারী)। কিরণ ও দিশারী জাত দুইটি দেশের বন্যা গ্রবণ এলাকার বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর থেকে ১৫ই আশ্বিন পর্যন্ত রোপণ করা যায়। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে ৪০-৫০ দিনের চারাও রোপণ করা যায়। কলে উঁচু জোয়ার থেকে কল বীজে। আশ্বিন মৌসুমে এ এলাকার চাষাবাসের জন্য সম্প্রতি বের হওয়া জাত দুটি হলো- ব্রিধান ৫১ ও ব্রিধান ৫২।

ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২ : চল বন্যপ্রাণ এলাকার অধীন মৌসুমে চাষাবাসের জন্য ২০১০ সালে এ জাতটি অনুমোদন লাভ করে। এ জাত দুটির চারা রোপনের এক সপ্তাহ পর ১০-১৪ দিন পানির নিচে ছুবে থাকলেও চারা মরে না বিচার ফলন করে না। অন্যতম পরিবেশে এ জাতের জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন ও ফলন ৪.৫-৫.০ টন/হেক্টর এবং বন্যাকমলিত হলে জীবনকাল ১৫৫-১৬০ দিন ও ফলন ৪.০-৪.৫ টন/হেক্টর।

জলাবদ্ধতা বা ক্যাঁা সহিষ্ণু অন্যান্য কস্যের জাত

আখের জাত

ঈশ্বরালী-৩২ : বন্যা বা জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু এ জাতটির ফলন হেক্টরপ্রতি ১০৪ টন।

ঈশ্বরালী-৩৮ : এ জাতের আখের উচ্চমাত্রার চিনি থাকে। জাতটি ব্রহ্ম বর্ধনশীল ও আগাম পরিপক্বতা গুণ সম্পন্ন। জাতটির ফলন ১১০ টন/হেক্টর এবং উচ্চমাত্রায় ক্যাঁা সহিষ্ণু। এ জাতগুলো ছাড়াও ঈশ্বরালী-৩৪, ঈশ্বরালী-৩৬, ঈশ্বরালী-৩৭, ঈশ্বরালী-৩৯, ঈশ্বরালী-৪০ জাত উঁচু মজার বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

কেনাকের জাত

বালাশেপ পাট পরেমণ্য ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত বিজ্ঞানসাহায্যে কেনাক-৩ (বট কেনাক) জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। কেনাক পাটের মতো একধরনের আঁশ কসল। এ জাতের কেনাকের পাতা অখণ্ড ও বট পাতার ন্যায় এবং ফলন ৩.৫ টন/হেক্টর।

ক্যাঁা। শিকারীরা বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু কসল ও কস্যের জাতের প্রালিকা তৈরি করে প্রেসিতে উপস্থাপন করেছে।

দকুন শব্দ। শৈত্য সহিষ্ণু কসল, বন্যা বা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু কসল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিক্ষেত্রে প্রভাব

বাংলাদেশে কলস উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

সূত্রীয় শুষ্ক থেকেই পৃথিবীর জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে শীতী ও উষ্ণতর বসবাস উপযোগী হয়ে উঠে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের এ ধারা অত্যন্ত দীর ব্যতিতে অব্যাহত ছিল। কিন্তু বিপদ এক মাত্রকে পৃথিবীর অনেক দেশে জলবায়ুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কালে জলবায়ু পরিবর্তন প্রকৃতিতে বিস্তৃত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত বিশ্ব। নদস্রাব, বার্ষিক সন্ধ্যা, কলসের খাদ্যের প্রসার, জলসিঁড়ি জেল ও কলসার ঘনত্ব বাবহার, খুশনিখল ইত্যাদির কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। কলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আজ বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন দেশ বলে চিহ্নিত হয়েছে। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট (২০০৭-০৮) বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জৈবগতিক অবস্থান এবং জু-গ্যাক্টিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ আসে থেকেই পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্বোপভবন দেশ। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দুর্বোপের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। IPCC (Inter Governmental Panel on Climate Change) সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে—

- ১। বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ১৯৮৫-১৯৯৮ সালের মধ্যে যেখানে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চর তাপে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২। বাংলাদেশের ৮ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে লবণাক্ততা দেখা দিচ্ছে।
- ৩। বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বন্যা হয়েছে অর্ধাৎ জলবায়ু বন্যার সংখ্যা বেড়েছে।
- ৪। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে।
- ৫। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের সোনা গালি নীলগেবে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবেশ করেছে।

দেশের পরিবেশ ও উৎপাদন প্রেক্ষাপটসমূহ বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের কালে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঋণিগুণ পাত হচ্ছে কৃষি খাত। জলবায়ু পরিবর্তনের কালে দেশে বিভিন্ন রকম বিস্তৃত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে; যেমন—

- ১। গ্রীষ্মকালে অতি উত্তম তাপমাত্রা
- ২। অসিঁড়িত ও অসময়ে বৃষ্টিপাত
- ৩। বর্ষা সময়ে অধিক বৃষ্টি এবং ভরা কালে জলবহুতা ও জুখিল
- ৪। শুষ্ক মৌসুমে কম বৃষ্টিপাত
- ৫। বন্যার জলবহুতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি
- ৬। অ্যাকশিক বন্যা ও শরীর কালে কলসহানি
- ৭। অতিরিক্ত ঠান্ডা ও গরম
- ৮। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও ক্ষতিগ্রস্ত
- ৯। স্বচ্ছ-জলোচ্ছ্বাসের প্রতিক্রিয়া ও সংখ্যা বৃদ্ধি
- ১০। কুলাঙ্গা, পিলবুটি ইত্যাদি

কাজ : শিকারীরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের বিপন্ন আবহাওয়ার একটি তালিকা তৈরি করবে।

কলস উৎপাদনে তাপমাত্রার প্রভাব

আমরা আগেই জানেছি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি গ্রীষ্ম ও শীতকালে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির অত্যন্তবিক আচরণ লক্ষ করা যাবে। কখনো কখনো গ্রীষ্মকালে অতি উষ্ণ তাপমাত্রা এবং শীতকালে অত্যধিক শীত পড়তে দেখা যাবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে উষ্ণ শীতের ফলন কমে যাবে এবং গায়ে রোগের অক্রমণ বেড়ে যাবে। এখনকার চেয়ে দেশের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে গম চাষ সম্ভব হবে না। আলু ও অন্যান্য শীতকালীন ফসল উৎপাদনে এসে সমস্যা। ধানের জন্য অগাধ পানির তাপমাত্রা হলো ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফুল ফোটার সময় ধানপাখ সবচেয়ে বেশি ক্ষতের। এ সময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও বেশি হলে চিটার পরিমাণ বেড়ে যায়। গিল্লি তাপমাত্রার কারণে ধানপাখের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ধানপাখ হললে বর্ণ ধারণ করে, ধানের চারা দুর্বল হয় এবং ফসলের স্বীকৃতিশক্তি বেড়ে যায়।

ফসল উৎপাদনে বরষার প্রভাব

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে বরা অন্যতম একটি প্রাকৃতিক সূর্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। ফসলের বৃদ্ধি পর্ষায় পল্ল বৃষ্টিপাতের অভাবে মাটিতে পানি শুষ্যতা সৃষ্টি হয়। কম বৃষ্টিপাত ও অধিক হারে মাটি থেকে পানি বাষ্পীভূত হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে বরষার প্রভাব দেখা দেয়। সেসে প্রতি বছর ৩০-৪০ সেন্টিমিটার জলি বিভিন্ন মাত্রার বরষা কলিত হবে থাকে। বরাগ্রহণ এলাকার ফসলের ফলন নির্ভর করে বরষার বীভ্রতা, বরষা স্থিতিশক্তি এবং ফসলের বৃদ্ধি পর্ষায়ের উপর। ফসলে ক্ষতির মাত্রার উপর নির্ভর করে বরষাকে দিন রাপে ভাগ করা হয়। যেমন-

- ১। বীভ্র বরা (৭০-৯০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হই)
- ২। স্বাভাবিক বরা (৪০-৭০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হই)
- ৩। সাধারণ বরা (১৫-৪০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হই)

কাজ : শিকারীরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ফসল উৎপাদনে বরষার প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করবে ও প্রেনিজে উপস্থাপন করবে।

ফসল উৎপাদন মৌসুমের উপর ভিত্তি করে বরষাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- গ্রীষ্ম বরা, বরিশ-১ বরা ও বরিশ-২ বরা।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের উষ্ণ-পশ্চিমফসে বরষা বীভ্রতা বৃদ্ধি পাবে। স্বাভাবিক, উপাধীনবাবগত, মিনাকপুর, বড়কা, কুষ্টিয়া, সশোর, ঢাকা ও টাঙ্গাইল জেলের কিছু অংশে বীভ্র বরা গ্রহণ এলাকা। বংপুর ও বহিগাল জেলা এবং মিনাকপুর, কুষ্টিয়া ও বংগের জেলের কিছু অংশে স্বাভাবিক বরাগ্রহণ এলাকা। তবে বর্তমানে তিন্তা নীতে পানিগ্রহণ হ্রাস পাওয়ার সত্বে মৌসুমে তিন্তা অববহিকার বরষা বীভ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বরাগ্রহে খাপ বাওয়ালের কৌশল হিসাবে চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন, কম পানি লাগে এমন ফসলের চাষ, জাবকা গ্রোথ ইত্যাদি পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে উপগ্রহণী ফসলের চাষ কমেতে হবে। বরা সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের জিন্সন ও এর আবার এলাকা ব্যাহতে হবে। বরষা কমেতে ধান লাগাতে বেশি সেচি হলে মাটি ও বরা সহিষ্ণু জাতের ফল চাষ করতে হবে। আমন ধান বড়ির প্তা বরা সহিষ্ণু ফসল বেমন- হলো চাষ, সেসে ফসল হিসাবে বিদেশে চাষ জনপ্রিয় করতে হবে।

ফসল উৎপাদনে লবণাক্ততার প্রভাব

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে লবণাক্ততার প্রভাব দেখা যায়। ঝড়, তসলুজ্জাল এবং গ্রন্থল জোয়ারের ফলে সুই বন্দ্যার স্রাব্যতা লবণাক্ত পানি দিয়ে জমি ছুঁবে যাওয়ার মাটিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মাটির নিচের লবণ উপরে উঠে আসে। ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। বর্তমানে লবণাক্ততার আক্রান্ত জমির পরিমাণ ১০.৫৬ লাখ হেক্টর। অর্থাৎ প্রায় ১৬.৮৯ লাখ হেক্টর উপকূলীয় জমির ৬২.৫২% বর্তমানে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততার আক্রান্ত। লবণাক্ততার মাত্রার উপর ভিত্তি করে লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—

- ১) খুব সামান্য লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি
- ২) সামান্য লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি
- ৩) মধ্যম লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি
- ৪) তীব্র লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি ও
- ৫) জরি তীব্র লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি

ফুলশা, বাসেহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, কালকাঠি, পিরোজপুর, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর জেলার অনেক এলাকা লবণাক্ততার আক্রান্ত হয়েছে। ফলে এ সব এলাকার কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ভাগমাত্রা বৃদ্ধি ও কম বৃষ্টিপাতের কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ঝুঁকি আরও বাড়বে। বৈশ্বিক ভাগমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার লঙ্ঘন করে অনেক এলাকার লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়বে। এরমধ্যেই উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৫০% জমি বিভিন্ন মাত্রায় প্রাণিত হওয়ার সঠিকভাবে ব্যবহৃত করা যায় না। তদুপরি উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ার ফসল চাষ আরও হ্রাসের মুখে পড়বে।



কাজে। শিখারীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রভাবতা জানিয়ে প্রদর্শন করবে।

এমতাবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীল ফসল এবং ফসলের অনেক চাষ উপকূলীয় এলাকার জনগির করতে হবে। লবণাক্ত সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের উন্নয়ন ঘটতে হবে। লবণাক্ত এলাকার চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৃষিকান্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অমল মৌসুমে বিয়ার ২০, প্রি ধান ৪০, প্রি ধান ৪১ এবং বোয়ো মৌসুমে প্রি ধান ৪৭, বিনা ধান ৮ জাতের চাষ করতে হবে।

কসল উৎপাদনে জলাবদ্ধতা বা বন্যার প্রভাব

প্রতি বছর সেলের প্রায় ২৫% জমি বন্যার কারণে বিভিন্ন মাত্রার প্রভাবিত হয়। যে থেকে সেন্টেফর হাস পর্বত সময়ে এ সেপে বন্যা হয়ে থাকে। সেলের মেটি উৎপাদিত গাংবা শস্যের ৬০ আশের বেশি এ সময় উৎপাদন হয়। খন কন বন্যার কারণে কুমকোরা ছাটীর জাতের আমল খন চাষে বাধা হয়ে পড়ে, কারণ এসব জাত পঞ্জির পানিতে জন্মাতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার তীব্রতা, স্থায়িত্ব ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

যত্ন-জলোচ্ছ্বসজ্ঞানিত বন্যা উপকূলীয় এলাকার ব্যাপক ক্ষতি করে। জমিতে লবণাক্ত পানির জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। কসে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে কসল চাষের অনুপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। কজলাজার, চট্টাম, সুনাকপল, সিলেট, নেত্রকোণা, নীলকাহারী ইত্যাদি জেলা চল বন্যার শিকার হয়। প্রায় প্রতিবছর এ সব অঞ্চলের হাজার হাজার একর জমির পাক খোঁচো ধল কর্ভসেই আগেই চল বন্যার অভিযন্তে হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এক হাজার চারশত বর্গকিলোমিটার এলাকা এ ধরনের চল কসে গ্রহণ।

বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণ ও সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আরও বেশি বাধ, দুইস পেট নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিবে। একসো নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশনত নিক জালোচায়ে বাড়াই করে দিতে হবে। কোসো হকম কুল হসে পীর্দিস আর হসেদে দিবে হবে। ফশের ও খুলা জেলার ডবল এলাকার জলাবদ্ধতার প্রকৃষ্টি উদ্যোগ।

ঘাশ খাওয়ারের বৌকল হিসাবে চল বন্যাক্রম এলাকার প্রচলিত কসলের জাতের চেয়ে আগাম পাকে এমন জাতের ফল চাষ করতে হবে। ত্রি ধান ২৮, ত্রি ধান ৪৫ চাষ করলে ত্রি ধান ২৯ এর থেকে আগে পাকে। বেশের মধ্যাংশে কসো পরবর্তী সময়ে লবী জাতের ধান, বেঙ্গল-নইজারখিল, বিহার ২২, বিহার ২৩ এবং ত্রি ধান ৪৬ চাষ করতে হবে। কসার কারণে বীজতলা তৈরির জমি না পেলে লাপাণ পদ্ধতির বীজতলা তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী সময় দ্রুত শাকসবজি ও অন্যান্য কসল চাষের জন্য কুমকসের কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

কাজ : শিকারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা ও জলাবদ্ধতার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করবে এবং খাতার লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

দকুন শব্দ : তীব্র বরষা, সাধারণ বরষা, হালি বরষা, বরিশ-১ বরষা, বরিশ-২ বরষা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অভিযোজন কলাকৌশল

কসলের অভিযোজন কলাকৌশল

আমরা জানি প্রতিকূল পরিবেশে উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের শাটীরবৃষ্টির ও জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নেয়। এ খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে। কসলের অভিযোজন কৌশলের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কৃষিক্ষেত্রের প্রতিকূল পরিবেশে চাষাবোধ বিভিন্ন ধরনের কসলের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এ পরিচ্ছেদে আমরা খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা বা অন্য ইত্যাদি প্রতিকূল বা বিজগ পরিবেশে কসলের অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করব।

কসলের খরা অভিযোজন কৌশল

খরা সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি। খরা অবস্থায় কসলের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় বনের বাটতি থাকে, বাতালে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে, তাপমাত্রা বেশি ও সূর্যালোক প্রচুর থাকে। এ অবস্থায় কসল খরা এড়াতে ও খরা প্রতিরোধ করার মাধ্যমে টিকে থাকে।

১। খরা এড়ানো

খরা অবস্থায় কসলের অভিযোজনের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো খরা অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া। সুউপাত্ত শুষ্ক হওয়া ও খরা অবস্থা শুষ্ক হওয়ার সম্ভাব্যতা সময়ে জীবনমাত্রক শেষ করে খরা কবলিত না হওয়ার কৌশলকে খরা এড়ানো বলে।

আবাদকৃত কসলের মধ্যে কিছু কিছু জাতের কসল রয়েছে যাদের জীবনকাল স্বল্প। কোনো কোনো কসলের আবাদ জাত স্বল্প সময়ে পরিপক্বতার কারণে দুই-একটি খরা এড়ানো পারে। কসলের তুল, ফল বাগণ ও পরিপক্বতার কাল স্বল্প হলে খরা এড়ানো পারে। যেমন- ফেলনের তুল কেটো হতে দান্দা পরিপক্ব হতে ১৭-২০ দিন সময় লাগে। কালে খরাগ্রন্থন এলাকায় ফেলন চাষ করে খরা পূহ হওয়ার পূর্বেই কসল তোলার সম্ভব।

২। খরা প্রতিরোধ

প্রাকবসিত অবস্থায় কসলের টিকে থাকার কৌশলকে খরা প্রতিরোধ বলে। কসলের খরা প্রতিরোধ কৌশলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- ক) খরা সহ্যকরণ ও খ) খরা প্রতিরোধকরণ। আমরা এখন খরা সহ্যকরণ কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

ক) কসলের খরা সহ্যকরণ কৌশল

কসল খরাত পতিত হওয়ার পরও সেহকাত্তরে স্বল্প পানি সংরক্ষা নিয়ে টিকে থাকার অবতাকে খরা সহ্যকরণ বলে। এ সব কসল খরা অবস্থা চলে গেলে পুনরায় বাতাবিক বৃষ্টি ও তুল-ফল বাগণ করে। কসলের খরাসহ্যকরণ কৌশলগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১। কোলের পানিশূন্যতা প্রাধিকার : এ ধরনের কসল খরা অবস্থায় কোলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি জমিয়ে রাখে। কসে কোলভাগের উচ্চতর অতিপ্রবণ ঢাশ বজায় থাকে। কোষ থেকে পানি ভরিয়ে যায় না এবং কোষ তুলসে যায় না। খরার সময় তুলার কসলে এটা লক্ষ করা যায়।

- ২। **মোটী কোষ গ্রাহ্যতা :** অনেক কসলে পাতার কোষে পানির পরিচালন কমে গেলেও কোষ গ্রাহ্যতার মোটী হওয়ার কারণে পাতা নেকিড়ে পড়ে না।
- ৩। **উপোসাকরণ :** কিছু কিছু উদ্ভিদে বহু কবলিত অবস্থার সাপেক্ষসংগ্ৰহণ প্রক্রিয়ার হার কমিয়ে দেয়। এ অবস্থার পাতার কোষ দেখিয়ে পড়লেও রসী কোষ বিভিন্ন প্রকার দ্রাব ভূমিতে যেখানে রসসঞ্চিত চাপ বজায় রাখে এবং স্বল্প সময়ের কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে সীমিত পর্যায়ের সাপেক্ষসংগ্ৰহণ বজায় রাখে। এভাবে বহুকালীন অবস্থার উদ্ভিদ কোষে কতকটা বেঁচে থাকে।
- ৪। **গ্লোমিন ও গ্লোমিন অসাকরণ :** বহুর প্রভাবে উদ্ভিদ দেহের গ্লোমিন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ দেহে গ্লোমিন বেশি মাত্রায় থাকলে তা বহু প্রতিক্রিয়ায় সাহায্য করে। আবার গ্লোমিন ক্ষেত্রে নানা রকম বিঘ্ন দ্রব্য উপস্থিত হতে পারে। এ জন্য কিছু কিছু উদ্ভিদ গ্লোমিন মাত্রার এক ধরনের রাসায়নিক সীমা চেষ্টা করে বা এ বিঘ্নদ্রব্যের ব্যাপ্তির কমিয়ে কসপকে বহু সহায়ীল করে তোলে।
- ৫। **কোষ পর্বেদন শূন্যতা :** উদ্ভিদের অল্প কয়েক বহু সহ্য করার সামর্থ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উদ্ভিদের যে সব অঙ্গে কোনো কোষ পর্বেদন থাকে না, সে সব অঙ্গ বহু সহায়ীল হয়। যেমন- বগ্নার কারণে কোনো কোনো উদ্ভিদের পাতা মরে গেলেও পত্র সুস্থ থাকে না। পর সুস্থ বহু সহ্য করে এবং বহুর অবস্থান হলে বৃদ্ধি পেতে থাকে।
- ৬। **সুপ্তাবস্থা :** অনেক বছরব্যাপী উদ্ভিদের বহু অবস্থার মাটির উপরের অংশ মরে যায় কিন্তু মাটির নিচে কল/বাহু/রাইজোম ইত্যাদি আকারে সুপ্তাবস্থা বেঁচে থাকে। অনুকূল পরিবেশে এগুলো অঙ্কুরিত হয়।
- ৭। **কসলেদ্র বহু পরিহারকরণ কৌশল**
আমরা আগেই জানেছি কসলের বহু প্রতিক্রিয়ার কৌশল সুইচ, বহু- বহু সহায়করণ ও বহু পরিহারকরণ। নিচে কসলের প্রধান প্রধান বহু পরিহারকরণ কৌশলগুলো বর্ণনা করা হলো :
 - ১। **পত্রবহু নিরসরণ :** অনেক কসল পত্রবহু খেলা ও বহু হস্তক্ষেপে নিরসরণ করে গ্রন্থদন প্রক্রিয়ার পানির অপর্যাপ্ত হ্রাস করে বহু অবস্থা মোকাফেলা করে। যেমন-ঘন ও লম্বা জাতের অনেক গম কসল সবালের দিকে অঙ্গ সমস্তের জন্য পত্রবহু খেলা রাখে এবং দিনের বাকি সময় পত্রবহু বহু রাখে। আবার অনেক কসলের কোষে পানি ঘটিত হলে এক প্রতিক্রিয়ায় ডাঙমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পত্রবহুর আকার কমিয়ে দেয়, পত্রবহু বহু করে দেয়। শিমের অধিকার জাত এভাবে বহু পরিহার করে। আবার অনেক কসলের পাতার পত্রবহুর সংখ্যা কম থাকে, পত্রবহু পাতার ছোট ছোট তীক্ষ্ণ বা গর্তের মধ্যে থাকে। ফলে গ্রন্থদন কম হয়, পানি সংরক্ষিত থাকে।
 - ২। **গ্রন্থদন নিরসরণ :** অনেক কসল বহুর পতিত হলে পাতার উপর লিপিত জমা করে গ্রন্থদন হারকে কমিয়ে দেয়; যেমন- সন্ধ্যাব কসল। আবার অনেক কসল পাতার উপরে মোম বা ঘন রোমের আবরণ সৃষ্টি করে গ্রন্থদন হ্রাস করে।
 - ৩। **পাতার আকার হ্রাসকরণ :** অনেক কসল বহুকালীন অবস্থার পাতার আকার হ্রাস করে গ্রন্থদন কমিয়ে দেয়; যেমন- ফেলন। পাতার কিনারা বা পাতার অগ্রভাগ পুড়িয়ে অনেক উদ্ভিদ পাতার আকার হ্রাস করে।

- ৪। **পান্না ভরাসো :** খরার দ্বারা বৃদ্ধি পেলে অনেক কসল নিচ থেকে পুরাতন পান্না করিয়ে গ্রাফেনড্রাস করে। ভূদা, জিনাবাদাম, জোরার ও ফেলনের এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। খরার অবসান হলে এ ধরনের কসলে কচের শীর্ষ বা পাতার তল থেকে পুনরায় কুশি পড়ায়। খরার কসে ইমিডিন (এনজাইম) উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটে।
- ৫। **সালোকসংশ্লেষের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ :** কিছু কসল পত্রের নিরঙ্গুণের মাধ্যমে গ্রাফেনড্রাস কসলেও পত্রের সারাহায্যে পুনরায় কস পরিমার্জন কার্যে ডাইক্লোরাইড গ্রহণ করে বেশি পরিমাণ খাদ্য তৈরি করে। ভূদা, জাখ ইত্যাদি কসলে এটা দেখা যায়।
- ৬। **দক্ষ মূলবৃদ্ধি :** কিছু কিছু উদ্ভিদ মূলের টার্মা, সংখ্যা ও খন্ড বৃদ্ধিরে অধিক পরিমাণ পানি আহরণের মাধ্যমে খরা অবস্থা মোকাফেল করে; যেমন— ভূদা, ভূদা ও পমের অনেক জাত্রে এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। মূলের অধিক গভীরতা ও খন্ড একই কসলে বিপ্রাক্ষয় থাকলে সে কসল অধিক বর্ষা প্রতিরোধী হয়। যেমন— জোরার ও বাঙরা। আবার খইমড়া, ভূদা, অকুংর গভীরমূলী হওয়ায় বর্ষা প্রতিরোধী হয়।
- ৭। **পান্না মোড়ানো ও পান্না বৃদ্ধিকরণ :** অনেক দানা কসল; যেমন— জোরার, কাটিন পাতার আকার গ্রাসকরণ হাফাও খরা পরিবেশে পান্না বৃদ্ধির করে। আবার অনেক কসল পান্না বৃদ্ধিরে সূর্যাসোক গ্রাসের আয়তন কমিয়ে নেয়। কসে এসেই গ্রাফেনড্রাস করে বাঙরার কারণে পানির অপচয়গ্রাস পাণ এবং পরা পরিবেশে ধপ খাইয়ে নেয়।
- ৮। **পাতার নিক পরিবর্তন :** অনেক উদ্ভিদে খরা অবস্থায় সূর্যাসোকের সাথে বা বাঙাজাবে পাতার নিক পরিবর্তন করে। কসে গ্রাফেনড্রাস হারগ্রাস পেয়ে পানি সাশ্রয় হয়। জিনাবাদাম, ভূদা ও ফেলনসহ আরও অনেক বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ এ প্রতিকার খরা প্রতিরোধ করে।

কাজ : শিক্ষাবীরা কসলের খরা অভিযোগের কৌশলগুলো পাতার লিখে এবং প্রেসিতে উপস্থাপন করবে।

ফসলের লবণাক্ততা অভিযোগের কল্যাণকর

অষ্টম শ্রেণিতে আমরা লবণাক্ত পরিবেশে কসল উৎপাদন কল্যাণকর সম্পর্কে জানেছি। লবণাক্ততার প্রতি সাদা প্রবাদের উপর ভিত্তি করে কসলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; ক) হ্যালোফাইটস— গোলাপান্না, বেগুড়া ও গ) ট্রাইকোফাইটস— সুগারবিট, শিম, ভূদা। হ্যালোফাইটস জাতীর উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশে অধুবিভ হলে সেখানেই জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে যা ট্রাইকোফাইটস পারে না।

লবণাক্ত এলাকার বৃদ্ধিকা পানিতে অতিরিক্ত সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির ক্যালসিয়াম ও সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকার পানির ফল্গু বেশি থাকে। এ পরিবেশে উদ্ভিদকে টিকে থাকতে হলে উদ্ভিদের কোষ রসের ফল্গু বৃদ্ধিকা পানির ফল্গু থেকে বেশি হতে হয়। বেশি না হলে উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি বা খাদ্যোপাদান শোষণ করতে পারে বা, উদ্ভিদ পানি হারিয়ে নেতিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উদ্ভিদ কোষের রসসীক্তি বজায় রাখার জন্য মাটি হতে বিভিন্ন প্রকার আয়ন (K^+ , Na^+) আহরণ করে লবণাক্ততার এ বাধা অতিক্রম করে। এতে করে উদ্ভিদের মেমব্রানকে আয়নের অধিকার ঘটে। কিছু লবণ সহ্যকারী উদ্ভিদ আয়নের অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো কোনো প্রজাতির পাতার একধরনের লবণ জালিকা থাকে যার মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ন বের করে দিতে পারে। আবার কোনো কোনো প্রজাতি পাতার আয়তন বাড়িয়ে শরীরে ফল্গুর ফল্গু কমিয়ে নেয়। কোনো কোনো প্রজাতিতে পাতার কোষে অতিরিক্ত আয়ন জমিয়ে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে।

কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যারা লবণাক্ত পরিবেশে আয়তন অর্জন না করে অন্য উপায় অবলম্বন করে। এ সব উদ্ভিদের মূলের কোষের বসবাসীতি বজায় রাখার জন্য কোষ পর্দার বিভিন্ন প্রকার জৈব দ্রাব্য জমা করে রাখে। এ ধরনের উদ্ভিদের কোষ পর্দারের আয়তন কোষের মোট আয়তনের ৯৫% হয়ে থাকে। কোষ পর্দারের জমা করা জৈব দ্রব্যের মধ্যে সালোক-সংশ্লেষণজাত স্ট্রোমাই বেশি থাকে।

জলবদ্ধ অবস্থার বা বন্যার কসনের অভিযোজন কল্যাণকর

জলক উদ্ভিদ ছাড়া অধিকাংশ কসল কন্যা বা জলবদ্ধ বা মুক্তিক পানির সম্পৃক্ত অবস্থার বেঁচে থাকতে পারে না। এ অবস্থার মাটিতে অক্সিজেনের অভাবে উদ্ভিদের মূল শ্বসনকর্ম চলাতে পারে না। যত দ্রুত মাটি বা পানিহীন দ্রবীভূত অক্সিজেন শেষ হয়ে যায় এ সব উদ্ভিদ তত দ্রুত মারা যায়। ধান পানি পছন্দকারী উদ্ভিদ। ধান পাছে এয়ারনকাইমা তিস্য থাকে। এ তিস্যের মধ্যে প্রচুর বায়ু কুঁইরি থাকে। বায়ু কুঁইরিতে অক্সিজেন জমা থাকে। কসে ধানপাছ ভুবে বা খেলে কন্যা বা জলবদ্ধ অবস্থার বেঁচে থাকে এবং ভালো ফলন দেয়। তবে অনেক দিন ভুবে থাকলে মারা যায়। পটীর পানির আয়তন ধান কন্যার পানি বাত্বার সাথে সাথে উচ্চতায় বাত্বতে থাকে। এ সব জাতের ধানপাছের পর্ব মধ্যে এক ধরনের জাজক কলা থাকে বা কন্যার পানি বাত্বার সাথে সাথে দ্রুত বিজারিত হয়ে পাছের সৈনিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে কন্যা মোকাবেলা করে। আবার লম্বা জাতের ধান উচ্চতায় কাটলে কন্যা এড়াতে পারে।

উচ্চ তাপমাত্রা অভিযোজন বৌশল

উচ্চ তাপমাত্রার কসনের সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের হার কমে যায়। শ্বসনের কুলনার সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি করে। এ অবস্থায় কসনের প্রোটিন জেমে যায়, পানির অপচয় হয়। তাপ সন্থ্যশীল উদ্ভিদে উচ্চ তাপমাত্রায় বিশেষ ধরনের দ্বিতীশীল প্রোটিন সৃষ্টি হয়। তাপ সন্থ্যশীল উদ্ভিদ সেই থেকে জেমে বাত্বা প্রোটিনকে সরিয়ে নিতে পারে।

কাজে। শিকারীয়া লবণাক্ততা, জলবদ্ধতা এবং উচ্চ তাপমাত্রার কসনের অভিযোজন বৌশল সম্পর্কে বাড়ায় লিখে প্রেসিতে উপস্থাপন করবে।

সকুন শব্দ। খরা এড়ানো, খরা প্রতিরোধ, খরা সহ্যকরণ, প্রোটিন, হ্যাঙ্গোকাইটস, এয়ারনকাইমা তিস্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদ মহস্য ক্ষেত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পৃথিবী চাহিদা পূরণ, কর্তব্যস্থান সৃষ্টি, বৈশেষিক মুদ্রা অর্জন তথা বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ জলপশ থেকে মহস্য আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশেষ জুঁট। আর হাছ চাহির ক্ষেত্রে এদেশের অবস্থান পক্ষর। এদেশের লম্বা-লম্বা, খাল-বিল, হাওর, পুকুর, দিঘি, গ্রামন কৃষি ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ দ্রুত ও বদ্ধ জলপাত্রের মোট পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন হেক্টর। সেসাথে আরও রয়েছে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গকিলোমিটারের বিশাল সাধুদ্রিক এলাকা। দেশের এই সকল জলতাপ থেকে বর্তমানে যে মহস্য উৎপাদন হয় তা এদের আয়তনের তুলনায় মাঝে নয়। এ থেকে আরও অনেক বেশি উৎপাদন সম্ভব। বাংলাদেশে ২০১১-১২ সালে যেখানে হাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ৩২.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন। সেখানে সরকারের ত্রুপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ মহস্য উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা ধরা হয়েছে ৪৫.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। যদিও দেশে হাছের উৎপাদন বিপত

বহরভাগ্যে ক্রমাগত বেড়েছে। কিন্তু এটি বেড়েছে বাঁহ চাষ বৃদ্ধির ফলে। অর্থাৎ অত্যন্তদীর্ঘ সুক্ জলাশয় যেমন-নদী, খাল, বিল, হ্রদর প্রাচলক্ষ্যবিশিষ্টে প্রাকৃতিকভাবে যাঁহের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সেখানে কবে যাঁহের হ্রাসের সীমাবদ্ধিও। আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে জলাবাহুর পরিবর্তন। জলাবাহুর পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে, লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অনাবৃষ্টি বা অশর্গীয় বৃষ্টি হচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা ও সংখ্যা। এ সমস্ত কারণে বাঁহ চাষ, যাঁহের ব্যাবহিক প্রজনন ও বিস্তার বাঁহত হচ্ছে। নিচে হওয়া ক্ষেত্রে জলাবাহুর পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা করা হলো-

ক) বাঁহ চাষ ও পোনা উৎপাদনে প্রভাব

- ১) আমাঙ্গের সেশে মৌসুমি পুকুরভাগ্যে এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টির পানি জমলে চাষিরা বাঁহ ছাড়ে। জলাবাহুর পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত কমে গেছে। অথবা বৃষ্টিপাত শুষ্ক হতে পেরি হচ্ছে। এতে কবে পোনা ছাড়তে পেরি হচ্ছে। আবার পেরিতে পোনা ছাড়ার পর পুকুর তবিয়েও যাঁহের ডাড়াভাঙি। ফলে চাষের সময় কমে যাচ্ছে এবং বাঁহ বড় হওয়ার আগেই ছোট বাঁহ বাজারজাত করতে হচ্ছে। এতে করে চাষিরা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।
- ২) জলাবাহুর পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কম বৃষ্টিপাতের ফলে ছাচারিতে যাঁহের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন বাধ্যতম্ব হচ্ছে। প্রজননের অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া ও তাপমাত্রা বেশি থাকার কারণে ছাচারিতে বাঁহ কৃত্রিম প্রজননে সারা নিচ্ছে না। পেটে ডিম আসলেও ডিম ছাড়ছে না। ডিম শব্বিবে শেখিত হয়ে যাচ্ছে। আবার বাঁহ ডিম ছাড়লেও তা নিখিত হচ্ছে না বা কম হচ্ছে। আবার নিখিত হওয়া ডিম কুটার ছাড়া কম হচ্ছে। জলাবাহুর পরিবর্তন এভাবে ছাচারিতে পোনা উৎপাদন বাঁহত করছে।
- ৩) বহর পলীর পুকুরে অধিক তাপমাত্রার বাঁহ সহজে রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং মৃত্যুমুখ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে উৎপাদন কম হচ্ছে ও চাষিদের আঁহ কমে যাচ্ছে।
- ৪) কম বৃষ্টির কারণে চাষের পুকুরে কম পানি পাওয়া যাচ্ছে। ফলে পুকুরে বা খামারে পানি সরবরাহে চাষিকে অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে।
- ৫) জলাবাহুর পরিবর্তনের ফলে বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা এবং সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে মধ্য সেটরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে চাষিদের মূর্জের বাড়ছে। পুকুর থেকে বাঁহ বেড়িয়ে যাচ্ছে।
- ৬) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের চাষের পুকুরভাগ্যে ভুবে যেতে পাড়ে।
- ৭) অত্যন্তদীর্ঘ সুক্ জলাশয়ে মধ্য উৎপাদনে প্রভাব
- ১) কম বৃষ্টিপাতের ফলে নদীতে কম পানি হচ্ছে ফলে অল্প পানিতে সহজেই বাঁহ ধরা সম্ভব হচ্ছে। এতে করে ছোট-বড়, প্রজননক্ষম সব বাঁহ ধরা পড়ছে। ফলে নদীতে যাঁহের সীমাবদ্ধিও হ্রাসী উৎপাদন বাঁহত হচ্ছে।

- ১) তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে ফলে লবণাক্ততা ছুকে পড়ছে য়ল কৃ-ষকের দিকে। এতে করে উপকূলীয় এলাকার যাদুশপনির বাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র কমে যাচ্ছে। সে সাথে কমে যাচ্ছে উৎপাদনও।
- ৩) আবাসের দেশে বিলুপ্ত, বাঁকড়, প্রবল কৃষিতে এশিল-মে হাস হচ্ছে দেশীয় জাতের ছোট্ট মাছের প্রজননকাল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বর্ষাকালে কৃষ্টিপাত না হওয়ার বা কম হওয়ার কারণে ছুলাই হাস পর্যন্তও এসব জলাশয়ে পানি হচ্ছে না। ফলে এসব মাছের প্রজনন চক্রমতাবে ক্ষতিগত হচ্ছে। ফলে এর প্রত্যয় পড়ছে নতুন মন্য উৎপাদনে এবং বারো বাছ আহরণ করে তাদের পুষ্টি ও জীবীকার ক্ষেত্রে।
- ৪) আবাসের দেশে একবারে ছালনা নদীতে প্রাকৃতিকভাবে দুই জাতীয় মাছ ডিম হচ্ছে। বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড পরমের পর জাতী বৃষ্টি শু হলে এরা ডিম ছাড়ে। তখন নদী থেকে জেলেরা নিষিদ্ধ ডিম সংগ্রহ করে এবং এই ডিম কুটিরে পোনা উৎপাদন করে। জলবায়ুর পরিবর্তনে তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে ব্রহ্মমাছের ডিমের পরিপাকতা এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে কৃষ্টিপাত শু হওয়ার সত্তর দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে করে মাছের শাবীকবৃত্তীর অবস্থার সাথে কৃষ্টিপাতের সময়ের অমিল হচ্ছে। ফলে ডিম পড়ায়ার সম্ভাবনা কমে আসছে।

গ) সাধুদ্রিক মন্য ক্ষেত্রে প্রভাব

- ১) যাদুদ্রুপে দিন দিন কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে ফলে ফেড়ে যাচ্ছে যাতাসেন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। ফলে বায়োসের পতি প্রকৃতি বন্যে যাচ্ছে, বৃষ্টির ধরন পরিবর্তন হচ্ছে। এতে করে সাগরে মাছের বিচরণ ও উৎপাদনশীলতার প্রভাব পড়ছে। ফলে সমুদ্রের কোলো অংশে মাছের পরিমাণ কৃষ্টি গেতে পারে। বায়ুর মাছের নিচাপস বিচরণক্ষেত্র বনে খ্যাত কিছু এলাকা হাছপূত হয়ে বেতে পারে।
- ২) বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে মাছ উচ্চ মণ্ডলীয় অঞ্চল থেকে মেনু অঞ্চলের সাগরের দিকে সরে যাচ্ছে। অনেক মাছ তার অভিযারন (migration) পথ, প্রজননক্ষেত্র এবং বিচরণক্ষেত্র পরিবর্তন করে ফেলছে। ফলে জেলেরা সুদূর অতীত গেতে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর জিতি করে সমুদ্রের যে সব সাধুদ্রিক এলাকার মাছ আহরণ করতে বেত সেগুলো পরিবর্তন হলে জেলেরা বিপাকে পড়বে।
- ৩) কোরাল রীফ বা প্রবল সাধুদ্রিক মাছের উৎকৃষ্ট আবাসস্থল, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ বাস করে এবং প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে। পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ঢেউয়ের তরতম্বা, সমুদ্রের অক্সিজেন বৃদ্ধি, দুবধ, স্রোতের পতি পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রবল অংশে হয়ে যাচ্ছে। এও ফলে সাধুদ্রিক জীববৈচিত্র্য তথা মন্য নৈতিয়ে উপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

কাছ : শিকারীরা মন্য ক্ষেত্রে উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ক্ষেত্রে অভিযোজন কলাকৌশল

জলবায়ু পরিবর্তন মৎস্য জীববৈচিত্র্য ও উৎপাদনে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা কাটিয়ে উঠা জরুরি। অন্যথায় একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে অন্যদিকে আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা দ্বারাও হুমকির সম্মুখীন হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের এই নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ-খাইয়ে চলার উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত অভিযোজন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে-

- ১। জলবায়ু পরিবর্তনে যেহেতু উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে তাই লবণাক্ততা সহনশীল মাছের চাষ এবং পোনা উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন-কেউড়ি, বাটা, পারশে ইত্যাদি।
- ২। লবণাক্ততা বেড়ে চলছে এমন জলাশয়ে চিংড়ি ও কীকড়া চাষ করা যেতে পারে।
- ৩। খরা এমন এলাকা যেখানে কৃষ্ণিভাষ করা হয় সেখানে খর্র সময়ের পানিতে বড় পোনা চাষ করা যায়। এজন্য এলাকার বড় পোনা বহুদূর রাস্তায় ব্যবস্থা করতে হবে। জেলাপির বৈশ খরা সহনশীল একটি মাছ। খরা অঞ্চলে কই ও বেশি মাছের চাষও করা যেতে পারে।
- ৪। বন্যপ্রাণ বা অমিত কৃষ্ণিভাষ এলাকার পুকুরের পাড় উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে বা সেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে যেন বন্যার পানি পুকুরে প্রবেশ করতে বা পারে বা পুকুর জেলে মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে।
- ৫। বন্যপ্রাণ এলাকার পুকুরের পাড় উঁচু করে সর্বাঙ্গতান্ত্রিক মনুষ্য পোনা ব্যাক্ত প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই এলাকার যে সময়ে বন্যা হয় বা সে সময়ে এই পোনা পুকুরে ইচ্ছা করা যায়।
- ৬। বন্যপ্রাণ এলাকার বন্য'র সময়টাকে বাঁচান হাছ চাষ করা' যেতে পারে।
- ৭। উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ তৈরি কলাবৈচিত্র্য সৃষ্টি ও জনস্বার্থের এলাকাগুলোতে পরিকল্পিত হাছ চাষ, পাঁচায় হাছ চাষ ও কীকড়া চাষের মাধ্যমে সে পানিকে কাজে লাগানো যায়।
- ৮। দিন দিন পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার তাপমাত্রা সহনশীল হাছ চাষ ও এদের পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হাছ। যেমন- মাছ, কুই, শিং।
- ৯। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে পুকুরের পানি গরম হয়ে গেলে পুকুরে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বাঁধের জোঁর তৈরি করে তাতে টোপালনা রাখা যেতে পারে। এতে করে হাছ গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর লিখে অবস্থান নিতে পারবে। একই উদ্দেশ্যে পুকুরের পাড়ে পানির উপর কিছু লতানো উদ্ভিদ জন্মানোর সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বাইরে থেকে কিছু পানি সেচ নেওয়া যেতে পারে।
- ১০। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সামুদ্রিক মনুষ্য বিচরণ এলাকা পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে তা যেন ছেলেদের মনুষ্য আকর্ষণে ও জীবিতা নির্বাহে নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে এ লক্ষ্যে নতুন বিচরণ এলাকাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে। এ জন্য আধুনিক পুবেষণা ও ভূমিগ প্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্ষ পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনে পতপাখির উপর প্রভাব

পৃথিবীর তাপমাত্রা ও মনুষ্য কর্তৃক পরিবেশ ক্ষেত্রেই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। আমাদের দেশ নিয়মিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কতিপয় হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশে দেশে এতি নিয়ত আঘাত করছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-জলোচ্ছ্বাস, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, ঝড়, বন্যপ্রাণ, বন্যা ও ক্যা প্রভৃতি কারণে পতপাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়। কলে ধামার মালিক বা কৃষকরা অধীনৈতিকভাবে লাভবান হয় না। এ ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা পুখিরে নেতরায় জল দুর্যোগকালীন ও দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে কজগুলো পলক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। কলেদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের হানততা মেমে নিচেই সামুদ্রিক কড়, উপেজো, বন্যা, থনা, পাহাড়ি জল, অভিনুটি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা সতর্কতাসূচক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের কৃষি শিল্পকন, রাজশাস্ত্রী অঞ্চলের পল্লীতলা ও নদীপুয়ের জল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। বার কলে এ অঞ্চলে প্রচণ্ড খর হয়। এসব অঞ্চলের শুনপ্রতিষ্ঠা ছাড়াও উপকূলীয় বন্যনে পরিভ্রমণ, পর্বতা চক্রায়ের অপ্রতিকূল অঞ্চলের কন্যনে সম্প্রসারণ, দেশের লল-লনী খাল উদ্ধার ও শুনকল এবং ছোট বড় পাহাড় কন্যার পরিবেশ ছাইন অধিনে অর্জন করতে হবে। দেশের সামাজিক বন্যনে সম্প্রসারণসহ ব্যাপকভাবে গার লাগতে হবে। এগুলো হচ্ছে লীর্থমেডাদি ছায়া ব্যবস্থা। এসব হানতবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হলে জলবায়ুর পরিবর্তনে পরিবেশ বিশপ্ণয়ের হান থেকে দেশ তথা পতপাখি রক্ষা করা যাবে। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনে পতপাখির সমস্যা মূখ্যরনের বিভিন্ন লিক আলোচনা করা হলো।

বন্যজনিত সমস্যা : বন্যার যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

- কাঁচা খালের অস্তিত্ব হয়।
- পানি দূষিত হয়।
- গবাদি পশু অপুষ্টিতে ভোগে।
- গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয়।
- মাঠ-বাটের খাল জকিরে যায়।
- পশুর বহিঃদেশের পরকীয়ার উপদ্রব বৃদ্ধি পায়।
- অধিক তাপ পতপাখির অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে।
- গবাদিপশুর খালের অবনতিসহ মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা যায়।
- তাপপীড়নে খাঁচার ব্রহ্মার ও সেয়ার মুহুরি মৃত্যু হয়।

বন্যজনিত সমস্যা : কন্যা পরিহিতিতে যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

- জলাবচ্ছতার সৃষ্টি হয়।
- দেশের অধিকাংশ এলাকা পানিতে ডুবে যায়।

- রোগব্যাদির প্রাদুর্ভাব ঘটে।
- গো-খাদ্য পাওয়া যায় না।
- পানি দূষিত হয়।
- পশুপাখি রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- গবাদি পশু অগুটিতে ভোগে।
- বিভিন্ন সরস্রময়ক রোগ ও কৃষির আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।
- ঘাসে বিবক্লিয়া সৃষ্টি হয়, গবাদিপশু অসুস্থ হয়ে পড়ে।
- পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়, অনেক পশু মৃত্যু হয়।

জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা : জলোচ্ছ্বাসের সময় যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

- জলোচ্ছ্বাসকবলিত এলাকার পানি দূষিত হয়।
- জলোচ্ছ্বাস ও ভাঙের ফলে বহু গবাদিপশু ও জীবজন্তু আতঙ্কিত হয়ে যায়।
- সংস্কারের অভাবে মৃত পশুপাখি পরিবেশ দূষিত করে।
- পশু খাদ্যের অভাবে লোশা দেয়।
- জীবিত গবাদিপশু উদরাময়, শেঠের পীড়া ও পেটফাঁপাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রমণ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পশুপাখির অভিযোজন কলাকৌশল

কোনো প্রজাতি তার পরিবেশে নিজেকে ঝাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার কৌশলকে অভিযোজন বলে। মনে রাখতে হবে পরিবেশ ও জীবের সেহের মধ্যে অভিযোজন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে থাকে। জীবের অভিযোজন পরিবেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই অভিযোজন পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ও বাতুর উপাদান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঐ স্থানের উচ্চতা এবং জীবের শরীরিক গঠন ও দৈনিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। অভিযোজনের এসব উপাদান মোকাবিলা করেই জীব তার অবস্থানে টিকে থাকে। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম।

কিন্তু হঠাৎ করে জলবায়ুর ব্যাপক কোনো পরিবর্তন হলে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পরেবে ও পশুপাখি সেই পরিবেশে নিজেকে অভিযোজন করতে পারে না। কদম্ব পশুপাখি অসহায় ও নিরীহ প্রাণী। কোনো অকস্মে জলবায়ুর পরিবর্তন হলে দীর্ঘে দীর্ঘে অনেক পশুপাখি পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে সক্ষম হয়। পরিবেশে অভিযোজনে অক্ষম অনেক প্রজাতির বিলুপ্তিও ঘটে। প্রতিবুল ও বিভিন্ন পরিবেশে পশুপাখির অভিযোজনেই জনা মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন। একেবারে খরা, হল্যা ওলোয়েল্যান্ডসনিত সবল্য সমাধানের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এবে পশুপাখি অনেকাংশে নিজেকে ঝাপ খাইয়ে নিয়ে সক্ষম হবে।

খরায় পশুপাখি রাখার কলাকৌশল

- ১। কাঁচাল, ইপিল-ইপিল, বাকলাসহ বিভিন্ন পাতের চাষ বৃদ্ধি করতে হবে এবং খরার সময় এসব পাতের পাতা পাতকে খাওয়াতে হবে।
- ২। খরার সময় পাতকে কচকের মাড়, অরিকরকরির উজিষ্ট লবণ, ঝুঁক, গমের ছলি, ডালের ছলি, ফৈল, কোলাকড় পর্বীর পরিমাণে খাওয়াতে হবে।
- ৩। গবাদিপশুকে নিয়মিত সন্ধ্যাক্রমক রোপের টিকা দিতে হবে।
- ৪। পাতকে কাঁচা বাসের সম্পূর্ণত ঝাপ (যেমন - সবুজ আলুজি) খাওয়াতে হবে।
- ৫। খরা বৌসুম আসার পূর্বেই খাস হারা সাহিলেজ ও মে তৈরি করে রাখতে হবে। যা খরা বৌসুমে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যাবে।
- ৬। গবাদিপশুকে শুক খড় না খাইয়ে ইটরিয়া হারা প্রক্রিয়াকৃত করা খড় ও ইটরিয়া ফোলোসে ত্রু খাওয়ানো যেতে পারে।
- ৭। গবাদি পশুকে পর্বীর দামদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।



চিত্র : খরার সময় পশু ইপিল ইপিল পাতা খাচ্ছে

- ৮। পতকে বেশি করে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে।
- ৯। পতকে নিয়মিত গোলাব করাতে হবে।
- ১০। পতর শরীর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং পরজীবির জন্য ডিক্লিনো করাতে হবে।
- ১১। পতকে ছায়ামুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং গ্রন্থের প্রাচীরে নেওয়া যাবে না।
- ১২। পর্বাসিপতক অসুস্থ হলে পত জালারের পরামর্শ মোতাবেক ডিক্লিনো করাতে হবে।

বন্যোদ্ভিদিক সুরক্ষায় পতপাখি বক্ষার কল্যাণকৌশল

- ১। পর্বাসিপতকে বন্যসত্ত্বের উঁচু ও জলসে ভরাপাণ্ড স্থানে রাখতে হবে।
- ২। পর্বাসিপতকে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে, কলার দূষিত পানি খাওয়ানো যাবে না।
- ৩। পর্বাসিপতর দৃঢ়তাহ পর্তে পুঁতে কেলতে হবে।
- ৪। বন্যার সময় পর্বাসিপতকে খাদ্য হিসেবে বড়, জলের কুঁড়া, ছুঁসি ও ঝৈল বেশি পরিমাণে খাওয়াতে হবে।
- ৫। এ সময় ক্ষুরিপানী, দলদাস, লতাভলু এমনকি কলাখাহও পর্বাসিপতকে খাওয়ানো যেতে পারে।
- ৬। খাঁড়া ঘাসের বিকট হিসেবে যে ও সাইলেক খাওয়ানো যেতে পারে।
- ৭। বন্যার পানি সেমে যাওয়ার সাথে সাথে পতিত জমিতে বিভিন্ন জাতের ঘাসের বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে।
- ৮। পর্বাসিপতকে সন্ধ্যার গোলের টিকা দিতে হবে ও সুস্থিখশক যদি খাওয়াতে হবে।
- ৯। জালারের পরামর্শ মোতাবেক আক্রান্ত পতকে ডিক্লিনো করাতে হবে।

জলোদ্ভাসিক সুরক্ষা মোকাবেলার পতপাখি বক্ষার কল্যাণকৌশল

ঔপকূলীয় এলাকার সামুদ্রিক জলোদ্ভাস একটি বিরাট প্রাকৃতিক দুর্ভাগ। বছরের যে কোনো সময় জলোদ্ভাস সমুদ্র-ঔপকূলীয় এলাকার আঘাত হলে পর্বাসিপতর ব্যাপক কতিসাদন করতে পারে। আমাদের দেশের বিখ্যাত সমুদ্র-ঔপকূলীয় অঞ্চল ও ঔপকূলে জলোদ্ভাসের ফলে পড়ে। তাই জলোদ্ভাসের কবল থেকে পর্বাসিপতকে রক্ষা করার জন্য শিল্পবর্ষিত ব্যবস্থাকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

- ১। উঁচুস্থানে পতপাখির বাসস্থানেই ব্যবস্থা করতে হবে।
- ২। জলোদ্ভাস বা ভয়ের সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে পর্বাসিপতকে উঁচু আশ্রয়স্থলে নিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।
- ৩। জলোদ্ভাসের পর দৃঢ় পতকে বাঁটির নিচে ঢাকা দিতে হবে।
- ৪। এ সময় পতর জন্য ভাতের মাড় ও জাই, জলবোঁ খড় এবং দালার ধানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৫। পর্বাসিপতকে দালার খাদ্য যেমন-জুঁসি, কুঁড়া, ঝৈল ও প্রয়োজন হতো লবণ খাওয়াতে হবে।
- ৬। পর্বাসিপতকে খাঁড়া ঘাসের পরিবর্তে বিভিন্ন গছ-পাড়া খাওয়াতে হবে।
- ৭। জলোদ্ভাস কবলিত এলাকার টিম পঠন করে পতডিক্লিনোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৮। পর্বাসিপতকে নিয়মিত সন্ধ্যার গোলের টিকা দিতে হবে।
- ৯। পর্বাসিপতকে খাতে পড়া দূষিত পানি বেতে রেখেছাড়তে হবে না পাঁরে বেশিক লক্ষ রাখতে হবে।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিহীন পরিবেশে কসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত কোনটি?

- ক. ঔষধোপী কসল নির্বাচন।
- খ. সঠিক জমি নির্বাচন।
- গ. যথাবশ পরিতরী করা।
- ঘ. অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগ।

২. সুপনা ও বাগেরবাটী অঞ্চলে রোগ্য আমনের জনসংখ্যা কত কোটি?

- ক. বাগাম
- খ. মিশাটী
- গ. চাঙ্গিনা
- ঘ. ফুল্লা

৩. জলবায়ু পরিবর্তন ক্রমিত করলে আমাদের দেশে কসল উৎপাদনে-

- i. ফলপ্রসঙ্গই বৃদ্ধি পাবে।
- ii. ঔষধ পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।
- iii. জমির উর্বরতা হ্রাস পাবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৪. হ্যাঙ্গোকাইটস জাতীর উদ্ভিদ কোনটি?

- ক. শিম
- খ. ফুল্লা
- গ. কেওড়া
- ঘ. বাইল

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আমের বিয়ার বাড়ি স্নেহকোনা জেলায়। আমন মৌসুমে গ্রামের সুস্থির গ্রামবাসিক পর্বাতে ১০-১৫ দিন পানির নিচে থাকার আশঙ্কায় ফলন পাননা। আমর পাছাড়াই চলে গ্রামে সবাই থাকে। বোরো ধান তলিতে যায়।

৫. আমের মিরা আমন মৌসুমে কোন আমের গ্রামের চাষ করলে আশঙ্কায় ফলন পাবেন?

ক. কিশিণ (বি তার ২২)

খ. ত্রি ধান ৫১

গ. ত্রি ধান ৬৫

ঘ. ত্রি ধান ৩৬

৬. বোরো মৌসুমে পাকা ধান খই না ছড়ানোর জন্য আমের মিয়ার উদ্ভিদ:

i. সঠিক সময়ে চাষা গোপন করে।

ii. ত্রি ধান ২৮ ও ত্রি ধান ৬৫ আমের ব্যবহার।

iii. ত্রি ধান ৫১ ও ত্রি ধান ৬৫ আমের ব্যবহার।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সুন্দরীল গ্রাম

১. সুজিত বাবুর বাড়ি সমুদ্র উপকূলবর্তী সাতক্ষীরা জেলায়। তিনি আবাসি জমিতে স্থানীয় আমের ধান চাষ করে উৎপাদনে ব্যর্থ হন। এরপর কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কিছু ধান-১ চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একদিন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদর্শিত তথ্য চিত্র দেখে সুজিত বাবু লবনাক্ততা সহায়ক বিভিন্ন কসনের চাষ সম্পর্কে অনেক জ্ঞানই জানতে পারলেন।

ক. লবনাক্ত সহিষ্ণু কসল কাজে যাবে।

খ. আশ্রমের কীভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়তে পারে? ব্যাখ্যা কর।

গ. সুজিত বাবুর সিদ্ধান্তটি সঠিক কি না তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুজিত বাবুর প্রদর্শিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুপ্রায়ন কর।

২. চিমার বাবা নিয়মিত চট্টগ্রামে হালাখা নদী থেকে মাহের ডিম সংগ্রহ করে বিক্রি করে আসছেন। কিন্তু এ বছর চিমার বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে লীর্ষহাস নিয়ে বললেন নির্দিষ্ট সময়ে কার্প জাতীয় মাহের ডিম সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। কলে পর- যোজনার কমে যাবে। তিনি এলাকার বন্যে সড়হে চলাকালে শোভাবাজার ও তথ্য টিমের মাধ্যমে বন্যে সম্পদ কমে যাওয়ার কারণ জানতে পারেন।

ক. আবহাওয়া কাকে বলে?

খ. পরিবেশের বিকল্প প্রতিক্রিয়ায় একটি অভিনব দিক ব্যাখ্যা কর।

গ. চিমার বাবার ডিম সংগ্রহ করতে যা পারার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্ভীপকে উদ্ভিগিত শেলেবাত্রাটি কুঁড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিকে কিতল প্রদান ফেলবে বিপ্রেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায় কৃষিজ উৎপাদন

কৃষিজ উৎপাদন বলতে বিভিন্ন প্রকার ঘাট ফসল, উদ্যান ফসল, ঔষধি পান্থপান্য, মাছ চাষ ও পুষ্কপানিত পশুপাখি পালন প্রকৃতির উৎপাদনকে বোঝায়। মানুষের জীবনযাত্রা চলমান রাখতে কৃষিজ উৎপাদন ব্যতীতে অন্য কোনও দরকার। বাংলাদেশে পশুচি ও অযাবহৃত জাতপাতেরও পরিকল্পিতভাবে ফুলফল ও শাকসবজি চাষ করা যায়। এছাড়া শস্য পর্যায়ে অবলম্বন করে মনো জাতীয় ফসলের পরে সরিষা বা মাস কলাই চাষ, আশ জাতীয় ফসলের পরে মনো জাতীয় ফসল চাষ করা যায়। এছাড়া এ দেশে বীণ, বেত, পাটকটি, খড়, মালিকোপের ছোবড়া ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে। কাজেই কৃষিজ উৎপাদন সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি।



চিত্র: ধানের গোছা



চিত্র: পাট গাছ



চিত্র: সেবাড়ি (মিষ্টি কুমড়া, লস কুমড়া, পাট)

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আশা—

- চাষ উপযোগী বিভিন্ন জাতের ফসলের নাম, উৎপাদন পদ্ধতি, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও ফসলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শাকসবজি চাষ পদ্ধতি, রোগ বালাই ও মনন পদ্ধতি এবং শাকসবজি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার ফুল-ফল চাষ পদ্ধতি, রোগবালাই ও মনন পদ্ধতি এবং ফুল-ফল চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মাছ পালন পদ্ধতি, মাছের রোগ শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পুষ্কপানিত পশুপাখির আবাসন ও পালন পদ্ধতি, রোগ শনাক্তকরণ, ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা এবং পুষ্কপানিত পশুপাখি পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সমন্বিত চাষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন সমন্বিত চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- সমন্বিত চাষ পদ্ধতির মাছের বাছ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং সমন্বিত চাষ পদ্ধতির ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।
- শিল্পে ব্যবহৃত হস্ত প্রকৃত কৃষিজ প্রযোজ্য বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার এবং ব্যবহারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- ঔষধি উদ্ভিদ শনাক্তকরণ এবং ঔষধি উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ফসল চাষ পদ্ধতি

আমরা অষ্টম শ্রেণিতে চাষ উপযোগী ফসলের মধ্যে কেবল গম ফসল চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানেছি। এ পরিচ্ছেদে আমরা ধান, পাট, সরিষা ও বাসকলাই এর জাত ও চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

ধান চাষ

জমি নির্বাচন : বাংলাদেশে সানাক্ষরীয় ফসলের মধ্যে ধানের চাষ ও উৎপাদন সবচেয়ে বেশি। কারণ মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য হলো ডাল। ধানের ফলন সব জমিতে ভালো হয় না। মাঝারি নিচু ও নিচু জমিতে ধানের ফলন বেশি ভালো হয়। মাঝারি উঁচু জমিতেও ধান চাষ করা হয়। কিন্তু সেখানে পানি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। এটেল ও গুলি মোতাসি মাটি ধান চাষের জন্য উপযোগী।

ধানের জাতসমূহ : বাংলাদেশে তিন জাতের ধান আছে। বলা :

ক) স্থানীয় জাত : টেপি, খিরি, দুসের, লতিশাইল

খ) স্থানীয় উন্নতজাত : কটকভাড়া, কলিগিরা, হালিকলাই, বাইজার শাইল, লতিশাইল, বিনাশাইল ইত্যাদি।

গ) উচ্চফলনশীল (উকশী) জাত : বাংলাদেশে অনেক জমিতে উকশী (উচ্চ ফলনশীল) ধানের চাষ করা হয়ে থাকে। উকশী ধানের জাতগুলোর সাধারণ কলকলো বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন :

- গাছ সবুজ এবং পাতা খড়্গা।
- শীঘ্রের ধান থেকে পেলেও গাছ সবুজ থাকে।
- গাছ খাটো ও ছোলে পড়ে না।
- খড়ের চেয়ে ধানের উৎপাদন বেশি।
- পোকা ও রোগের আক্রমণ কম হয়।
- অধিক কুশি পড়ায়।
- সাইর গ্রহণক্ষমতা অধিক এবং ফলন বেশি।

উকশী ধানে যখন প্রত্যেকটির বিশেষ গুণগুণ, যেমন- রোগপ্রবল্যই সহনশীলতা, বহু জীবনকাল, চিকন চাল, খরা, গরমাক্রান্ত ও জলময়রা সহিষ্ণু ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়, তখন তাকে আধুনিক ধান বলে। তাই সকল উকশী ধান আধুনিক নয়, কিন্তু সকল আধুনিক ধানে উকশী গুণ বিদ্যমান।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বিভিন্ন পদ্ধতি অন্বেষণ করে এ পর্যন্ত ধানের উকশী ৬১টি জাত উদ্ভাবন করেছে। ধানের যৌনুম তিনটি। বলা- আটশ, আমন ও বোরো। ব্রি ধানের কলকলো অনুমোদিত

জাত আছে যেগুলো আউশ ও বোরো দুই মৌসুমেই চাষ করা যায়। যেমন—বিআর ১ (চাউনি), বি আর ২(মালী), বিআর ৯(সুফলা), বিআর ১৪(গাঙ্গী)। আবার বিআর ৩ (বিশুপ) জাত সকল মৌসুমে চাষ করা যায়। নিম্নে তিন মৌসুমের অনুমোদিত জাতগুলোর সংখ্যা ও কিছু জাতের নাম উল্লেখ করা হলো।

ক) আউশ মৌসুমের জাত : শুধু আউশ মৌসুমেই চাষ করা হয় এরূপ জাত হলো ৮টি। এদের মধ্যে কয়েকটি বিআর ২০ (নিজারী), বিআর ২১ (নিজারত) ইত্যাদি। এ জাতগুলো আউশ মৌসুমে বপন ও রোপণ দুইভাবেই খাবান করা যায়। এ মৌসুমে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫-৩০ শে ঠৈর এবং চারা রোপনের জন্য চারার বয়স হবে ২০-২৫ দিন।

খ) আমন মৌসুমের জাত : শুধু আমন মৌসুমেই চাষ করা হয় এরূপ জাত হলো ২৭টি। এদের কয়েকটি হলো বিআর ৫(মুলাতোপ), বিআর ১১(মুলা), বিআর ২২(কিরণ), প্রি ধান ৫৬, প্রি ধান ৫৭ ও প্রি ধান ৬২ ইত্যাদি।

সবগুলো জাতই রোপণ পদ্ধতিতে চাষ করা হয় এবং রোপণের জন্য চারার বয়স হতে হবে ২৫-৩০ দিন।

গ) বোরো মৌসুমের জাত : শুধু বোরো মৌসুমেই চাষ করা যায় এরূপ জাত হলো ১৬টি। এদের কয়েকটি হলো বিআর ১৮(শাহজাদুল), প্রি ধান ২৮, প্রি ধান ২৯, প্রি ধান ৪৫, প্রি ধান ৫০ (বাগোমতি), প্রি হাইব্রিড ধান ১, প্রি হাইব্রিড ধান ২ এবং প্রি হাইব্রিড ধান ৩ ইত্যাদি। রোপণের জন্য চারার বয়স হতে হবে ৩৫-৪৫ দিন।

এ ছাড়া ধান ফসলের আবার কিছু জাত আছে। যেমন : কৃষিকল, খসা-সহিষ্ণু, লম্বাকলতা-সহিষ্ণু, হাওর, ঠাণা-সহিষ্ণু জাত ইত্যাদি।

বীজ বাছাই : কনসেক শতকরা ৮০ কাশ বীজ পকার এরূপ পরিচর্য, সুস্থ ও পুষ্ট বীজ বীজতলায় বপনের জন্য বাছাই করতে হবে। নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে বীজ বাছাই করা হয়।

প্রথমে মশ পিটের পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে প্রায় ব্রহ্মণ ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে সেড়ে সেড়ে দিলে পুষ্ট বীজ ছুবে নিচে জমা হবে এবং অপরূপ ও হালকা বীজগুলো পানির উপর ভেসে উঠবে। হাত বা চালনি দিয়ে তাপসান বীজগুলো সরিয়ে নিলেই পানির নিচে থেকে ভালো বীজ পাওয়া যাবে। এ বীজগুলো পুনরায় পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার বুয়ে নিতে হবে। একেবারে ইউরিয়া মেশানো পানি বীজতলায় সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

বীজ শোধন ও জাপ সেওয়া : বাছাইকৃত বীজ লম্বাকল ও পুষ্ট হলে সাধারণভাবে শোধন বা কনসেক চলে। তবে শোধনের জন্য ৫২-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (হতে সন্ধ্যার) তাপমাত্রায় প্রায় পানিতে ১৫ মিনিট বীজ ডুবিয়ে রাখলে জীবাণুমুক্ত হয়। এছাড়া প্রতি কেজি ধান বীজ ৩০ গ্রাম কার্বারিন (১৭.৫%) + বিরাম (১৭.৫%) ব্যবহার শোধন করা যায়।

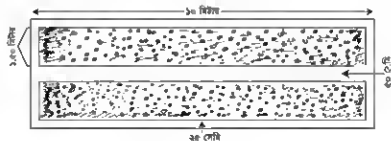
শোধনকৃত বীজ বাঁশের টুকরি বা ক্রামে ২-৩ স্পর্শ ঢকানো বড় বিছিরে তার উপর বীজের ব্যাগ রেখে পুনরায় ২-৩ ঘর ঢকানো বড় পিঠে বা জুপাকা পিঠে ঢেকে জালোয়নে ঢেপে তার উপর কোনো ভাঙ্গী জিনিস দিয়ে ঢাপ দিতে রাখতে হবে। এভাবে জাপ দিলে আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিনে, বোরো মৌসুমে ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনে ভালো বীজের অন্তর বের হবে এবং সেগুলো বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

বীজতলা তৈরি : ধানের চারা তৈরির জন্য সাধারণত চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়। যথা-

ক) ঢকনো বীজতলা খ) ভেজা বীজতলা গ) ভাসমান বীজতলা ঘ) মাগোণ বীজতলা উঁচু ও দোতাঁপ মাটিসম্পন্ন জমিতে ঢকনো বীজতলা এবং নিচু ও ঝাঁটাল মাটি সম্পন্ন জমিতে ভেজা বীজতলা তৈরি করা হয়। আর বন্যাকবলিত এলাকায় ভাসমান ও মাগোণ বীজতলা তৈরি করা হয়। এঁদের আলো বাতাস থাকে এবং বৃষ্টি বা বন্যার গায়েতে ডুবে যাবে না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হয়। এখানে ঢকনো ও ভেজা বীজতলা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক) ঢকনো বীজতলা : বীজতলার জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। জমিতে ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি আলোড়নে ঘুরখুরা ও সমান করতে হবে। মাটিতে অবশ্যই রস থাকতে হবে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এর আগে জমি থেকে আগাছা বেছে সরিয়ে ফেলতে হবে। জমি বসি অনুর্বর হয় জমিতে জৈব সার দিতে হবে। বীজতলার বাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই উত্তম।

বীজতলার মাপ : এক শতক জমিতে দুই বেজের বীজতলা তৈরি করা যায়। প্রতিটি বীজতলার আকার ১০ মিটার x ৪ মিটার জায়গার মধ্যে নানা বাল দিয়ে ৯.৫ মিটার x ১.৫ মিটার হবে। বীজ তলার চারদিকে ২৫ সেমি. জায়গা বাল দিতে হবে এবং দুই বেজের মাঝখানে ৫০ সেমি. জায়গা মালার জন্য রাখতে হবে। বীজতলার বীজ বোতার আগে বীজ জাল দিতে হবে। বিভিন্ন জাতের ধানের অল্প বয়স হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়কাল দরকার। যেমন- আউশের জন্য ২৪ ঘণ্টা, আমনের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। এক শতক বীজতলার জন্য ৫ কেজি পরিমাণ বীজ উপযুক্ত পরিমাণে জাল দিয়ে অচ্ছুরিত করতে হবে। এবুণ অচ্ছুরিত বীজ বীজতলায় বুনতে হবে।



চিত্র: এক শতক জমিতে ধানের বীজতলার নকশা

চাষার পরিচর্যা ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই বেজের থাকেব জাঁটলা থেকে মাটি উঠিয়ে দুই বেজে সমানভাবে উঠিয়ে দিতে হবে। এতে বেজগুলো উঁচু হয়। এরপর প্রতিবেশমিটার বেজে ৬০-৮০ গ্রাম বীজ বেজের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে মাসিন সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বেজের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের চ্যাক্টা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। দুই বেজের মাঝে স্ট্রি নানা সেচ, নিষ্কাশন ও সার বা ঔষধ প্রয়োগের জন্য খুবই দরকার হয়।

খ) **ভেড়া বীজতলা** : এক্ষেত্রে অবশ্যে পানি দিয়ে ২-৩টি চাব ও নই সেওয়ার পর ৬-৭ দিন ফেলে রাখতে হয়। এতে জমির আগাছা, খড়কুটী ইত্যাদি পড়ে গিয়ে সারে পলিত হয়। এরপর জমি আরও ২-৩ টি চাব ও নই দিয়ে মাটি খুবলকে কাঁচাভর করতে হয়। ভেড়া বীজতলার বীজ বাড়িতে পড়িয়ে বোনা ভালো। এক্ষেত্রে বীজতলার মাপ তরুণ বীজতলার মতোই।

বীজতলার পরিচর্যা : পানি যাতে বীজতলার বীজ থেকে না গায়ে সেজন্য বগনের সময় থেকে ৪-৫ দিন পর্যন্ত পান্যের দিয়ে পানি আড়ালের ব্যবস্থা করতে হবে। বেত যাতে শুকিয়ে না যায় সেজন্য দুই বেতের মাঝের মালায় পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। এরপর মালা থেকে এরোজলীয় পানি বেচে সেচ দিতে হয়। বীজ তলার আগাছা জন্মালে তা তুলে ফেলাতে হয়। রোগ বা পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে তা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে হবে। বীজ তলার চারাগুলো হলসে হলে গেলে প্রতিবর্গমিটারে ৭ গ্রাম হারে ইটরিয়া সার এরোগ্য করতে হবে। ইটরিয়া এরোপের পর চারাগুলো সবুজ না হলে গন্ধকের (সালফার) অঙ্কণ দিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বীজতলার প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার উপরি এরোগ্য করতে হবে। অতিরিক্ত ঠান্ডার বীজতলার চারাগুলো শুকি যাতে পারে। তাই যাতে পলিখিন দ্বারা চারাগুলো থেকে দিনের বেলায় খেলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে চারার ওপকত মান বৃদ্ধি পাবে।

চারা উঠানো

- ১। চারা তোলার পূর্বে বীজতলার পানি সেচ দিয়ে হাট ফিড়িয়ে সেওয়া উত্তম। এতে বীজতলার মাটি নরম হয়। তলে চারা তুলতে সুবিধা হয়।
- ২। বগনের চারা পোকায় আক্রান্ত থাকলে কীটনাশক এরোগ্য করতে হবে।
- ৩। চারায় পোকো বা কাণ্ড যাতে না জাড়ে সেমিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ৪। চারা তোলার পর তা ছোট ছোট আকারে বেঁধে দিতে হয়।



চিত্র : বীজতলা থেকে চারা তুলছে

চারা বহন ও সঞ্চেপন : সরাসরি রোপণের ক্ষেত্রে-

- ১। বীজতলা থেকে রোপণের জন্য চারা বহন করার সময় পাতা ও কাণ্ড মোড়ানো যাবে না।
- ২। খুঁড়ি বা টুকরিতে সারি করে সাজিয়ে পরিস্ফুটন করতে হয়।

৩। যতদূরসী করে কখনো খালের ঢারা বন্ধন করা যাবে না।

৪। ঢারা সরানোর রোপণ সম্ভব না হলে ঢারার আঁট ছাড়ার মধ্যে ছিপছিপে পানিতে রেখে সরেফে করতে হবে।

জমি তৈরি : ৪-৫ টি আড়াঅড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে কানায় ও সমান করে নিতে হবে। একেবারে কোদাল দিয়ে জমির চারদিক বেঁটে নিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা : ভালো ফলন পেতে হলে অবশ্যই জমিতে সার নিতে হবে। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত মাটি থেকে বেশি পরিমাণে ষ'সোয়ামালস গ্রহণ করে বিখার শর গ্রহোণ অত্যাবশ্যক। পোষক বা আর্বারনা পড়া জাতীয় জৈব সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। ইউরিয়া ব্যতীত সকল রাসায়নিক সার যেমন- টিএলপি, এমওপি, জিপসাম, লম্বা প্রকৃতি জমিতে পেষ চাষ সেওয়ার আগে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। ঢারা রোপণ করার পর ইউরিয়া সার ৩ কিলোতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। ১ম কিলো ঢারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর, ২য় কিলো ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ ঢারার শোভায় ৪-৫টি কুশি আসা অবস্থায় এবং শেষ কিলো ৪৫-৫০ দিন পর অর্থাৎ জাইড বোতু আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে।

নিচে শতক প্রতি জৈব সার, ইউরিয়া, টিএলপি, এমওপি, জিপসাম ও লম্বা সারের পরিমাণ দেওয়া হলো।

সারের নাম	পরিমাণ
পড়া পোষক বা কমপোস্ট	২০ কেজি
ইউরিয়া	৩৬০-৬৪০ গ্রাম
টি এস পি	৩০০-৫০৫ গ্রাম
এমওপি	১৬০-২৮০ গ্রাম
জিপসাম	২৪০-২৮০ গ্রাম
লম্বা	৪০ গ্রাম

শতকপ্রতি ২০ কেজি পড়া পোষক সার বা কমপোস্ট মিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা : জাত ও বৈশুদ্য ছকু সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হয়। যেমন: পাঠ্যক্রমের পাঠ্যক্রমের সঠিক ও ভাল বেলে মাটিতে এমওপি সার সেক্ষেপ নিতে হয়।

- ১। খলবাহিত পলিমাইট ও সেক্ষেপক এলাকার মাটিতে লম্বা সার বেশি পরিমাণে নিতে হয়।
- ২। স্বাভাবিক এলাকার মাটিতে প্রত্যেক সার কম প্তিমাণে নিতে হবে।
- ৩। স্থানীয় জাতের ধানে সারের পরিমাণ অর্ধেক প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ : সমান করা সমতল জমিতে জ্বাং ও মৌসুম ভেদে ২৫-৫৫ সিম বরসের চারা রোপণ করা ভালো। জমিতে হিলহিলে পানি রেখে সড়ির সাহায্যে সারি করে চারা রোপণ করতে হবে। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি. এবং সারিতে এক গোছা থেকে অন্য গোছার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি. হওয়া দরকার। প্রতি গোছার ২-৩ টি চারা রোপণ করতে হবে। মেরিতে রোপণ করলে চারার সংখ্যা বেশি ও ঘন করে রোপণ করতে হবে।

পরিচর্যা

ক) সেচ : জমি সমান হলে যুক্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে এবং ঢালু হলে খাল বদ্ধ যুক্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে পানি সেচ দিতে হয়। বোরো ধান সম্পূর্ণভাবে সেচের উপর নির্ভরশীল। জমিতে ৫-৭ সেমি এর সিলে পানি থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ সেমি এর সিলে পানি থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ সিম পর্যন্ত ৩-৫ সেমি সেচ দিতে হয়। এতে আগাছা দমন হয়। এরপর কুপি উৎপাদন পর্বের ২-৩ সেমি এবং চারার বয়স ৪০-৬০ দিন হলে ৭-১০ সেমি পরিমাণ পানি সেচ দেওয়া উত্তম। যেকোনো সময় পানি সেচ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দাদা পুই হতে শুরু করলে আর সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

খ) আগাছা দমন : কমপক্ষে তিন বার ধানের জমিতে আগাছা দমন করতে হয়। যেমন :

- চারা রোপণ করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে
- প্রথম আগাছা দমনের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে
- যেকোনো সময়ের পূর্বে।

ধানক্ষেতে সাধারণত আড়াইল, পইচা, শাখা প্রভৃতি আগাছার উপস্থিতি হয়। এগুলো সরাসরি হান/নিড়ানি দ্বারা ও ঔষধ প্রয়োগ করে দমন করতে হবে।

গ) পোকা দমন : ধানক্ষেতে অনেক পোকার উপস্থিতি হয়। এদের আক্রমণে ধানের ফলন অনেক কমে যায়। সাধারণত ধান কনলে মাছরা পোকা, পামকিপোকা, বাঘাছি আর ককি, পাকি পোকা, লাল মাছি, শীষকাটা সেলা পোকা প্রভৃতি দেখা যায়।

নিচে কয়েকটি পোকার পরিচিতি ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : মাছরাপোকা মথ



চিত্র : পামকিপোকা



চিত্র : খড়ি পোকা



চিত্র : সবুজ পাঁজা ককি

নিম্নলিখিত তালিকার পোকার আক্রমণের লক্ষণসমূহ অনুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা ময়মন করা যায়।

তালিকা ১

পোকার নাম	আক্রমণের লক্ষণসমূহ
১. মাকড়াপোকা	১) ধান পাতার মাঝভাগে ও শীর্ষের ক্ষতি করে, ২) কুপি অবস্থায় আক্রমণ করলে মাথা ভাঙা লাগা হয়ে যায়, ৩) ফুল আসার পর আক্রমণ করলে ধানের শীষে সাধা ডিটা হয়, ৪) সব ঋতুতেই কমবেশি আক্রমণ করে।
২. পামরিপোকা	১) পামরি পোকার কীড়া পতনের ভিতরে ছিন্ন করে সমূহ অংশে ধার। ২) পূর্ণ বয়স্ক পোকা পাতার সমূহ অংশে বুঁদে বুঁদে ধার বলে পাতা সাধা হয়ে যায়।
৩. গলময়ি	১) গল ময়ি কীড়া ধানপাতার ব্যক্তি কুশিতে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত কুশি পিঠাক পাতার মতো হয়ে যায়। ২) কুশিতে শীত হয় না।
৪. গামি পোকা	১) গামিপোকা ধানের দানায় দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে। ২) বয়স্ক পোকায় যা থেকে গন্ধ বের হয়।
৫. দানামি গাছ কড়িৎ	১) ধানের গোড়ায় বলে হসকুয়ে যায়, ২) গাছ পুড়ে বাগরান্না সংধান করে মরে গাছ, একে হপার বার্ন বলে।

তালিকা ২

পোকার নাম	কীটনাশকের নাম
গামিপোকা, পামরিপোকা, মাকড়া পোকা, গলময়ি, ছাতরা পোকা, চুপীপোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা শোষক পোকা,	ক্লোরোপাইরিক্স ৫০ বা ম্যাসাখিয়ন ৫৭ বা কেসিট্রিফিন ৫৭ বা ডায়াজিনন ৫০
দানামি গাছ কড়িৎ	ডার্বোফ্লুথান ৩ জি/ ১০জি বা ডায়াজিনন ১৪ বা
শীতকীড়া সেলা পোকা	সেপালো ১০০

রোগ ময়মন : ধানপাতার অনেক রোগ হয়। ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবাণু রোগের কারণ। নিচে কয়েকটি ক্ষতিকর রোগের কারণ, লক্ষণ ও ময়মন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণসমূহ	দমনপদ্ধতি
১. ব্লাস্ট রোগ	ছত্রাক	১) পাতার ডিম্বাকৃতির মাথ পড়ে ২) দাঁতের চারপাশে পাতা কানদি এবং ফলের অংশ লাল হই বর্ণের হয়। ৩) অঙ্গেকণ্ডা বাপ একত্রে মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ পাতা হয়ে যায়।	১) বীজের বীজ ব্যবহার করা। ২) পটশে কাঠীর সার উপরি প্রয়োগ করা। ৩) বীজ শোধন করে বোনা ৪) জমিতে পানি ধরে রাখা ৫) জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করা ৬) রোগ প্রতিরোধ জাত বিচার ৩, বিচার ১৪, বিচার ১৫, বিচার ১৬, বিচার ২৪, প্রি ধান ২৮ রোগপন করা
২. টুটো রোগ	ভাইরাস	১) চারা রোগে এক ফলের অথবা টুটো রোগ দেখা দিতে পারে। ২) আক্রমণের প্রথমে পাতার রং হালকা সবুজ, পরে অন্ধ আন্ধ হলুদ হয়ে যায়। ৩) পথ চাল নিলে সহজেই টুটো হাসে। ৪) স্থিতি হয় না। ৫) প্রথমে লুই-একটি পোহর এ রোগটি দেখা যায়, পরে ধীরে ধীরে অংশেপাশে পোহর ছড়িয়ে পড়ে।	১) পাতা ছড়িয়ে এ রোগ ছাড়ার, তাই পাতা ছড়িয়ে লম্বন করতে হবে। ২) রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন চাম্পা, মুলাজল, প্রি শাইল, গাজী, বিচার ১৬, নিম্ব ২২, প্রি ধান ৩৭, প্রি ধান ৩৯, প্রি ধান ৪১, প্রি ধান ৪২ চাষ করা ৩) আশেপাশ ফল ব্যবহার করে সবুজ পাতা ছড়িয়ে মেয়ে দেখা। ৪) রোগাক্রান্ত পাহ ভুলে মাটিতে পুঁতে ফেলা ৫) ম্যালারিভিক্স ৫৭ ইসি স্প্রে করা।

এছাড়া ধান ফসলে পাতা পোড়া রোগ, উচ্চরোগ, বোম পোড়ারোগ, বাকানি রোগ, বাসমি বাপ রোগ, খোসপাতা রোগ, স্মিট প্রকৃতি রোগ দেখা যায়।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে ধান ফসলের বিভিন্ন উপকারী ও অসুকারী কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে
করে আলোচনা তৈরি করতে বলবেন। একেবারে শিক্ষক কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে ও আলোচনা তৈরির
নিয়মগুলো বলে দেবেন।

ফসল কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণ

শীঘ্র ধান থেকে গেলসেই ফসল কাটতে হবে। অধিক পান্য অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান খরে পড়ে,
শীঘ্র তেজে যায়, শীঘ্রকাটা সেদা পোকা এবং পাখির আক্রমণ হতে পারে। শীঘ্রের উপরের দিকে শতকরা ৮০
ভাগ ধানের চাল শক্ত ও অল্প এবং নিচের অংশের ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও অল্প হলে ধান
টিকমতো থেকেছে বলে বিবেচিত হবে। কাটার পর ধান মাঠে ফেলে না রেখে বহু ভাগ্যভাগি সম্ভব মাড়াই
করা দরকার। কাটা ধানের উপর ধান মাড়াই করার সময় চুটিই, চুট বা পলিখিন বিছিয়ে দিতে হবে। এভাবে
ধান মাড়াই করতে ধানের রং উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াইয়ের পর ধান ৩-৪ দিন পূর্ণ রোদে শুকাতে

হবে। এবার আলোচ্যের কুল্যাদিগ্রে বেড়ে সরবরাহ করতে হবে। যেখানে খান রাখা হবে তা পরিপূর্ণ করে রাখতে হবে। সংরক্ষণের সময় নিম্ন/নিমিত্ত/বিশকটালীক পাতা (কঁকড়া) মিশিয়ে দিলে পোকের আক্রমণ হয় না। তারপর পাতের স্থান পত করে বাক করতে হবে যেন ভিতরে বাতাস লাগুক।

কমল

আম্রিশের চেয়ে আম্রের, আম্রের আম্রের চেয়ে আম্রের ফল বেশি হয়ে থাকে। উল্লেখ্য স্থানীয় আম্রের ফুলনার উৎসী আম্রের ফল বেশি হয়ে থাকে। উৎসী আম্রের আম্রের ফল ৪-৬ টন এবং পতক (৪০ বর্গমিটার) প্রতি ২০-২৫ কেজি।

কাজ : পিকারীদের প্রত্যেককে জরুরীকর্তার উদ্দেশ্যে খান কমল চাষের পুঙ্খ বিপুল প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিতে কামের।

পাট চাষ

বাংলাদেশে প্রায়শই, মনুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদীর পশ্চিমবর্তী উপরী সর্বত্র জমিতে প্রচুর পরিমাণে পাট চাষে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, বার্মা, মিশর ও ব্রাজিল প্রভৃতি দেশেও পাট চাষে। পাটের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে পাটশিল্প পড়ে উঠেছে।

জমি নির্বাচন : উপরী সোচ্চল মাটি পাট চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোজনী। তবে বেলে ও এটেল মাটি ছাড়া সব জমিতেই পাট চাষ করা যায়। যে জমিতে বর্ষা শেষের লিকে পানি পড়ে সে জমি পাট চাষের জন্য উত্তম। তোমরা পাট উৎস জমিতে একই সেচি পাট উৎস ও নিম্ন সুইচলের জমিতেই চাষ করা যায়।

চাষ উপযোজনী পাটের জাতসমূহ : প্রত্যেকটি জাতের এমন অনেক জাত আছে যেগুলোর মধ্যে ফলনশীলতা, পরিবেশগত উপযোগিতা, পোকা ও রোগবাহ্যি প্রতিরোধ ক্ষমতা, দৈনিক বৈশিষ্ট্য (আকার, আকৃতি ও বর্ণ), পুষ্টিমান, বাস্যত্ব, প্রক্রিয়াকার্য ইত্যাদি ওপাশি বিল্যমান। তবে একই জাতে সব বৈশিষ্ট্যের সর্বোৎকৃষ্ট সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয় না। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাট পরবেক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRI) ১৭টি সেচি, ১৬টি তোমরা বা বর্ণী পাট, ২টি কেলক এবং ১টি মেজা জাতের পাট উদ্ভাবন ও অবস্থান করেছে।

সেচি পাটের জাতসমূহ : সিটিএল-১ (সবুজপাট), সিটিই-৩ (আম পাট), সি সি-৪৫ (জো পাট), সি-১৫৪, এটম পাট-৩৮ ইত্যাদি সেচি পাটের জাত।

তোমরা বা বর্ণী পাটের জাতসমূহ : জ-৪, জ-১৬৬৭ (কালুনি তোমরা), সিটি (চিনি সুরা চিনি) ইত্যাদি তোমরা বা বর্ণী পাটের জাত।

কেলক জাতসমূহ : এইচ সি-২ (জলি কেলক), এই সি-১৫

মেজাজাত : এইচ সি-২৪ (টনী মেজা)

অধিচাষ : কাছান-চের মাঠে দুইএক পপলা বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পাটের জমি চাষ করতে হয়। রবি কসল জোলের পর পরই জমি চাষ করা উচিত। ৫-৬টি আড়াআড়ি চাষ ও দুই দিনে মাটির ঢেলা দেহে

সম্মান করতে হবে। পাটের বীজ ছোট বলে ছাটের দল্য চেয়ে মিসি করতে হবে এবং আগাছা থাকলে বা পূর্ববর্তী কচলের শিকড় উঠিয়ে ফেলতে হবে, নতুবা বীজ অশাসনুভব পড়াবে না।

সার প্রয়োগ : পাটের জমিতে সঠিক সময়ে পরিমাপমতো জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে পাটের ফলন সহজেই বৃদ্ধি করা যায়। পাটের জমিতে সঠিক নিয়মে জৈব সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার পরিমাণে কম লাগবে। তবে ছাটতে লতা ও পত্রের অত্যধক অনুভূত না হলে গ্লিশাম ও জিনক সালফেট ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

বীজ বপনের ৬-৭ সপ্তাহ পর সার প্রয়োগ : জমি নিভানি দিয়ে আগাছা হুত করে ৩-৯৮৯৭ জাত বাসে অন্যান্য জাতের বেলায় সতক প্রতি ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৩-৯৮৯৭ জাতের বেলায় সতক প্রতি ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কিছু পরিমাণ ফকনো ছাটের সাথে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে 'ছোট' বা নিভানি বছের সাহায্যে ছাটের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার ইউরিয়া সার সেতবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে বেশ পাতের কচি পাতা ও তগার প্রয়োগকৃত সার না লাগে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে যেন পর্যাপ্ত রস থাকে।

বীজ শোধন : বীজ বপন করার আগে শোধন করে নেয়া উচিত। প্রতি কেজি পাট বীজের সাথে রিক্রোমিল বা ক্যাপটান ৭৫-৮০ গ্রামাইনশপ মিশিয়ে বীজ শোধন করে নেয়া উচিত।

বীজ বপনের সময় : সঠিক সময়ে পাটের বীজ না বুনলে পাছে অলম্ব্যে কুল আসে এবং ফলন কম হয়, পাটের গুণগত মানও কমে যায়। পাট জাতভেদে ১৫ই ফেব্রুয়ারি হতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি ও বীজ হার : জমিতে পাট বীজ সারিতে ও ছিটিয়ে এ দুই উপায়ে বপন করা যায়। ছাটতে বীজ বপন করলে বীজের পরিমাণ কম লাগে। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৭-১০ সেমি আকার ছিটিয়া পদ্ধতিতে বুনলে বীজ বেশি লাগবে। বীজ বেশ মাটিয় পুঁজ পড়তে বেশা না হয় সেমিকে খেঁচান রাখতে হবে। জমিতে "জো" আসলে বীজ মৃত্যুতে হবে।

বীজ বপনের পর পরিচর্যা

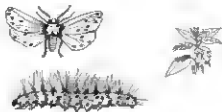
চারা পাতলা করা ও আঁকাছা দখল : চারা পাতার ১৫-২০ দিন পর যখন চারা থেকে দুর্বল চারাগুলো উঠিয়ে এবং সাথে সাথে জমির অগাছা পরিচর্যা করতে হবে। দ্বিতীয় বার ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে এবং শেষবার ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে কিছুমাত্র দিয়ে ছাট খসকা করে আগাছা পরিচর্যা করতে হবে।

সেচ ও নিকাল ব্যবস্থা : পাটের জমিতে জ্বা সেবা দিলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জমিতে পানি জমে থাকলে তাকে নিকালের ব্যবস্থা করতে হবে।

শোকাবাকড় দমন : পাট কেতে বিছা শোকা, উরুচুলা, ঢেলে শোকা, ঘোড়া শোকা, মাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি শোকড় নাম, ক্ষতির লক্ষণ ও দমনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

ক) বিছাশোকা

লক্ষণ : কচি ও বয়স্ক সব পাতাই খেয়ে ফেলে। ছী সব পাটের পাতার উপর নিচে গাল করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাজা বের হওয়ার পর গ্রা ৬-৭ দিন পর্যন্ত বাজাখণ্ডে পাতার উপর দিক দলবদ্ধভাবে থাকে। পরে এরা সব গায়ে ছিটিয়ে পড়ে। সব বছরভাবে বকো অবস্থার কীড়াগুলো পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে সাদা পাতলা পর্যায় মতো করে ফেলে এবং অক্রমিত পাতাগুলো দূর থেকেই সহজে দৃশ্যমান হয়। আক্রমণ ব্যাপক হলে এরা কচি তগাত খেয়ে ফেলে।



চিত্র : বিহাগেকর ও পটপাত।

দমন পদ্ধতি

- পাটের শাকায় ডিমের বাগা দেখলে ডিমের বাগাসহ শাকা তুলে ফেলে করতে হবে।
- আক্রান্তের প্রথম পর্যায়ে মধন চিহ্ন থেকে বের হওয়া কীটগুলো মলবদ্ধভাবে থাকে, তখন শোকাবাসহ পাটটি তুলে খাত্রে পিষে, গর্তে ঢাপা দিয়ে অথবা অল্প কেয়েসিন মিশ্রিত পানিতে ছুবিয়ে ফাটতে হবে।
- পাট কাটার পর ফলনের অধি চাষ করলে মাটির নিচে পুঁকিয়ে থাকা পুঁকলিগুলো বের হয়ে আসে যা শোকাবাসক পানি থেকে ভেসে।
- বিছা শোকা মাঝে আক্রান্ত ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে ছড়াবে না পারে সেজন্য আক্রান্ত ক্ষেতের চারদিকে প্রতিবন্ধক নাল্য তৈরি করে অল্প কেয়েসিন মিশ্রিত পানি নাল্যে রাখতে হবে।
- নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বাগাইন্যাক প্রয়োগ করতে হবে।

খ) উরুতা

লক্ষণ

ভূমিতে গর্ত করে মিনের কোর গর্তে কবান করে এক সন্ধ্যা কোর দর্ভ থেকে বের হয়ে চারা পটপাতের পোড়া কেটে গর্তে নিজে যায়। এতে পাট ক্ষেত মাঝে মাঝে গাছপালা হয়ে, যায়। অনাবৃত্তির সময় আক্রমণ বেশি হয় এক গ্রুপ নৃষ্টিগতের পর আক্রমণ করে যায়। পূর্ণ বয়স্ক পোকা পাট গাছের শিকড় ও কণ্ডের পেশুর অংশে যায়।



উরুতা

দমন পদ্ধতি

- প্রতিবছর যেসব ভূমিতে উরুতার আক্রমণ দেখা যায় সেখানে সাধারণ পরিমাপের চেয়ে বেশি করে বীজ বপন করতে হবে।
- আক্রান্ত ভূমিতে চারা ৮-৯ সেমি হওয়ার পর মন পাঁছ বাছাই করে পার্শ্বা করাতে হবে।
- সন্তান হয়ে মিকটর ক্যানার থেকে আক্রান্ত ভূমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অধি চাষের সময় নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বাগাইন্যাক প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গর্তে কীটনাশক প্রয়োগ করে।
- কীটনাশক বাগাইন্যাকের বিখ্যোপ প্রয়োগ করে।

খ) খোঁড়া শোকা

লক্ষণ

খোঁড়া শোকা পাট পাতার কটি ডগা ও পাতার অক্রেমণ করে। ফলে কটি ডগা নষ্ট হয়ে যায় এবং শাখা-প্রশাখা বের হয়। ফলে পাটের কলন ও আঁশের মান কমে যায়।



চিত্র : খোঁড়া শোকা

দমন পদ্ধতি

- শোকার আক্রমণ দেখা দিলে কেরোসিন তেল দিলে পাটের উপর দিতে টেসে দিলে শোকার আক্রমণ কম হয়।
- পানিক বা ময়না পানি খোঁড়া শোকা খেতে পছন্দ করে। তাই এসব পানি করার জন্য পাট ক্ষেতে বিশেষ কন্ডি এবং পাটের ডাল পুঁতে দিতে হবে।
- নির্ধারিত মাত্রার রাসায়নিক বলাইনামক ছিটাকতে হবে।

ঘ) জেলে শোকা

লক্ষণ

জী শোকা চারা গাছের ডগার খিল করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা গাছের ডিকরে ঢলে যায় এবং সেখানে বসে হতে থাকে। ফলে গাছের ডগা মরে বাত এবং শাখা প্রশাখা বের হয়। পাছ বসে ফলে পাতার গোড়ার কাছের উপর খিল করে ডিম পাড়ে। ফলে ঐ জায়গায় পিটের সৃষ্টি হয়। পাট পড়ানোর সময় ঐ পিটগুলো পড়েনা। আঁশের উপর কালো দাগ থেকে যায়। এতে আঁশের মান ও মাম কমে যায়।



চিত্র : জেলে শোকা

দমন পদ্ধতি

- বীজ বপনের আগে ও পাট কটির পরে ক্ষেতের আশে পাশে যে সব আশ্রয় থাকে সেগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত পাট পাইকগুলো তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে।
- গাছের উচ্চতা ৫-৬ সেমি, লতা হওয়ার পর নির্ধারিত মাত্রার রাসায়নিক বলাইনামক প্রয়োগ করতে হবে।

ঙ) মাকড়

পটিকেতে দুই ধরনের মাকড় দেখা যায়। কচা- হলদে ও লাল মাকড়।

লক্ষণ

হলদে মাকড় কটি পাতার আক্রমণ করে পাতার রস চুষে যায়। এতে কটি পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় এবং পাতার রং ডালাটে হয়ে যায়। হলদে মাকড় তুলের কুঁড়িকেও আক্রমণ করে। ফলে কুঁড়ি ফুটতে পারে না। তুলের গাণ্ডির রং হলদে থেকে কালচে রঙের হয়ে যায় ও মরে পড়ে। এতে বীজের ফলনও কমে যায়। একটানা খরা বা অনাবৃষ্টির সময় এসেলে আক্রমণ বেশি দেখা যায়। লাল মাকড় একই নিচের পাতা আক্রমণ করে।



চিত্র : লাল মাকড়

দমন পদ্ধতি

- মূল ও গছত ১৫২ অনুশাতে পানির সাথে মিশিয়ে অক্রান্ত পট ক্ষেতে ছিটানতে হবে।
- কাঁচা নিষপাতার রস ২৪৫ অনুশাতে পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- নির্ধারিত যন্ত্রের রাসায়নিক বলাইনামক ছিটানতে হবে।

কাছ : পিচ্ছবীবা দলীলভাবে পট কসলের বিভিন্ন উপকারী ও অপকারী কীটপতঙ্গ সঙ্গ্রহ করে আলবাম তৈরি করবে। এক্ষেত্রে পিচ্ছক কীটপতঙ্গ সঙ্গ্রহের ও আলবাম তৈরির নিয়মগুলো বলে দেবেন।

রোগ দমন : পাটে কাণ্ড পড়া, কালাপাট্টি, গোড়া পড়া, শুকানো ক্ষত, রসে পড়া, ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। নিম্নে কয়েকটি রোগের লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

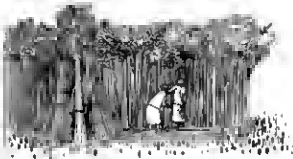
- কাণ্ডপড়া রোগ :** লক্ষণ : পাতা ও কাণ্ডে গাঢ় বাদামী রঙের দাগ দেখা দেয়। এ দাগ পাতের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত যে কোনো অংশে দেখা দিতে পারে। লক্ষণগুলোতে অবশ্যই কালো বিন্দু দেখা যায়। এ কালো বিন্দুগুলোতে ছত্রাক জীবগু থাকে। কখনো কখনো আক্রান্ত স্থানে পোটা পাইই জেতে পড়ে। কোনো এ সেরে পাটে এ রোগ দেখা দিতে পারে।
- কালো পরিচরণ :** এ রোগের লক্ষণ প্রায় কাণ্ড পড়া রোগের মতোই। তবে এতে কাণ্ডে কালো রঙের বেষ্টনীর মতো দাগ পড়ে। আক্রান্ত স্থানে বহুদল হতে কালো গুঁড়ুর মতো দাগ লাগে। এ রোগে গাছ জড়িয়ে মারা যায়।
- শুকনো ক্ষত :** এ রোগটি শুধু সেপি জাতের পাটেই দেখা যায়। চারা অবস্থার আক্রমণ করলে চারা মারা যায়। বড় পাতের কাণ্ডে কালচে দাগ পড়ে। আক্রান্ত স্থান কেটে যায় এবং ক্ষতস্থানে জীবগু সৃষ্টি হয়। এ জীবগুগুলো বাতাসে উড়ে ফল আক্রমণ করে। আক্রান্ত ফল কালো ও আকারে ছোট হয়। এ রোগে গাছ ঘরে না, তবে আক্রান্ত অংশ শক্ত হয়। তাই পটি পচানোর পরেও আক্রান্ত স্থানের দাগ পটি কাটার সাথে লেগে থাকে। এর আশ নিরূপনের হয়।

প্রতিকার/দমন ব্যবস্থা : কাণ্ড পড়া, কালাপাট্টি ও শুকনো ক্ষত এ কিলটি রোগই বীজ, মাটি ও যন্ত্রবাহী। এদের প্রতিকারের ব্যবস্থায় একই বসনের। যেমন :

- পটি কাটার পর জমির আসাফ, অববর্জনা ও পরিভ্রান্ত গাছের গোড়া উপকিড়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করতে হবে।
- নীরোগ পটি গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- জমি থেকে সর্বদা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- রাসায়নিক বালাইনামক ছিটানতে হবে।

পাট-কাটা ও আঁটি বাঁধা

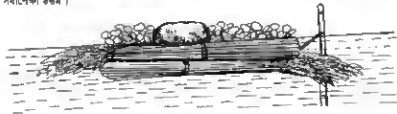
সঠিক সময়ে পাট না কাটিলে পাটের গুণ ও ফলন উভয়ই কমে যায়। সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে দেশি পাট এবং শ্রাবণ-চত্র মাসে তৈল পাট কাটিতে হয়। পাছে কুল আসলে বৃষ্ণতে হবে পাট কাটার সময় হয়েছে। তাই পাট গাছ কাটার পরই এ সময় গাছকে আলাদা করে গায় ১০ কেলি ওজনের আঁটি বাঁধা হয়। আঁটি বাঁধার পর সেগুলোকে ৩-৪ দিন জমিতেই শুণ করে রাখলে গাছের পাতাগুলো ঝরে যাবে। পাতাগুলো জমিতে ছিটকে দিতে হবে। পাটের পাতা ভাঙ্গো নয়।



চিত্র : পাট কাটা ও আঁটি বাঁধা।

পাট জাপ সেওয়া

প্রথমে ১০-১৫ টি আঁটি একলিকে গোড়া রেখে ভরপূর উল্টা দিকে গোড়া রেখে আরও আঁটি পানির উপর সাজাতে হবে একেই পাটের জাপ বলে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে জাপের উপর ৬০ সেমি ও নিচে ৬০ সেমি পানি থাকে। প্রতি ১০০টি আঁটির উপরে ১ কেজি ইউরিয়া ছিটকে দিলে পাট ডাড়াডাড়ি পড়ে ও পাটের আঁশের রং ভালো হয়। পাট জাপ সেওয়ার জন্য কিল, খাল বা নদীর ঘুঘু স্রোতযুক্ত পরিষ্কার পানি সর্বাপেক্ষা উত্তম।



চিত্র : পাট জাপ সেওয়া।

জাপ ডুবানোর জন্য মাটির ঢেলা, কলাগাছ, আমগাছ ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এতে আঁশের রং কালো হয়। বাঁশের ঝুটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে, কিংবা পাখর দিয়ে ঢালা দিলে জাপ ডুবানো যায়। জাপ ঢাকার জন্য কচুরিপানা, ধানের গুড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাট পাতনের সময় নির্ধারণ

পাট গাছের আঁটি পানিতে ডুবানোর ১০-১১ দিন পর ছেকেই পাটের পচন পরীক্ষা করতে হবে। সাধারণত জাপ থেকে ৪-৫ টি পাট গাছ টেনে বের করে যদি সহজে ছাল তথা আঁশ পৃথক করা যায় তবে বুঝতে হবে পাট গাছের পচন শেষ হয়েছে। পরম আবহাওয়ার ১২-১৪ দিন এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার ২০-২৫ দিনের মধ্যেই পাট পড়ে যায়।

আঁশ ছাড়ানো ও পরিষ্কারকরণ

পাতার পর গাছ থেকে দুইভাবে আঁশ ছাড়ানো যায়। যথা-

- ১) পানি থেকে প্রতিটি আঁটি উঠিয়ে এবং তখনো জরপর যেনে প্রতিটি গাছ থেকে আলাদাভাবে আঁশ ছাড়িয়ে সেওয়ার পর কতকগুলো পাট গাছের আঁশ একত্রে করে ধুয়ে বেগুনা হয়।
- ২) ছাটু বা কোমর পর্বত পানিতে দাঁড়িয়ে পাটের আঁটির গোড়ার কাঠ বা বঁশের সূঁচের দ্বারা পিটানো হয়। পরে গোড়ার অংশ ছাড়িয়ে পেঁচিয়ে দিয়ে পানির উপর সমান্তরালভাবে সাহসে পিছনে ঝেঁলা দিলেই অগ্রভাগের পাটকাঠি বের হয়ে যায়। পরবর্তীতে আঁশগুলো জলেস্কাবে ধুয়ে নিয়ে আঁটি বেঁধে রাখা হয়।

আঁশ শুকানো ও সংরক্ষণ

এখর সূর্যালোকে বঁশের আঁড় তৈরি করে ডাকে পাটের আঁশ শুকানো হয়। আঁশ কম শুকালে ফিরা গাছে বিধায় পচন ক্রিয়া শুরু হয়। এতে বঁশের ওপরের ছাল নষ্ট হয়ে যায়। ভালো সঠিকভাবে পাটের আঁশ শুকিয়ে সেওয়ার পর সুন্দর করে আঁটি বেঁধে ভালোয় সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন

জাত ভেদে ফলনের তারতম্য হয়। তোঁরা পাটের ফুলনার বেশি পাটের ফলন সাহায্য বেশি হয়।

বাংলাদেশের পাট ফসলের গুরুত্ব

পাট একটি আঁশ জাতীয় ফসল। বাংলাদেশে উৎপাদিত অর্থনৈতিক ফলসম্পদের মধ্যে পাটের স্থান শীর্ষে। পাটের ব্যবহারিক উপযোগিতা, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে পটিকে সোমালি আঁশ বলে অভিহিত করা হয়। পাট ফসলটি যে সবচেয়ে কমের সঙ্গে সফর বৃষ্টি থাকে। তাই সেখানে চাষকার হয় না। পাট ফসলটি খরা ও জলাবদ্ধতা দুটোই সহ্য করতে পারে। কাজেই বাংলাদেশের যে সব এলাকার সেচ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে এবং যেখানে যে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত জমিতে পানি জমে থাকে, সেখানে গানের ওয়ে পাট চাষ বেশি হয়। এছাড়া বাংলাদেশের প্রায় ৩০০-৪০০ হাজার হেক্টর জমি আছে যেখানে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুষ্ক পাট চাষা অন্য কোনো ফসল চাষ সম্ভব নয়। যথা, কচা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির কারণে পাট অখণ্ডা ফসলের ওয়ে কম অভিজ্ঞ হয়।

বাংলাদেশে বেশি ও তোঁরা এ দুইজাতের পাটের চাষ হয়। তবে বেশি জাতের ফুলনার তোঁরা জাতের পাটের চাষ কর্তাবনে বেশি হচ্ছে। এর কারণ হলো পূর্বে যে সব এলাকার বেশি পাটের চাষ হত, তা ছিল নিচু এলাকা। বর্তমানে বাল্য শস্যের চাহিদার জন্য ঐ সমস্ত এলাকা বাল চাষের অন্তর্ভুক্ত চলে গেছে। পাট চাষে গেছে ফুলনামূলকভাবে উঁচু জমি এলাকার সেখানে বৃষ্টি নির্ভরতা বেশি। যাহোক পাট ফসল শুষ্ক আঁশ হিসাবেই নয়, কৃষিজাত শিল্পে, তৈরী শিল্পে, পল্লিবেশ সংরক্ষণে ও সবজি হিসাবে পাটের গুরুত্ব অপরিসীম।

কাজ : শিক্ষাবীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাট ফসল চাষের গুরুত্ব বিবর্তে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

সরিষার চাষ

বাংলাদেশে তেল ফসল হিসাবে সরিষা, সরিষা, তিল, জিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। তবে এ দেশের মানুষ সরিষাকেই প্রধান তৈল বীজ ফসল হিসাবে বেশি চাষ করে থাকে।

নিম্নে সরিষা চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

জমি নির্বাচন

সরিষা চাষের জন্য বেলে সোণাশ অথবা পলি সোণাশ মাটি উপযোগ্য। অতএব, সহজে পানি নিকশ করা যায় এমনকি বেলে সোণাশ বা পলি সোণাশ মাটির জমি নির্বাচন করতে হবে।

জাত নির্বাচন

অনেক জাতের সরিষার চাষ হয়। নিম্নে সরিষার অনুমোদিত কতকগুলো জাতের নাম, যেমন- টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা, সম্পদ, রাই সরিষা, বাতি সরিষা-৮, বাতি সরিষা-১৪, বাতি সরিষা-১৫, বাতি সরিষা-১৬।

বপনের সময়

বাংলাদেশে সরিষা বীতকালীন ফসল। বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষ্যময় এবং জমির “জো” অবস্থা অনুসারে টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা ও বাতি সরিষা-৮ এর বীজ মধ্য অধিন থেকে মধ্য কার্তিক মাস (অক্টোবর) পর্যন্ত বোনা যায়। বাতি-১৪, বাতি-১৫ ও বাতি-১৬ এর বীজ অশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে।

জমি তৈরি

জমির প্রকারভেদ অনুযায়ী মাটির “জো” অবস্থা ৫-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও দুই দিয়ে মাটি ফুরুরা করে জমি তৈরি করতে হবে। সরিষার বীজ ছোট বিখার সোঁতা তেজে দুই দিয়ে মাটি সমান ও মিহি করতে হবে। জমির চারদিকে দলার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রয়োজনে সেচ এবং পানি নিকশে সুবিধা হয়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জাত, মাটি ও মাটিকে রসের ভাষ্যময় অনুসারে সরিষার জমিতে করপোস্ট সার, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিঙ্ক সাপারফস্ফেট, মোল্ডাস/সেরিক, এসিক ইত্যাদি সার সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সারের অর্ধেকসহ বাকি সব সার জমি প্রস্তুত করার সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া স্থল আলোর সময় উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার উপরি প্রয়োগের সময় মাটিকে ভাল খাঁকা দরকার।

বীজের মাত্রা

সরিষার জাত টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা ও বাতি সরিষা-৮ এর জন্য প্রতি শতকে ২৮-৩২ গ্রাম বীজ পাশে।

বপন পদ্ধতি

সরিষার বীজ সাধারণত দ্বিটরে বোনা হয়। বীজ ছোট বিখার বোনার সময় জমিতে সামান্যভাবে হিঁসানো কটকর হয়। এজন্য বাগি বা ছাই এর যে কোনো একটি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ



চিত্র : ফুলসহ সরিষা গাছ ও সরিষা বীজ।

ছীলসে জমিতে সমভাবে পড়ে। এতে জমির কোনো অংশগার পাই ঘন এবং কোনো অংশগার পাতলা হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। সঠি করে সরিষার বীজ বোনা যায়। এতে সার, সেচ, নিড়নি প্রভৃতি পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এ ক্ষেত্রে সঠি থেকে সঠির দূরত্ব সাধারণত ২৫-৩০ সেমি রাখা হয় ও প্রতি সারিতে ৪-৫ সেমি দূরত্বে এবং ২-৪ সেমি গভীরতার বীজ বপন করা হয়। মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে ২-৩ দিনের মধ্যে চারা গজাবে।

কাজ : শিকারীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সরিষা ফসলের ক্ষেত পরিদর্শন করবে এবং সরিষা ফসল উৎপাদনের ব্যাপকভাবে লিখে লগীকভাবে জমা দিবে।

পরিচর্যা

সরিষার জমিতে নিম্নলিখিতভাবে পরিচর্যা করা হয়।

- ১) **পানিসেচ :** মাটির অপ্রত্যা পর্যাপ্ত থাকলে সরিষার জমিতে সেচের প্রয়োজন হয় না। মাটির অপ্রত্যা বুধে ২-৩ টি সেচ দিলে বেশ ভালো ফলন হয়। প্রথম সেচ বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় সেচ পাঁচ বপন হওয়ার সময় দিলে ভালো হয়। বপনের পূর্বে যদি মাটি শুষ্ক থাকে তবে একটি হালকা সেচ দিলে জমি তৈরি করা উচিত। সরিষা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই সেচের পানি জমিতে জমে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।
- ২) **পাই পরীক্ষা করণ :** চারা খুব ঘন হলে পাতলা করে দিলে হবে। জমির কোথাও চারা না গজালে প্রয়োজনে সেখানে বীজ আবার বপন করতে হবে। পাতলাকরণের কাজটি চারা গজাবার ১০-১৫ দিনের মধ্যে করতে হবে।
- ৩) **আপাছা দমন :** সরিষার জমিতে আপাছা দেখা যা় নিড়নি দিয়ে ফুলে কেপতে হবে। চারা পাতলা করার সময়ই আপাছা দমন করা যায়। যে সব জমিতে অরোযুক্তিষ আক্রমণ দেখা যায় সে সব জমিতে পর পর দুই বছর সরিষা চাষ না করাই ভালো।
- ৪) **যোগের কাঁচ, লক্ষণ ও দমন :** সরিষা ফসলের প্রধান রোগ অশীতলরোগ ট্রাইট বা পাতার লাগ পড়া রোগ অন্যতম। এ রোগ দেখা দিলে পাতার গ্রন্থমে বাসমি পরে গাঢ় রঙের গোপাকার লাগ দেখা যায়। এ যোগের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করতে হবে প্রতিরোধ হিলাবে সঠিক নিয়মে বপন করা লয়কর।
- ৫) **শোকা মাকড় দমন :** সরিষার প্রধান ক্ষতিকারক শোকা হলো গাবপোকা। যাত্রা ও পরিণত গাবপোকা সরিষার ঝা, পাতা, পুষ্পমহুবি, ফুল ও ফল থেকে রস চুষে খায় ফলে পাই দুর্বল হয়ে যায়। ফুল ও ফল ধারণ সাধ্যহত হয়। ফল কঁচকে ছোট হয়ে যায় এবং লতকরা ৩০-৭০ ডায় ফলন কম হতে পারে। জাদুয়ারি মাসে আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়। জাব পোকের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ম্যালথিয়ান-৫৭ ইলি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি করে মিশিয়ে সিকন বয়েস সাহায্যে সরিষার ক্ষেতে ছিটাকতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

যখন পাতার সবকরা ৭০-৮০ ডায় সরিষার ফল খড়ের সঙ্গে বসন করে এবং পাতার পাতা হলুদে হয় তখনই ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। সকালে চাষা অরোযুক্তিষ মিশিরেজা অবস্থায় ফসল সংগ্রহ করা উত্তম। ফলসহ পাই টেনে তুলে লক্ষ্য কাঁড়ি করা কেটে ফসল সংগ্রহ করা যায়। তবে টেনে ফেলারি ভালো।

ফসল মাকুই

ফসল সংগ্রহের পর ৩-৪ দিন রোলে শুকিয়ে মাকুই করতে হবে। কিছু কিছু অশুষ্টি বীজ থাকতে পারে। অশুষ্টি বীজগুলোকে আলাদা করতে হবে।

বীজ তকানো ও সংরক্ষণ

মাতাই করায পর বীজ বেয়ে রোসে ভাসোভাবে ৩-৪ দিন তকিরে নেওয়ার পর শুক পায়ে সংরক্ষণ করা উত্তম। সংরক্ষিত বীজ মাথো মাথো ঢকিরে আবার সংরক্ষণ করতে হয়। রোসে তকানো বীজ প্রথম অবস্থায় সংরক্ষণ করলে বীজের অনুরোধনম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই রোসে তকানো বীজ ঠাণ্ডা করে প্রাস্টিক পাত্রে, টিনে বা ড্রামে রেখে সুখ ভ্যলোভাবে বন্ধ করতে হবে যেন পাত্রের ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে।

ফলন

বাংলাদেশে সরিষার ফলন প্রতি শতকে প্রায় ৩ থেকে ৩.৫ বেলি।

সরিষা ফসলের ক্ষুদ্র

বাংলাদেশের ৩ প্রকার সরিষার চাষ হয়। দখা- উরি, ছোট ও গুই। বিভিন্ন জাতের সরিষার বীজে ৪০-৪৪% তেল থাকে। সরিষার বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনের পর যে বৈশ থাকে তাতে প্রায় ৪০% আমিষ এবং ৬৪% সাইট্রোজেন থাকে। সরিষার কৈল দহু, বহিঃস্থে জল্য খুবই পুষ্টিগত বস্তু এবং উৎকৃষ্ট জৈব সাব। এছাড়া রাসায়নিক কালো সরিষার তেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার সরিষার জমিতে কৃত্রিম উপায়ে অত্যন্ত অল্প খরচে যৌমাষি পালন করে মধু সংগ্রহ করা হয়। এ জন্য সরিষাকে মধু উদ্ভিদও বলা হয়। কাজেই জরীদগিক, ঔষধশিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে সরিষা ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ : শিকারীরা অর্থনৈতিক উন্নতনে সরিষা ফসল চাষের ক্ষুদ্র বিষয়ে প্রাতিবেদন তৈরি করে জমা দিয়ে।

মাসকলাই চাষ

বাংলাদেশে চাষকৃত ডাল ফসলের মধ্যে মাসকলাইয়ের স্থান চতুর্থ। দেশে যেটি উৎপাদিত ডালের ৯-১১% আসে মাসকলাই থেকে। দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমফাল, বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাসকলাইয়ের চাষ বেশি হয়ে থাকে। মাসকলাই একটি শক্ত ও বহু-সহিষ্ণু ফসল যা উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। ডাল হিসাবে ছাড়াও এটি কাঁচাচাষ অবস্থায় পতখালি ও সবুজ সব হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। কাজেই ডাল ফসল হিসাবে মাসকলাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার আমরা মাসকলাই এর চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

জমি নির্বাচন

সুনির্দেশিত সোয়াঁন ও সোয়াঁন মটি মাসকলাই চাষের জন্য উপযোগী। উঁচু থেকে নিচু সব ধরনের জমিতে মাসকলাই চাষ করা যায় যদি পানি জমে থাকার আশঙ্কা না থাকে। মাসকলাই উষ্ণ ও শুকনো জলবায়ুর ফসল।



চিত্র : মাসকলাই

জাতসমূহ

বাংলাদেশে চাষকৃত মাসকলাইয়ের বেশ কিছু উন্নত ও স্থানীয় জাত রয়েছে। নিচে মাসকলাই এর কয়েকটি জাতের নাম দেওয়া হলো :

- ক) উচ্চনী জাত : পাহু, শবু, হেমন্ত, বিলামাস-১, বিনা হাস-২
- খ) স্থানীয় জাত : রাজশাহী, সাধুহাটি

জমি তৈরি

মাসকলাই চাষের জন্যে খুব মিহিভাবে জমি তৈরির প্রয়োজন হয় না। জমি ও মাটির প্রকারভেদে ২-৩টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে তৈরি করতে হয়।

বীজ বপনের সময়

মাসকলাই বীজ ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বপন করা যায়।

বীজ হার: নিচে মাসকলাই চাষের জন্য বীজ হার দেওয়া হলো।

উদ্দেশ্য	বপন পদ্ধতি	বীজহার (গ্রাম/শতক)
বীজের জন্য	হিটিয়ে	১৪০-১৬০
	সারিতে	১০০-১২০
পটখাদ্য বা লবুজ সারের জন্য	হিটিয়ে	২০০-২৪০

বীজ বপন পদ্ধতি

মাসকলাইয়ের বীজ হিটিয়ে বা সারি করে বপন করা যায়। তবে বীজের জন্য সারিতে বপন করা ভালো। সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি রাখতে হয়। সারিতে বীজকলো অবস্থিতভাবে ২-৩ সেমি গভীরে বীজ বপন করা হয়। হিটিনো পদ্ধতিতে শেষ চাষের সময় মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়।

বীজ শোধন

বীজ বাহিত রোগ দমনের জন্য বীজ শোধন করে বপন করা সবকার।

সার ব্যবস্থাপনা

মাসকলাই চাষে যেটির প্রতি সালের পরিমাণ নিম্নরূপ।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (গ্রাম/শতক)
ইউরিয়া	১৬০-১৮০
ডি এস পি	৩৪০-৩৮০
এমওপি	১২০-১৬০
অধুবীজ সার	১৬-২০

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

জমি তৈরির শেষ চাষের সময় সব সার প্রয়োগ করতে হবে। জীবাণুসার প্রয়োগ করা হলে ইউরিয়া সার প্রয়োগের দরকার হয় না। প্রতি একর বীজের জন্য ৮০ গ্রাম হারে অধুবীজ সার প্রয়োগ করতে হবে।

কর্ম : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিবটঙ্ক মাসকলাই ফসলের ক্ষেত পরিদর্শন করবে এবং মাসকলাই ফসল উৎপাদনের ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

- চারা লম্বাশের পরে আগছা দেখা দিলে ১৫-২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে আগছা পরিচর্যা করে নিতে হবে।
- জলাবদ্ধতার আশঙ্কা থাকলে পানি নিষ্কাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বণনের পর জমিকে রসের পরিমাণ কম বা অতিরিক্ত হলে হালকা সেচে সিক্ত হবে।
- সেচের পর 'জো' অবস্থার মাটির উপরের স্তর চর কেটে দিতে হবে।
- ফসলের জমিতে শোকা ও রোগের আক্রমণ দেখা দিলে তা সমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা :

ক) হলকলাইয়ের পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ ও বিস্তার

সারকোস্পোরাস নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগটি হয়। পরিত্যক্ত ফসলের অংশ, বায়ু ও বৃষ্টির মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। অধিক আর্দ্রতা ও উচ্চতাপে এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

আক্রান্ত পাতার উপর ছোট ছোট লালচে বাম্বাঝি পোলাকৃতি হবে ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। আক্রান্ত অংশের কোষসমূহ তকিয়ে যায় এবং পাতা খিঁচ হয়ে যায়। আক্রান্তের মাত্রা বেশি হলে সম্পূর্ণ পাতা কলসে যায়।

প্রতিকার

রোগ প্রতিরোধী জাতের (পার্ল, শরৎ ও হেরক) মাসিকলাই চাষ করতে হবে। আক্রমণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

খ) পাউডারি মিলিডিও রোগ

রোগের কারণ ও বিস্তার

ওইডিয়াম প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে এ রোগের অধিক প্রকোপ দেখা যায়। বীজ, পরিত্যক্ত পাতার অংশ ও কলুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

পাতার উপর পুটে পাউডারের মতো আবরণ পড়ে। হতে লক্ষ্য করলে পাউডারের উড়ার মতো লাগে।

প্রতিকার

বিকল্প পোষক ও পাতার পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। টিন্ট বা মিলিডিও প্রয়োগ করতে হবে। রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে। ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ বোজন করে বপন করতে হবে।

গ) হলদে মোজাইক ভাইরাস

রোগের কারণ ও বিস্তার

মোজাইক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত বীজ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে।

রোগের লক্ষণ

কচি পাতা এখানে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পাতার উপর হলদে সবুজ দাগ পড়ে। দূর থেকে আক্রান্ত জমি হলদে মনে হয়।

প্রতিকার

রোগমুক্ত বীজ বণন করতে হবে। সাদা সাহি মসনের জন্য হ্যালাথিয়ন স্প্রে করতে হবে। জারসক পাতা তুলে পুড়িয়ে ফেলাতে হবে। শস্য পর্বত অবলম্বন করতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাতের মাসকলাইয়ের চাষ করতে হবে।

শোকা ব্যবস্থাপনা

মাসকলাই ফসলে বিছা শোকার দ্বারা আক্রমণ হয়ে থাকে। এ শোকা পাতা, অপরিশুদ্ধ সবুজ ফলের রস খেয়ে ফেলে। শাস্ত্রসম্মত সময় পাতা জলিকার দ্বারা হয়ে যায়। ফলে ফলন করে যায়। এ শোকার আক্রমণ দেখা গিলে হাত দ্বারা সেক্ষেত্রে সতর্ক করে খণ্ডে করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে পরিমার্জন দিতে সাইশারমেট্রিন ইলি এক লিটার পলিটেক বিশিষ্টে স্প্রে করতে হবে।

এছাড়া কলামজাত মাসকলাই ভাল পূর্ববর্তক শোকা ও বীড়া উভয়ই কটি করে থাকে। এ শোকা ভালের খোসা খিন্ন করে ডিম্বের তুলে পাল খেতে থাকে। ফলে দানা ছালকা হয়ে যায়। এর ফলে বীজের অমুরোদগম কমতাই হয়ে যায় এবং বাগড়ার অনুপাতও হয়ে পড়ে। কলামজাত করার আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে দানা তকিরে দানার অন্তর্ভুক্ত ১২% এর নিচে আনতে হবে। বীজের জন্য টেকসই ৩০০ গ্রাম হ্যালাথিয়ন বা সেলিন শতকরা ১০ ভাগ গুঁড়া বিশিষ্টে শোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

ফসল কাটা, মাড়াই ও কলামজাতকরণ

খরিশ-১ মৌসুমে যে মাসের শেষ এবং খরিশ-২ মৌসুমে অক্টোবর মাসের শেষে ফসল সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ব হলে সব্বালের গিলে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। জাতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একবার বা ২-৩ বার ফসল সংগ্রহ করতে হবে। প্রথম গিলে পরিপক্ব কলা হাত গিলে এবং দেববারের বেলায় কাঁচ গিলে পাছগুলো গোড়া থেকে কেটে গিলে হবে। গছগুলো রোসে তকিরে লাঠি গিলে গিলিয়ে বা পত্রে গিলে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ রোসে ভালোভাবে তকিরে পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা করে লাঠি বা গিলে পায়ে সুপ বয় করে কলামজাত করতে হবে।

ফলন

জাত বেলে মাস কলাইয়ের গড় ফলন যেটির প্রতি ১.৫-২ টন হয়ে থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে ধান, পাট, সব্বা ও মাসকলাই ফসলের শোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে বিষয় শিক্ষকের নিকট জমা গিলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাকসবজি চাষ পদ্ধতি

আমরা শাক সবজি এতিনিমিত্তই ফসলের অধিকে, বাগানে, হাটে বাজারে দেখতে পাই। আমরা এগুলো শিল্পের জমি থেকে বা বাজার থেকে সংগ্রহ করে শাকসবজির চাষি। শূন্য করে থাকি। এবার আমরা এসব শাকসবজির চাষ সম্পর্কে জানব। তবে চাষ পদ্ধতি জানার আগে শাকসবজির জন্ম ও শাকসবজি চাষের বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করা দরকার।

১) শাকসবজির জন্ম

শাকসবজিতে প্রচুর পুষ্টি বিন্যাস। বিশেষ উন্নত পেশাদারী সঞ্চয়ের উৎপাদন ও ব্যবহার অতি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষ করে একদিকে পরিবারিকভাবে চাষিরা যেটোটা খায় এবং অন্য দিকে এগুলো বিক্রি করে বাড়তি আয়ও করা যায়। কাজেই খাদ্য, ডিটাইলিং, পানি ও অর্থকরী ফসল হিসাবে শাকসবজি চাষ করা খুবই জরুরি।



চিত্র : বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি।

খাদ্য হিসাবে শাকসবজি

১.১. খাদ্য মাল হিসাবে : শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি ও সি থাকে। এ ছাড়া আমিষ, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস প্রভৃতি উপাদান হিসাবে শাকসবজির জন্ম। অনেক।

১.২. জৈবিক জলবায়ু হিসাবে শাকসবজি : শাকসবজির জৈবিক জলবায়ু হিসাবে অনেক অবদান রয়েছে। যেমন, পশু হজমে এ কোষ্ঠকাটন্য দূর করার কাজ করে। কসুমে বাত বেশ সারে ইত্যাদি।

১.৩. অর্থনৈতিক দিক থেকে শাকসবজি : মানব দেহের জন্য শাকসবজি অত্যাবশ্যক। সুস্থ ও সবল দেহ গিলে বেড়ে থাকার জন্য প্রত্যেককে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি গ্রহণ করতে হয়। কাজেই শাকসবজি উৎপাদনে একদিকে পরিবারের চাহিদা মেটাতে হার অন্যদিকে একদিকে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবানও হওয়া যায়। শাকসবজি চাষ করে পণ্য জমির ব্যবহার করা যায়, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, বেকার সমস্যার সমাধান, নতুন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকশণ হাটে এবং খলিয়া ও পরিবারিক শ্রমপদ্ধতিতে কাজে লাগানো যায়।

অতএব উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে শাকসবজি উৎপাদন সব দিক দিয়ে বিশেষভাবে লাভজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

২. শাকসবজির শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীর অসংখ্য উদ্ভিদ শাকসবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে প্রায় ৬০ জাতের শাকসবজির চাষাবাদ হয়। উৎপাদন মৌসুমের উপর ভিত্তি করে এসব শাকসবজিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(১) শীতকালীন শাকসবজি (২) গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি (৩) বারমাসি শাকসবজি। যেমন :

শীতকালীন সবজি : টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পিঁয়, পাক্কা ইত্যাদি।

গ্রীষ্মকালীন সবজি : কল্যা, ডিম্বা, পটল, ধুন্দল, পুঁইশাক ইত্যাদি।

বারমাসি সবজি : বেগুন, ঢেঁড়স, পেঁপে, কাঁচকালা ইত্যাদি।

কাজ : শিকারীয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বারমাসি শাকসবজির একটি তালিকা তৈরি করে জমা দিবে।

শিম, টমেটো প্রভৃতি শীতকালীন সবজি। বর্তমানে লুই একটি জাত বেশ চাষ হচ্ছে যা গ্রীষ্মকালেও ফলন দিয়ে থাকে। শিমা কলমি নামক কলমিশাক প্রায় সারা বছরই চাষ করা যায়। শসা এবং বিড়া মিলিয়ে শসা জাতীয় ফসল সারা বছরই পাওয়া যায়। তাই এসব সবজিকে বারমাসি সবজি বলা হয়।

৩. শাকসবজি উৎপাদনের বিবেচ্য বিষয়

আমরা একতরফে বিভিন্ন শাকসবজির নাম এবং কোনকলমে কোন মৌসুমে জন্মায় তা জানেছি। এবার শাকসবজি উৎপাদনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে জানে নেই।

কোনো ফসল তথা শাকসবজি চাষ বা উৎপাদন করার পূর্বে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ভালো বীজ, বীজকলার জমি নির্বাচন ও তৈরি, বীজ বপন ও বীজকলার যত্ন, মূল জমি নির্ধারণ ও জমি তৈরি, বীজ হলন ও রোপণ, পানি সেচ ও মিকশ, অগোচ্য দমন ও হালচিং, পোকামাকড় দমন, রোগ দমন ও সময় ঠিকো ফসল সংগ্রহ।

৪. শাকসবজি চাষ পদ্ধতি

শাকসবজি চাষাবাদের বেশ কিছু পদ্ধতি দেশে বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ব্যবহৃত কয়েকটি পদ্ধতি হলো পর্বীয় ক্রমিক চাষ পদ্ধতি, মিশ্র ফসল পদ্ধতি, রিলে ফসল পদ্ধতি, কালি ফসল পদ্ধতি, সাহিবে ফসল চাষ পদ্ধতি।

নিম্নে কয়েকটি শাকসবজির চাষাবাদ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

পালংশাক চাষ

পালংশাক বেশ জনপ্রিয়, পুষ্টিগত ও সুস্বাদু গ্যাজ সবজি। এ সবজি অধিক ভিটামিনসমৃদ্ধ। বাংলাদেশে শীতকালে এর চাষ করা হয়।

পালংশাকের জাত : পুষা জরুতী, কপি পালং, গ্রিন, সবুজ বাংলা ও টকপালং। এছাড়া আছে নরেল কায়েট, ব্যানার্জি জায়েট, পুশ্প যোতি ইত্যাদি।



চিত্র : পালংশাক

মাটি

সোয়াশ উর্বর মাটি বেশি উপযোগী। এছাড়াও এটেল, বোলে-সোয়াশ মাটিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি মিহি করে তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির পেছ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উত্তম।

খ) ইউরিয়া সার চারা পল্লবের ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ কিলোরে উপরি প্রয়োগ করে হাটের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

জল নির্বাচন ও তৈরি

জমিতে আইল তৈরি করেও পালশোক চাষ করা যায়। উঁচু আইল পালশোকের জন্য নির্বাচন করা হয়। উঁচু আইলে কিছুটা আগাম পালশোক বীজ বপন করা হয়। কেদার দিয়ে আইলের মাটি ফুণিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ

পালশোকের জমিতে বিহম অনুযায়ী গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপনের হার

প্রতি আইলে	প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
৩৫-৪০ হার	১১৭ গ্রাম	৯-১১ কেজি	২৫-৩০ কেজি

বীজ বপনের সময়

সেপ্টেম্বর- জানুয়ারি মাস।

বীজ বপনের দূরত্ব

১০ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করতে হয়। তবে হিটরেও বীজ বপন করা যায়।

অক্সোরোপনের সময়

বীজ বপনের পর অক্সোরোপনে হার ৭-৮ দিন সময় লাগে।

বীজ বপন বা চারা রোপণ : জমিতে আইলে সরাসরি বীজ হিটরে বা গর্ত তৈরি করে আদার বীজ বপন করা যায় অথবা বীজতলায় চারা তৈরি করে সে চারা রোপণ করেও পালশোক চাষ করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি করে প্রতি মাদার ২-৩ টি করে বীজ বপন করতে হয়।

কাঙ্ক্ষা : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করবে এবং পালশোক চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে ভাবা দিবে।

পরিচর্যা**আশায়া সিধন**

জমিতে আশায়া দেখা দিলেই তা তুলে ফেলাতে হবে।

সার উপরিপ্রয়োগ

সময় মতো নিম্নমানুষাবী সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

এ শাকের জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। তাই সারের উপরিপ্রয়োগের আগে মাটির 'জো' অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চারা রোপনের পর ফালকা সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

শূন্যস্থান পূরণ

কোনো স্থানের চারা হয়ে গেলে অথবা বীজ না পড়লে সেখানে ৭-১০ দিনের মধ্যে পুনরায় চারা রোপন করতে হয়।

মাটি আলগা করণ

পাছের মৃত ভূমিখ জন্য মাটিতে বেশি দিল রস হয়ে যাওয়া এবং মাটিতে বাত সঞ্চে আসলে বাতাল প্রবেশ করতে পারে সেজন্য প্রতিবার পানি সেচের পর অইল/জমির উপরের মাটি আলগা করে দিতে হয়।

পাছ পাতলা করণ

বীজ পড়ার পর ৮-১০ দিন পর প্রতি মাসে ২টি করে চারা রেবে অতিরিক্ত চারা উঠিয়ে ফাঁকা জায়গায় রোপন করতে হয়।

অতিরিক্ত পোকামাকড়

পালশোকে মাঝে মাঝে শিলীলিকা, উরুচুমা, উইপোকা এবং পাচাছিন্নকরী পোকায় আক্রমণ দেখা যায়। আক্রমণ হলে আক্রান্ত পাছ তুলে ফেলাতে হয়।

রোপ ব্যবস্থাপনা

পালশোকের প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে- ১) গোড়া পড়া রোগ ২) পাতার দাগ রোগ ৩) পাতা খসড়া রোগ। এছাড়া পালশোকে আরও দুইধরনের রোগ দেখা যায়। যেমন- ডাউনি মিলডিট, পায়ল পোলাকুটির দাগ।

ফসল সঞ্চয়

বীজ রপনের এক মাস পর থেকে পালশোক সঞ্চয় শুরু করা যায় এবং পাছে ফুল না আসা পর্যন্ত যে কোনো সময় সঞ্চয় করা যায়।

ফলন

প্রতি আলে	প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
৮-১০ কেজি	২৮-৩৭ কেজি	২৮০০-৩৮০০ কেজি	৭-৯ টন

পুঁইশাক

পুঁইশাক বাংলাদেশের প্রধান ঔষধকালীন পাতাকারীকর সবজি, তবে সারা বছর ধরেই পাওয়া যায়। এতে ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। পুঁইশাক সাধারণত বসন্তঝড়ের আশ্রিনার বেড়ায় বা বাটার জন্মতে দেখা যায়। এছাড়া ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয়।

জাত : পুঁইশাকের দুইটি জাতের চাষ হয়ে থাকে। যথা- ক) লাল পুঁইশাক : পাতা ও কাণ্ড লাগতে। খ) সবুজ পুঁইশাক : পাতা ও কল সবুজ।

এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ২টি জাতে আছে। যেমন বারি-১, বারি-২।

জমি ভৈরি

সাধারণত মার্চ-এপ্রিল বা চৈত্র মাস পুঁইশাক লাগানোর ভালো সময় করে সেতের সুবিধা থাকলে কাছান বসে হুড়েই এর চাষ করা যেতে পারে। চারা রোপণের পূর্বে জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে ফুরফুরা করে তৈরি করে দিতে হবে। এ সবজি চাষের জন্য উর্বর বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ হাটি উত্তর।

সার প্রয়োগ

পুঁইশাক চাষে গোবর বা কমপোস্ট সার ব্যবহার করা ভালো। একে মাটির ওপাশে বজাঙ্গ থাকবে ও পরিবেশ রক্ষা হবে। পুঁইশাকের জন্য প্রতি শতকে বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র : পুঁইশাক

সার প্রয়োগের নিয়মানুবি:

- ক) ইউরিয়া হাতা সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম সিরে প্রয়োগ করাই উত্তম।
- খ) ইউরিয়া সার চারা লাগানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পরপর ২-৩ কিলোতে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম

বীজ বপন ও চারা রোপণ

মার্চ-এপ্রিল মাসে পুঁইশাকের বীজ বপন করতে হয়। বীজ ও শাপ কলাম সিরে পুঁইয়ের চাষ করা যায়। করে বীজ সিরে চারা ভৈরি করে এবং তা রোপণ করে চাষ করাই ভালো। পুঁইশাকের চারা ৬০-৮০ সেমি দূরে দূরে সারি করে ও সারিতে ৫০ সেমি দূরে দূরে রোপণ করতে হবে। বর্ষার সাথে পুঁইশাকের গভীর কিছু অংশ কেটে মাটিতে রোপণ করা যায়।

পরিচর্যা

নিয়মিত সিরে জমি অগাছমুক্ত রাখতে হবে। শরৎ সময় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। সেতের পর নিয়মিত সিরে মাটি ফুরফুরা করে দিতে হবে। জমিকে বাজে পানি না জমে সে দিকে খেঁচাল রাখতে হবে।

পোকামাকড়

এ শাকের ক্ষতিকর পোকায় যথোপযোজ্যে উল্লেখযোগ্য। এ পোকা গাছের পাতা, কাঁচি তলা খেয়ে ক্ষতি করে থাকে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

পুঁইশাকের ডগা লম্বা হতে ৩০০ ক্রাউই ডগা কেটে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে ডগা কেটে সংগ্রহ করলে নতুন ডগা গজাবে। নতুন ডগা কেটেফার কেটে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ভালোভাবে চাষ করলে প্রতি শতকে ১০০-১২০ কেজি পুঁইশাকের ফলন পাওয়া যায়।

বেঙ্গল চাষ

বেঙ্গল অতি পরিচিত একটি সবজি। যা সারা বছর পাওয়া যায়। এসেছে হাড়াও ভারত, চীন, জাপান, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সুতরাই, দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশসহ প্রকৃতি মেলে এর চাষ হয়ে থাকে।

জাত

ইসলামপুরী, শিলোখ, উত্তরা, নরনকাজল, সুতকেশী, খটখটিয়া, তারাপুরী, নরনতরা উল্লেখযোগ্য। বরমাসী কলো ও সাদা বর্ণের জাত (জিন বেঙ্গল) রয়েছে। কিসেপি জাতের মধ্যে ক্যান বিউটি, ফোরিটা বিউটি, উল্লেখযোগ্য।

বীজবপন ও চারা উৎপাদন

বেঙ্গল চাষের জন্য চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শীতকালীন বেঙ্গল চাষের জন্য শ্রাবণ বাসন্ত মাসের মাঝামাঝি হতে আশ্বিন মাস এবং বর্ষাকালীন বেঙ্গল চাষের জন্য চৈত্র মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বালি, কুম্পোষ্ট ও মাটি সমপরিমাণে মিশিয়ে বীজভাড়া তৈরি করতে হয়।

বীজ পাকানোর ৮-১০ দিন পর চাকা কুলে ছিটকি বীজভারার রোপণ করতে হয়।



চিত্র : বেঙ্গলচাষ বেঙ্গলচাষ

জমি নির্ধারণ

সোলোশ ও বেলে সোলোশ মাটি বেঙ্গল চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। তবে শুমি অঙ্গারবর্মের ভালো ব্যবস্থা থাকলে এটেল ও সোলোশ মাটিতেও বেঙ্গলের চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

জমি তৈরির জন্য ৪-৫ বার লাড়োয়াকি চাষ ও মই দিয়ে মাটি খুবকুচা করে তৈরি করতে হবে। ভালো ফসল পেতে হলে জমি পঙ্কীয়ভাবে চাষ করতে হবে।

সারের নাম	সতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

- ইউরিয়া হাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উত্তম।
- ইউরিয়া সার চারা পাকানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ কিলোতে উপরি প্রয়োগ করে হাটের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ

এক মাস বয়সের সবল চারা কাঠির সাহায্যে কুলে দিতে হবে। চারা পাছের শিকড়ের ফেন কতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এর পর ৭৫ সেমি দূরত্বের সারিতে ৬০ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের সিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করবে এবং বেঙ্গল চাষ পদ্ধতির উপর একটি সলার প্রজেক্ট তৈরি করে জমা দিবে।

পরিচর্যা

হাটিকে বসের অভাব হলে বা হাট চকিত্রে গেলে ১০-১৫ দিন পর পানি সেচ দিতে হবে। সেচের পর মিটানি দিয়ে হাট ত্বরক্ৰমে করে দিতে হবে। আগাছা নিয়ন্ত্রিত পরিচর্যা করতে হবে।

বেতনের বালাই ব্যবস্থাপনা

এ সেপে কমপক্ষে ১৬ প্রজাতির পোকাকীট এবং একটি প্রজাতির সাকড় বেতন কলসের ক্ষতি করে থাকে। এর মধ্যে বেতনের প্রধান শত্রু ডগা ও কল ছিন্নকাঠী পোক। এই পোকা বেতনের ডগা ও কল ছিন্ন করে। আক্রান্ত ডগা ও কল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। প্রচলিত হ্যালাথিয়ন বা সুমিথিয়ন নামক কীটনাশকের যে কোনো একটি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি মিশিয়ে ছিটকে দিতে হবে। এছাড়া নিম্নলিখিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেতনের বালাই সমন করা যায়-

- ক) কলম চারা ব্যবহারের মাধ্যমে বেতনের উইন্টরোপ সমন করা যায়।
- খ) কেবোমন ও মিটিকুমডার ফাঁস ব্যবহারের মাধ্যমে বেতন জাতীয় কলসের হাট পোকাকীট সমন করা যায়।
- গ) সুপার পচন্দুক বিট্টা ও সবিবার কৈল ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সবজি যেমন- বেতন, টমেটো, শসা, বাঁধাকপি কলসের হাট বাহিরে রোগ সমন করা যায়।
- ঘ) সঠিক সময়ে আগাছা সমন ও হালচিং করলে কলম বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।
- ঙ) পোকা প্রতিরোধী জাত ব্যবহারের মাধ্যমে বেতনের ডগা ও কলের ঘাটতা পোকা সমন করা যায়। যেমন- বারি বেতন-১ (উত্তরা), বারিবেতন-৫ (মহানগর), বারিবেতন-৬, বারিবেতন-৭ ইত্যাদি পোকা প্রতিরোধী জাত।
- চ) পোকাকীট আক্রমণমুক্ত চারা ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) সুস্থ সাগর ব্যবহার করে।
- জ) শস্য পর্যায়ে অনুসরণ করে

ফসল সংগ্রহ ও কলম

চারা রোপণের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে। বেতনের ফল, বীজ শাক হওয়ার আগেই সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত হালি শতকে বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ১৪০ কেজি বেতন উৎপন্ন হয়। উত্তরা বেতন ২৫০ কেজি পর্যন্ত ফলন দেয়।

বিশপক

বেতন ফসল সংগ্রহের পর ঠান্ডা ও খোলা জায়গায় করেক দিন স্তরকণ করা যায়। তবে বস্তার বেশিকণ রাখা ঠিক হবে না। এতে বেতন ডার স্বাভাবিক রং হারানোর পায়ে এবং শ্রমে সেতে পারে।

কুমড়া চাষ

কুমড়া অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সবজি। এ জাতীয় সবজির কিছু শীতকালীন ও কিছু শীতকালীন জাত আছে যা বাংলাদেশে জন্মায়। আবার কিছু জাত আছে যারা বছরই সংরক্ষণ করে সবজির চাহিদা পূরণ করা যায়। কুমড়া জাতীয় সবজির মধ্যে মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া ও লাউ প্রধান। আমরা এখন মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া ও লাউ সবজিগুলো সম্পর্কে জানব।

ক) মিষ্টি কুমড়া চাষ

ভূমিকা

মিষ্টি কুমড়ার প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে। এর ফল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়। তবে এর প্রধান ব্যবহার পাকা অবস্থায়। কুমড়ার পাতা ও কচি ভগা খাওয়া সার। মিষ্টকুমড়া সচরাচর বৈশাখী, বর্ষাতি ও মাসী এ তিন প্রেসিতে বিতরিত।



চিত্র : মিষ্টি কুমড়াসহ গাছের কিছু অংশ

চাষের সময়

বৈশাখী কুমড়ার বীজ মাঘ মাস, বর্ষাতি কুমড়ার বীজ বৈশাখ এবং মাসী কুমড়ার বীজ শ্রাবণ মাসে বপন করতে হয়।

মাসা তৈরি ও সার প্রয়োগ

মাসার জন্য সাধারণত ৩-৪ মিটার দূরত্বে ৮০-১০০ ফল সেমি আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে ছোবর বা কমপোস্ট ৫ কেজি, ইউরিয়া ১০০ গ্রাম, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এমওপি ১৫০ গ্রাম, জিপসাম ৯০ গ্রাম ও মত্যা সার ৫ গ্রাম দিতে হবে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার বীজ বোনার ৮-১০ দিন আগে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া দুইভাগে বীজ বোনার ১০ দিন পর প্রথমবার ও ৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাসার চারশপে অগভীর একটি সাল্লা তেটে সার মাসার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপন

মাসা তৈরি হতে ১০-১২ দিন পর প্রতি মাসায় ২-৩ টি বীজ মাসার মাড়খানে রোপণ করতে হবে।

পরিচর্যা

আগাছা থাকলে তা পরিচর্যা করে চারা গাছের গোড়ায় কিছুটা মাটি ঢুকে দিতে হবে। মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি আগাশা করে দিতে হবে। গোড়ায় কাছাকাছি কিছু গড় ১৫-২০ সিন পর বিছিয়ে দিতে হবে। কল বরা শু কবলে কলের নিচেও গড় বিছিয়ে দিতে হবে। বৈশাখী কুমড়া ব্যতিক্রম হয়, অন্যান্য কুমড়ার জন্য মাটির ব্যবস্থা করতে হয়। গাছের লতাশাখা বেশি হলে কিছু লতাশাখা কেটে দিতে হবে।

শোকা ও রোগ সনাক্ত

কুমড়া মাঠীয় গাছের বিভিন্ন শোকের মধ্যে লাল শোকা, কঁসিগলে শোকা এবং কলের য়ছি উল্লেখ্য যোগ্য। এ শোকা দমনের জন্য সেলিন ডায়াজিনিন প্রয়োগ করা থেকে পারে। আর এ মাঠীয় সবজির রোগের মধ্যে পাউডার মিলডিও, ডাউনি মিলডিও ও এনল্ট্রাকনোজ প্রধান। দুই সপ্তাহ পর পর ডায়াজেন এম ৪৫ প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

মিষ্টকুমড়া কচি অবস্থা থেকে শু করে পরিপূর্ণ পাকা অবস্থায় খাওয়া যায়। তাই কচি অবস্থা থেকেই ফসল সংগ্রহ শু হয়। কুমড়া বেশ পাকিয়ে সংগ্রহ করলে অনেকদিন ঘরে রাখা যায়। শতক হ্রতি ফলন ৮০-১০০ কেজি হতে পারে।

খ) চালকুমড়া চাষ

ভূমিকা

এশ্যাবাল্যের যত্নের চালে এ সবজি পাছ উঠানো হয় কলে এটি চাল কুমড়া নামে পরিচিত। তবে জমিতে মাড়ায় কলন বেশি হয়। কচি কল (কালি) তরকারি হিসাবে এবং পরিপক্ব কল মোরকা ও হালুয়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

চাল কুমড়ার জাত

বাংলাদেশে কুমড়ার কোনো অনুমোদিত জাত নেই। তবে বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি চালকুমড়া-১ নামের জাতটি বাংলাদেশের সব অঞ্চলে চাষ করা যায়।

মাটি

সোম্পাশ মাটিতে এটি চাষ করা হয়। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাদা মাটি ছড়া যে কোনো মাটিতে চাষ করা যায়।

চাষের সময় : ফেব্রুয়ারি-মে

হালু তৈরি

জমি ভালোভাবে চাষ করে খই দিয়ে চোপা ফেঁদে সমান করতে হবে। জমিতে হালার উচ্চতা হবে ১৫-২০ সেমি হয় হবে ২.৫ মিটার এবং লম্বা জমির সুবিধামতো দিতে হবে। একাধে পর পর মাসা তৈরি করতে হবে। এরপর পাশাপাশি দুইটি হালার মাঝখানে ৬০

সেমি প্রশস্ত সোড ও নিকশা নালো রাখবে। পরিবারিক বাগানে চাল কুমড়ার চাষ করতে হলে মাদাচ বোনার পর চারা পলালে তা মাচা, যত্নের চাল কিংবা কোনো কুম্ভের উপর তুলে দেওয়া হয়।

হালার সার প্রয়োগ

প্রতি মাদাচ পোষ্য ১০ কেজি, ডিএসপি ২০০ গ্রাম, এমওপি ৫০ গ্রাম দিতে হবে।

হালার পর্ক তৈরি

মিষ্টিকুমড়া চাষের দিরমের অনুক্রম।

হালার পর্ক বীজবপন

প্রতি মাদাচ সারিতে ৪-৫ টি বীজ বপন করতে হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যেই বীজগুলো গজাবে। চারা পজানের কয়েকদিন পর প্রতি হালার ২-৩ টি সবল পাছ রাখতে হবে।



চিত্র : চালকুমড়ার পাছের দিক্ত অংশ

স্বাক্ষর : শিক্ষাবীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করে চালকুমড়া মিষ্টি কুমড়ার চাষ পদ্ধতির বাগানে লিখে অর্থা লিখে।

পরিচর্যা

মালা গুণিত্রে গেলে সেচ দিতে হবে। বর্ষার পানি জমলে তা নিকাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাতের ভূঁইয় জন্ম মাতা দিতে হবে। আশার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। পাতের পোড়ার ব্যক্তি উঠিয়ে দিতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা

ফলের মাছি পোকা, রোগ পাতকির বিটল, ইলিগ্যাক্সা বিটল, লাল মাঝকু প্রভৃতি পোকা ফলের ক্ষতি করে থাকে। কীটনাশক প্রয়োগ করে এসব পোকা দমন করা যায়। এছাড়া পাতকির মিলিডিও পাতার উপরে সাদা পাউকার এবং ডাউনি মিলিডিও পাতার নিচে ফুলের বেতনি ইং প্রভৃতি রোগ পাতার ক্ষতি করে পাতকে দুর্বল করে ফেলে। ছত্রাক মশক বা বোরো মিল্লার প্রয়োগ করে এসব রোগ থেকে রেহাই পাতয়া যায়।

লাউ চাষ

ভূমিকা

বাংলাদেশে লাউ একটি জনপ্রিয় সবজি। লাউয়ের ফ্রেস এর শাক বেশি পুষ্টিকর।

লাউয়ের জাত

বাংলাদেশে লাউয়ের অনেক জাত চাষে পড়ে। ফলের আকার-আকৃতি এবং পাতের লম্বায়ের পরিমাপ থেকেও জাতগুলো পার্থক্য করা যায়। হাল্কা সেনীয়া উন্নত এবং গবেষণালব্ধ কিছু জাতের মাথ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ক) সেনীয়া জাত : গাঢ় সবুজ থেকে হালকা সবুজ
- খ) উন্নত জাত : হারিলাই ১, হারিলাই ২
- গ) হাইব্রিড জাত : পেলাকার বা লবা হালকা সবুজ

মাটি

প্রায় অনেক মাটিতেই লাউ ভালো উৎপাদিত হয়। তবে মোমাঁশ মাটিতে লাউয়ের ফল ভালো হয়। যেসে মাটিতে ঐক্য পদার্থ যোগ করে প্রয়োজনীয় সেচ দিয়ে সহজে লাউ চাষ করা যায়।

বীজ বপনের সময়

আগস্ট-সেপ্টেম্বর

মাটি তৈরি, মালা তৈরি, বালায় শাক প্রয়োগ ও ফলায় গরু তৈরি প্রকৃতি চালকুমড়া চাষের বর্ণনার অনুরূপ।

বীজ বপন

প্রতিমালায় ৪-৫টি বীজ বপন করতে হবে। ৪-৫ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হবে।

কাউনি ও মালা তৈরি

গাছ বপন ১৫-২০ সেন্টিমিটার বড় হয় তখন পাতের পোড়ার পাশে বঁশের ভগা কলিক্স মাটিতে পুতে দিতে হয়।

পরিচর্যা

চারা একটু বড় হলে প্রতি মালায় ২টি করে চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। মাটি নিভানি দিয়ে আলপা করে কুরকুরা করতে হবে। লাউগছে প্রয়োজনীয় পরিমাপ পানি প্রতিদিন দিতে হবে।



চিত্র : বাগার লাউসহ লাউপাতা

লাউসহ ব্যবস্থাপনা

এ সবজিতে রক্ত গাম্বিন বিটল পোকের আক্রমণ হতে পারে। এ পোকা দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এছাড়া কিছু প্রজাতির খাসের মাধ্যমে লাউয়ের 'মোলাইক ভাইরাস' রোগ হতে পারে।

ফল সঞ্চার

ফল তোলা বা সঞ্চার করার উপযুক্ত পর্যায় হবে যখন-

- ফলের গায়ে প্রচুর চং এর উপস্থিতি থাকবে।
- ফলের গায়ে নখ দিয়ে চাপ দিলে খুব সহজেই নখ ঢেবে যাবে।
- পরাগায়নের ১২-১৫ দিন পর ফল সঞ্চারের উপযোগী হয়।

ফলদ

বারি লাউ-১ এবং বারি লাউ-২ চাষ করলে স্বাভাবিকভাবে ফেটর প্রতি ৩৫-৪৫ টন (১৪০-১৮০ কেজি/শতক) পর্যন্ত ফলদ পাওয়া যায়।

শিম চাষ

শিম বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় সবজি। শিমে প্রচুর পরিমাণে আয়িশ থাকে। এটি শীতকালীন সবজি।

মাটি

দোআঁশ মাটি শিম চাষের জন্য উত্তম। তবে উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করা যায়।

প্রাক

বারি শিম-১, বারি শিম-২, বারি শিম-৩, বারি শিম-৪, ইপসা শিম, মৃত কাম্বল, কার্জিকা, মলাডক, বাঘনখা, বারমাসি প্রকৃতি শিমের জনপ্রিয় আস্ত।



চিত্র : শিমের শিমপাতা

বীজ বপনের সময় : বসন্ত ছুঁলে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

জমি তৈরি

বেশি জমিতে আবাস করলে জমি কয়েকটি চাষ ও দুই লিখে ভালো ভেঙে সমতল করতে হবে। তবে বন্যজাতিকের আসে পাশে, পুকুর পাড়ে, পথের ধারে ও জমির আলো সাধারণত শিমের চাষ করা হয়।

মাথা তৈরি

জমিতে মাথা (পর্ক) ৪৫ সেমি \times ৪৫ সেমি \times ৪৫ সেমি আকারে তৈরি করতে হবে। এক মাথা থেকে আরেক মালার দূরত্ব ২.৫-৩ মিটার।

সার প্রয়োগ

প্রতিটি মাথা পাত্রে আবর্তনা সত্ত্বে লিখে পূরণ করতে হবে। ভারসার প্রতিটি মালার তৈল গুড়া, হাই, টিএসপি, নিট্রোজেন ও পটাশ হাটের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। মাথাটি এমনভাবে করতে হবে যেন মাটি থেকে ভারতীয় মালার উত্তর ১০ সেমি হয়। শির ফলসমূহে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার হয় না। কারণ এটি শিকম পরিবারের ফল। এদের শিকমে নাইট্রস বা গুটি তৈরি হয় যাতে প্রচুর বাতাসজনীত নাইট্রোজেন জমা থাকে।

বীজ বপন

সার প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর প্রতি মালার ৫-৬ টি বীজ বপন করতে হবে। চারা গজাবোর পর প্রতি মালার ২টি সুস্থ ও সবল চারা বেছে ব্যক্তিগতভাবে তুলে ফেলতে হবে।

পরিচর্যা

পাছ টিকনোয়া বাড়ান জন্য মাঠ নিজে হবে। পাত্রে পোড়ার মাটি শক্ত হলে কিছুদিন দিয়ে তা আলপা করতে হবে। মাটিতে হলেও অগ্নি হলে পানি দেওয়া দিতে হবে। বর্ষার আগে পাত্রে পোড়ার পানি না হলে সে জন্য পোড়ার মাটি উঠিয়ে দিতে হবে। চারা বৃদ্ধি হতে থাকলে ১৫-২০ দিন পর পর ২-৩ কিলো ৬০ গ্রাম টিএসপি ও ৬০ গ্রাম এমএসপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বালাই ঘাটহানি

শিম গাছে জাব পোকা, ব্রিস, পাত্রে বোয়ার ইত্যাদির আক্রমণ হতে পারে। প্রায় পোকা মড়ক ওপা, পাড়া, ফুল ও ফল ইত্যাদির রস চুষে খায়। শিমের উচ্ছেদ শীঘ্র শিমে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এদের মন কমা যায়। জাইরাস আক্রমণ থাকলে মাটিতে উঠিয়ে পড়ার পরে গুঁতে দিতে হবে।

ফল সঞ্চার

জাভ তেল বীজ বপনের ৯৫-১০৫ দিন পর শিম গাছ থেকে শিম উঠানো যায়। বীজ হিসাবে শিম সঞ্চার করতে শিম যখন গাছে থাকে তখনই ফল খর্ব হয়, তখন সঞ্চার করা হয়। শিম থেকে বীজ বের করে পরিষ্কার ও শুক পায়ে শিমের শুকনা পাতার গুঁড়ো সহ সঞ্চার করতে হবে।



চিত্র : শিম গাছের জাবপোকা।

ফলন

জাভতে শিমের ফলনের সময়কাল হয়ে থাকে। যেমন- বারি শিম-১ জাভের শিমের বীজ ফেট্রোপ্রটি ২-৩ টন (৮-১২ কেজি/শতক) উৎপাদিত হয়। সবজি হিসাবে শিম পুরা মৌসুমে উঠানো যায়। আধুনিক-কার্তিক মাসে শিম ধরে। শিম গাছ ৪ মাসেরও বেশি ফলন দেয়।

সতর্কতা : শিকমবীরা কয়েকটি মাসে খাব হয়ে পালং, পুঁই, কুমড়া, শিম ও বেগনের রোগ বালাইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে জমা দিবে।

কৃত্রিম পরিচ্ছন্ন ফুল-ফল চাষ পদ্ধতি

ফুলের চাষ

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ফুলের চাষ হয় না। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে ফুলের চাষ হয়ে থাকে। সম্প্রতি রজনীগন্ধা, গোলাপ ও প্রাচীনকালের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে বেগি, জুই, চামেলি, বন্দর-জ, অপরাজিতা, শেফালি, চন্দ্রবটিকা প্রভৃতি নানা ধরনের ফুল জন্মে। বাণিজ্যিকভাবে এসব ফুলের চাষ করে লাভান্বন হওয়া সম্ভব। আমরা এটির শুধু ধারণা ও বেগি ফুল চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

গোলাপ চাষ

গোলাপকে ফুলের রানি কলা হয়। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে বহুমুখিত কোলাপের চাষ হচ্ছে এবং দিন দিন কোলাপের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং গোলাপ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অবসাদে রাখা হয়।

জাত সমূহ

পৃথিবীজুড়ে গোলাপের অসংখ্য জাত রয়েছে। জাতগুলোর কোনোটির নাম বড়, কোনোটি কোপালো, কোনোটি লতাসো। জাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গোলাপ নানা, লাল, হলুদ, ককলা, গোলাপি এবং মিশ্রিত রঙের হয়ে থাকে। এ ছাড়াও হলি এপিজ্যাকথ (গোলাপি), ব্র্যাক মিল (ককলা), ইরানি (গোলাপি), মিরিতা (লাল), দুই জন্ম ফুল আইজ্যাকথ চাষ করা হয়।

বংশবিভাগ

গোলাপের বংশ বিভাগের জন্য অবস্থানভেদে শাখা কলম, নারী কলম, ভটি কলম ও চোখ কলম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য বীজ উৎপাদন করে তা থেকে চারা তৈরি করা হয়।

জমি নির্বাচন

গোলাপ চাষের জন্য উর্বর সোয়াশ মাটির জমি নির্বাচন করা উত্তম। ছাত্রাবিহীন উঁচু জায়গা দেখালে অলাভজনক হয় না, এরপ জমিতে গোলাপ ভালো জন্মে।

জমি তৈরি

নির্বাচিত জমি ৪-৫ টি আড়াখড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ফুরতুয়া ও সমতল করতে হবে। এরপর মাটি সুপিরে ৫ সেমি উঁচু করে ৩ মি x ১ মি আকারের বেড বা কোরা তৈরি করতে হবে। একত্রে কোরা তৈরির পর সিঁটি দূরত্বে ৬০ সেমি x ৬০ সেমি আকারের এবং ৪৫ সেমি পতীর পর্ত ধরন করতে হবে। পর্তের উপরের মাটি ও নিচের মাটি আলাদা করে রাখতে হবে। চারা রোপণের ১৫ দিন পর্ত করে খোলা রাখতে হবে। এ সময়ে পর্তের জীবাণু ও পোকামাকড় যত্না হয়ে।

সার প্রয়োগ

প্রতি পর্তের উপরের মাটির সাথে হ্রক প্রদত্ত সারগুলো মিশিয়ে পর্তে স্কেলে হবে। এরপর নিচের মাটির সাথে ৫ কেজি পটাশ সোব্ব, ৫ কেজি পাভা পটাশ সার ও ৫০০ গ্রাম ছাই শুকনোভাবে মিশিয়ে পর্তের উপরের স্তরে মিতে হবে। এভাবে পর্ত সম্পূর্ণ ভরতি করার পর ১৫-২০ দিন কেলে রাখলে সারগুলো পচবে ও পানি লাগানোর উপযুক্ত হবে। বর্ষাকালে যাতে পাতার বৃষ্টির পানি জমে না থাকে, সে জন্য নলা তৈরি করতে হবে।



চিত্র ১ ফুলের গোলাপের চাষ

চারা বা কলম রোপণ

অধিন মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে শীত মাস পর্বত চারা লাগালে বেতের পূর্বের অবস্থানে কুল্পাক্তির বর্ধিত হুঁড়ে চারা লাগাতে হয়। এখনও পলিথিন ব্যাগ বা মাটির টব থেকে চারা বের করে দুর্বল শাখা, রোগাক্রান্ত শিকড় ইত্যাদি কেটে ফেলা হয়। চারা লাগিয়ে গোড়ার শক্তভাবে মাটি চেপে নিতে হবে। চারা রোপণের পর চারাটি একটি খুঁটি পুতে খুঁটির সাথে বেঁধে নিতে হবে। চারা লাগিয়ে গোড়ার পানি সেওয়া উচিত। ২-৩ দিন হারার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

পরিচর্যা

- আপাছা সমন : গোলাপের কেনারিতে অনেক আপাছা হয়। আপাছা তুলে ফেলতে হবে।
- পানি সেচ : মাটির অর্ধেকা বাচাই করে বাছের গোড়ার একদুটো সেচ নিতে হবে যেন মাটিতে রসের ছাটকি লা হয়।
- পানি নিকাশ : গোলাপের কেনারিতে কোনো সময়ই পানি জমতে সেওয়া উচিত নয়। কারণ গোলাপ গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।
- ডাল-পালা ছাঁটাইকরণ (Pruning) : গোলাপের সবুজ ডালে বেশি ফুল হয়। তাই পুরাতন ও রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করা প্রয়োজন। প্রতিবছর গোলাপ বাছের ডালপালা ছাঁটাই করলে বাছের গঠন পরিমো সুন্দর ও সুদৃঢ় হয় এবং অধিক ছায়ে বড় আকারের ফুল ফোটে।
- ফুলের ফুটি ছাঁটাই : অনেক সময় ছাঁটাই করার পর ফুলগাছের ডালে অনেক ফুঁড়ি জন্মায়। সবগুলো ফুঁড়ি ফুটতে দিলে ফুল তৈরি বড় হয় না। তাই বড় ফুল ফোটায় জন্য আসল ফুঁড়ি রেখে পাশের ফুঁড়িগুলো ধারালো চাকু দিয়ে কেটে নিতে হয়।

কাজ : শিকারীরা বিলাপের নিকটস্থ একটি ফুলের বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ পরিদর্শন শেষে গোলাপ ফুলের চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো সমীক্ষণে পোস্টারে লিখে প্রস্তুত উপস্থাপন করবে।

গোলাপ হাকড় ব্যবস্থাপনা

গোলাপ গাছে যেসব গোলাপ দেখা যায় তন্মধ্যে রক্ত ফুল ও বিটল প্রধান।

- রক্ত ফুল : এ গোলাপ দেখতে অলংকটী মত। চাষকারের মধ্যে। পরস্পর সময় বর্ষাকালে এর আক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ গোলাপ গাছের বাগানের রক্ত ফুলে বঁধ। কলে হাকলে ছোট ছোট কালো দাগ পড়ে। প্রতিকার না করলে আক্রান্ত গাছ চারা বঁধ। বাছের সংখ্যা কম হলে গাছ মজার ব্রাশ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে ব্রাশ করলে গোলাপ গাছ বঁধ। ম্যালেশিয়ান বা ভারতীয়দের মাটির কীটনাশক প্রয়োগ করে এ গোলাপ সমন করা যায়।
- বিটল গোলাপ : পীড়কালের শেষে এ গোলাপের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এ গোলাপ গাছের কটি পাতা ও ফুলের গাশ্বিন্তি ছিন্ন করে বঁধ। সাধারণত বাছের বেলা আক্রমণ করে। আসলে কীট সেতে এ গোলাপ সমন করা যায়। ম্যালেশিয়ান মাটির কীটনাশক ছিটকে এ গোলাপ সমন করা যায়।

গোলাপ ব্যবস্থাপনা

গোলাপ গাছে অনেক রোগ হয়। তন্মধ্যে কালো দাগ পড়া রোগ, ডাইব্রাক ও পটভিত্তি মিলডিউ প্রধান।

- ক) কাশো মাগ পড় রোগ : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। রোগাক্রান্ত পাছের পাতার গোলাকার কাশো রঙের মাগ পড়ে। অক্রান্ত পাছের পাতা করে দিয়ে গাছ পরিশূন্য হয়ে যায়। চৈত্র থেকে শুরু করে কার্তিক মাস পর্যন্ত এ রোগের আক্রমণ ঘটে। এ রোগের প্রতিকারের জন্য পাছে সুস্থ সাব প্রয়োগ করতে হবে। পাছের পোড়ার ফল পানি করে না থাকে সে দিকে খেয়াল করতে হবে। এ ছাড়া ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে এ রোগ সনন করা যায়। অক্রান্ত পাতাগুলো কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হয়।
- খ) ডাইথ্যাফ : ডাল ছাটাইয়ের কাটা ছালে এ রোগ আক্রমণ করে। এ রোগ হলে পাছের ডাল বা কাণ্ড মাথা থেকে কাশো হয়ে নিজের দিকে সরতে থাকে। এ লক্ষণ ক্রমে কাছের মাথা দিয়ে শিকড় পর্যন্ত পৌঁছে এবং সম্পূর্ণ গাছ ভাঙা যায়। এ রোগ লম্বন করতে হলে অক্রান্ত কাণ্ড বা ডালের বেশ নিচ থেকে কেটে পুড়ে ফেলতে হবে। ডাল ছাটাইয়ের চাকু প্রীবাশুনালক দিয়ে মুছে ডাল ছাটাই করা উচিত। কর্তিক স্থান শিশিট দিয়ে মুছে দিতে হবে।
- গ) পট্টভারি বিশিষ্ট : এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ। শীতকালে কুশাশর সময় এ রোগের বিস্তার ঘটে। এ রোগে অক্রান্ত হলে পাতা, কচিকলা ও ফলিতে সাগা পট্টভার দেখা যায়। কলে ভুড়ি না ফুটে নষ্ট হয়ে যায়। এ রোগ লম্বন করতে হলে অক্রান্ত ডালা বা পাতা কুলে পুড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া বিগিটি বা সাগড়ার, ডাইথেন এর-এ-২ যে কোন একটি পণ্ডিতে মিশিয়ে সন্ধ্যাে একবার স্প্রে করে এ রোগ লম্বন করা যায়।

কুল সজ্জ

কুল ফোটার পূর্বেই গাছ হতে কুল সজ্জ করতে হয়। সজ্জার পর ফুলের ডাটার নিজের অংশে পরিভার পানিতে ছুঁয়ে ঠাণ্ডা জলপান রাখলে কুল ভালো থাকে। মাঝে মাঝে ফুলে পানির ছিটা দেওয়া ভালো।

বেলি কুল চাষ

বাংলাদেশের অধিকাংশ উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ফুলের ডোহা, ফুলের মধ্যস্থলে সুগন্ধীকুল হিসাবে বেলির ফল আছে। উৎসব এ অনুষ্ঠানে বেলিকুল ব্যবহৃত হয়। এটি একটি অর্থকরী কুল।

জাত

তিন জাতের বেলি কুল দেখা যায়। যথা : ১। সিঙ্গল ধরনের ও অধিক পদ্মযুক্ত। ২। মাথাগিরি আকার ও তবল ধরনের। ৩। বৃহৎসংখ্যক তবল ধরনের।



চিত্র : কুলসহ বেলিকুল গাছ

যশে বিস্তার : বেলি কুল গাতি কলম, মাথা কলম ও ডাল কলম পদ্ধতির মাধ্যমে বংশবিস্তার করা হয়।



চিত্র : টবে লম্বা কলম



চিত্র : মাটিতে লম্বা কলম

জমি চাষ ও সার প্রয়োগ

বেলে মাটি ও জম্বী এটেল মাটি স্বাভাবিক সার ধরনের মাটিতে বেশি ফুল চাষ করা যায়। জমিতে পানি সেচ ও পানি সিকানেশন ব্যবস্থা থাকে ভালো। জমি ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে সুবিস্তৃত ও সমান করতে হবে। জমি তৈরির সময় জৈব সার, ইউরিয়া, কসকেট এবং এমকপি প্রয়োগ করতে হবে। প্রায় ১ মিটার অন্তর চারা রোপণ করতে হবে। চারা লাগানোর পর ইউরিয়া প্রয়োগ তবে পানি সেচ দিতে হবে।

কলম বা চারা তৈরি

গ্রীষ্মের শেষ হয়ে বর্ষার শেষ পর্যন্ত বেশি ফুলের কলম বা চারা তৈরি করা যায়। চারা থেকে চারা ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি হতে হবে। চারা লাগানোর জন্য পর্ন্ত বুঁকে পর্ন্তের মাটি বেগ লাগিয়ে, জৈব সার ও আক্রেট ছই পর্ন্তের মাটির সাথে মিশিয়ে পর্ন্ত ভগাই করতে হবে। এরপর প্রতি পর্ন্তে বেশিও কলম দসাতে হবে। বর্ষায় বা বর্ষার শেষের দিকে কলম দসালেই ভালো। তবে সেসের ব্যবস্থা ভালো হলে বসন্তকালেও কলম তৈরি করা যায়।

টবে চারা লাগানো

জৈব পদার্থ খুঁক সোঝাশ মাটিতে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমকপি সার পরিমালমতো মিশিয়ে টবে বেশি ফুলের চাষ করা যায়। টব ঘরের বারান্দা বা ঘরের ছাঁচে রেখে দেখা যায়।

পরিচর্যা

- সেচ দেখাশ :** বেশি ফুলের চাষে জমিতে সবসময় ভাল হাওয়া দরকার। গ্রীষ্মকালে ১০-১২ দিন পর পর, শীতকালে ১৫-২০ দিন পর পর ও বর্ষাকালে খুঁটি সময়মতো বা হলে জমির অবস্থা বুকে ২-১ টি সেচ দেখা দরকার।
- আপাছা সময় :** জমি বা টব থেকে নিয়মিত আপাছা পরিচর্যা করতে হবে। বড় কেটে ফুটি করে জমিতে বিছিয়ে বসলে সেসের প্রয়োজন কম হয় এবং আপাছাও বেশি লাগতে পারে না।
- অল ছাঁটাইকরণ :** প্রতিবছরই বেশি ফুলের পছের ভাল-পলা ছাঁটাই করা দরকার। শীতের মাঝামাঝি সময় ভাল ছাঁটাই করতে হবে। মাটির উপরের ভাগ থেকে ৩০ সেমি উপরে বেশি ফুলের পাছ ছাঁটাই করতে হবে। অল ছাঁটাইয়ের কয়েকদিন পর জমিতে বা টবে সার প্রয়োগ করতে হবে।

রোপ বাংলাই ব্যবস্থাপনা

বেলি ফুল গাছে ক্ষতিকারক কীট তেমন দেখা যায় না। তবে হাকমজুর আক্রমণ হতে পারে। এদের আক্রমণে পাতায় সাদা অস্থলপ পড়ে, আক্রান্ত পাতাগুলো কঁকড়ে যায় ও গোলা হয়ে পাকিয়ে যায়। পঙ্কক ঝঁড়া বা পঙ্কক ঘটিত মাকড়সাশক যেমন- সালটাক, কেলথেন ইত্যাদি পাতার ছিটিয়ে হাকড় দমন করা যায়।

বেলি ফুলের পাতায় হলধে কর্ণের ছিটে ছিটে মাগপুজ এক প্রকার ছত্রাক রোগ দেখা যায়। ট্রেসেল-২ প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফলন

কেতুময়ি থেকে ফুলাই পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে। ফলন জমি বছর বাড়়ে। কতালো বেলিতে ফলন আরও বেশি হয়। সাধারণত ৫-৬ বছর পর গাছ কেটে কেসে নতুন চারা লাগানো হয়।

কম্ব: “গোলাপ ও বেলি ফুলের চাষ করে বেকারত্ব দূর করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব”-এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিক্রিয়া তৈরি করে লেখা লিখে।

কলের চাষ

বাংলাদেশে নানা ধরনের কলা জন্মায়। এ দেশের মাটি ও আবহাওয়া কলা চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। আমরা কলা ও আনারস চাষ সম্পর্কে জানব।

কলা চাষ

কলা বাংলাদেশের সব জেলায়ই কম বেশি জন্মে। করে নরসিংদী, দুর্নীপাড়া, বকড়া, যশোর, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ এদের জেলায় কলার ব্যাপক চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় যা থেকে বছরে ছয় লক্ষমিক টন কলা পাওয়া যায়। কলা জিটামিন ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। অন্যান্য কসদের তুলনায় কলায় ক্যালসিয়াম পরিমাণও বেশি। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কলার চাষ হয়ে থাকে। কলা কীচা অবস্থায় ভরকরি হিসাবে এবং পাকা অবস্থায় কল হিসাবে কলা খাওয়া হয়। রোগীর পথ্য হিসাবে কলায় ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

কলার জাত

যদিচ্ছিতভাবে বাংলাদেশে বেসব কলার জাত চাষ করা হয় সেগুলো হচ্ছে অমৃতনাগর, সবুজি, চাপা, মেহেরশাফর, করবী ইত্যাদি। এ ছাড়াও কলার আরও অনেক জাত আছে যেমন। এঁটে কলা, বাঁড়লা কলা, জাহাজি কলা, কাঠকলা বা আলাজি কলা ইত্যাদি। করে যারি কলা-১, যারিকলা-২ ও যারিকলা-৩ নামে তিনটি উন্নত জাত চাষের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে যারিকলা-২ জাতটি কাঁচকলার।

কলার উৎপাদন প্রযুক্তি। কলা উৎপাদন প্রযুক্তিগুলো হচ্ছে মাটি ও জমি তৈরি, রোপণের সময় ও চারা রোপণ, সার প্রয়োগ পদ্ধতি, অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ইত্যাদি।

মাটি ও জমি তৈরি

উর্বর দোআঁশ মাটি কলা চাষের জন্য ভালো। জমিতে প্রচুর সূর্যের আলো পড়বে এবং পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকবে। পল্লীরভাবে জমি চাষ করে দুই মিটার দূরে দূরে ৫০ সেমি × ৫০ সেমি × ৫০ সেমি আকারের গর্ত খুঁড়তে হবে। চারা রোপণের প্রায় একমাস আগে গর্ত করে গর্তে গোবর ও টিএনপি সার মজির সাথে মিশিয়ে গর্ত পূর্ণ করতে হবে।

চারা রোপণের সময়

বছরে তিন মৌসুমে কলার চারা করা হয় বা কলার চারা রোপণ করা হয় বধা :

১। অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি ২। মার্চ-মে ৩। জুন-সেপ্টেম্বর

কলার চারা নির্বাচন

কলার চারাকে তেউড়ি বলা হয়।

দুই ধরনের তেউড়ি দেখা যায়। বধা :

১। অসি তেউড়ি (Sword Sucker)

২। পানি তেউড়ি (Water Sucker)

১। অসি তেউড়ি : কলা চাষের জন্য অসি তেউড়ি উত্তম। অসি তেউড়ির পাতা সরু, সুচালো এবং অনেকটা তলোয়ারের মতো। গোড়ার দিকে যেটা এক ত্রৈলোক্য উপরের দিকে সরু হয়ে থাকে।

২। পানি তেউড়ি : পানি তেউড়ি দুর্বল। এর আগা-গোড়া সমান থাকে। কলা চাষের জন্য এই চারা উপযুক্ত নয়। এ দুই ধরনের চারা ছাড়াও সম্পূর্ণ মূলগ্রন্থি বা তার খুলে অংশ থেকেও কলা গাছের সংশ্লেষিতার সম্ভব। তবে এতে কলা আসতে কিছু বেশি সময় লাগে। কলার ও অকলার দুই ধরনের গাছেরই মূলগ্রন্থি চারা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।



চিত্র : অসি তেউড়ি কলাগাছ



চিত্র : অসি চারা



চিত্র : পানি চারা



চিত্র : মূলগ্রন্থি

চারা রোপণ

চারা রোপণের জন্য প্রথমত অসি তেউড়ি বা তলোয়ার তেউড়ি নির্বাচন করতে হবে। খাঁটো ভাজের ৩৫-৪৫ সেমি আর লম্বা জাতের ৫০-৬০ সেমি দৈর্ঘ্যের তেউড়ি ব্যবহার করা হয়। অকলার নির্দিষ্ট গর্তে যাতে প্রয়োজনীয় গোবর ও টিএসপি সার দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে সেখানে চারা লাগাতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন চারার কাণ্ড খালের দিকের না হুক।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

কলা পাছে ব্যবহৃত সারের নাম ও গাছ প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো :

সারের নাম	গাছ প্রতি পরিমাণ	প্রয়োগ করার সময়
ইউরিয়া	৫০০-৬৫০ গ্রাম	ভাঙ্গা রোপণের ১ মাস পূর্বে গর্ত করে গোবর/ আর্জনা সার ও ৫০% টি এস পি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। রোপণের ২ মাস পর বাকি ৫০% টি এস পি, ৫০% এমওপি ও ২৫% ইউরিয়া গাছের গোড়ার চারদিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এর ২ মাস পর বাকি ৫০% এমওপি ও ৫০% ইউরিয়া এবং ফুল আসার সময় বাকি ৫০% ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	২৫০-৪০০ গ্রাম	
এমওপি	২৫০-৩০০ গ্রাম	
গোবর/আর্জনা সার	১৫-২০ কেজি	

পরিচর্যা

সেচ ও নিকাপ

কলার জমিতে অর্ন্তিকা বা ধাকলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাপের জন্য প্রয়োজনীয় নলা কেটে দিতে হবে। কলার ফলাপায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে না।

অতিরিক্ত চারা কাটা

ফুল বা মোটা আঙ্গুর পূর্ব পর্যন্ত গাছের পোড়ায় যে ডেউক জন্মাবে তা কেটে ফেলতে হবে। মোটা আঙ্গুর পর পাছের ১টি ডেউক রাখা ভালো।

খুঁটি দেওয়া

কলাপায়ে ছড়া আঙ্গুর পর বাতাসে গাছ ভেঙে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বীশ বা গাছের ডাল দিয়ে খুঁটি বেঁধে দিতে হবে।

শোকনাকড় ব্যবস্থাপনা

কলাপায়ে কলা ও পাতার বিলা পোক, রাইজান উইভিল, ব্রিসপ এসব পোক ধরা আক্রান্ত হতে পারে। অয়োজিনল ৬০ ইসি পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোক দমন করা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

কলা ফল চাষের সময় প্রধানত তিনটি রোগের আক্রমণ দেখা যায়। যথা-

১। পানমা রোগ

২। সিগাটোমা

৩। গছ মাথা রোগ।

১। **পানামা রোগ** : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়। পাতা বেঁটের কাছে ভেঙে তুলে যায় এবং কাণ্ড অনেক সময় ফেটে যায়। আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে মরে যায় অথবা তুল-তুল করে না। রোগের প্রতিকার হিসাবে রোগমুক্ত গাছ লাগাতে হবে, রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে এবং প্রতিরোধী জাত রোপণ করতে হবে। এ ছাড়া টিটি-২৫০ ইপি ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে।



চিত্র : পানামা রোগাক্রান্ত কলাগাছ

২। **সিঞ্চট্রোপা** : এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে পাতার উপর গোলাকার বা ত্রিভুজাকার পাত্ৰ বানামি রঙের দাগ পড়ে। আক্রমণ ব্যাপক হলে পাতা হলুদে বাতুল সমস্ত পাতা আড়ালে পোড়ার মতো দেখায়। ফলে ফল ছোট হয় এবং ফলন কম হয় রোগের প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত গাছের পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।



চিত্র : সিঞ্চট্রোপা রোগাক্রান্ত কলাগাছ

৩। **ভাজ মাথা রোগ** : এটি একটি তাইরাসজনিত রোগ। জাবি পোকের মাথাসে এ রোগ ছড়ায়। ম্যালেশিয়ান বা অন্য যে কোনো অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগে জাবি পোকা মরন করে এ রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।



চিত্র : ভাজ মাথা রোগাক্রান্ত কলাগাছ

কাজ : শিখাঘোঁরা কলার বিভিন্ন রোগের নাম, রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

কলা সজ্জা

১। চারা রোপণের পর ১১-১৫ মাসের মধ্যে সব জাতের কলা সজ্জাহের উপযুক্ত হয়।

২। ধারাসো দাঁ দিয়ে কলার ছড়া কাটতে হবে।

ফলন

ভালোভাবে কলার চাষ করলে গাছপ্রতি গ্রন্থ ২০ কেজি বা প্রতি হেক্টরে গ্রন্থ ২০-৪০ টন কলা উৎপাদিত হবে।

আনারস চাষ

বাংলাদেশে প্রায় ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে আনারস চাষ করা হয়। সিলেট, খৌলসীবাড়ার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং টাঙ্গাইলের যমুপুরে ব্যাপক আনারসের চাষ হয়। ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, দিনাজপুর জেলাতেও প্রচুর আনারস জন্মে। তবে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাতকৃত শাবর (স্লে, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি) তৈরির কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই আনারসের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাণিজ্যিক কলা হিসাবেও আন্তর্জাতিক বাজারে আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ কলা। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি একটি অর্থকরী ফসল। আনারস জরানিশীর্ণ হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ অবদান রাখছে।

আনারসের জাত : বাংলাদেশে আনারসের তিনটি জাত দেখা যায়। যথা : হানিকুইন, জার্নেথ কিউ ও যোক্তাশাল।

আনারসের উৎপাদন প্রযুক্তি : আনারসের প্রযুক্তিকলো নিম্নে ব্যাখ্যাকৃত করা হলো।

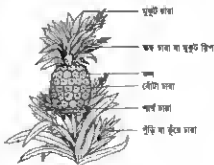
মাটি ও জমি চৈরি

সোরাশ বা বেলে সোরাশ মাটি আনারস উৎপাদনের জন্য ভালো। জমি চাষ ও মই এমনভাবে দিতে হবে যাতে মাটি ফুরফুরা ও সমতল হয় এবং জমিতে বৃষ্টির পানি জমে না থাকে। চারা রোপণের জন্য চাষকৃত জমিতে ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু এবং ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে আর এক বেডের দূরত্ব হবে ৫০-১০০ সেন্টিমিটার। পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষ করতে জল জমি নির্ধারণ করতে হবে যা বেশি খাদ্য হয়। পাহাড়ের ঢালু জমি কোলেক্রসেই চাষ বা কোলাল দিয়ে মাটি আন্দার করা যাবে না, শুধু আগাছা ভালোভাবে পরিষ্কার করে চারা রোপণের উপযোগী করতে হবে।

চারা নির্বাচন ও চৈরি

আনারস পাতের বশেবিকার অসহ্য পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। আনারস পাতের সাধারণত চার ধরনের চারা উৎপন্ন হয় যাঁদেরকে সাকার বা বোঁটকু কলা হয়। সাকার বা বোঁটকুের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।

- কলের মাধ্যম দুই ধরনের চারা উৎপন্ন হয়। কলের মাধ্যম সোজাভাবে যে চারটি উৎপন্ন হয় তাকে মুকুট চারা বলে। আর মুকুট চারার গোড়া থেকে যে চারা বের হয় তাকে অঙ্ক চারা বা মুকুট শ্রিল বলে।
- কলের গোড়া বা বোঁটার উপর থেকে যে চারা বের হয় তাকে বোঁটা চারা বলে।
- বোঁটার নিচের কিন্তু মাটির উপরে কান থেকে যে চারা বের হয় তাকে পার্শ্বচারা বা কাণের কেকড়ি বলে।
- পাতের গোড়া থেকে মাটি জেল করে যে চারা বের হয় তাকে গোড়ার কেকড়ি বা কুঁড়ে চারা বলে। আনারস চাষের জন্য কুঁড়ে চারা ও পার্শ্বচারা সবচেয়ে ভালো।



চিত্র : আনারসের বিভিন্ন ধরনের চারা

চারা রোপণ

মধ্য অর্ধদিন হতে মধ্য অপরাহণ পর্যন্ত এই এক মাস আনারসের চারা রোপণের সঠিক সময়। সেসের ব্যবস্থা থাকলে চারা রোপণের সময় আরও এক / দেড় মাস পিছলো যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সেমি বজায় রেখে চারা রোপণ করতে হবে।

সারি প্রস্থের পদ্ধতি : ১। সারি প্রস্থের পদ্ধতির প্রথম কাজ হলো পরিমাপ নির্ধারণ। আনারসের জন্য পাছ প্রতি নিম্নোক্তভাবে সারি প্রস্থের করতে হবে।

সারির দাম	পাছ প্রতি সারির পরিমাপ (প্রস্থ)
পচা গোবর	২৯০-৩১০
ইউরিয়া	৩০-৩৬
টিএসপি	১০-১৫
এমওপি	২৫-৩৫
জিপসাম	১০-১৫

২। (ক) গোবর, টিএসপি ও জিপসাম বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

(খ) ইউরিয়া ও এমওপি (পটাস) চরার ব্যস ৪-৫ মাস হলে ৫ কিলোতে প্রয়োগ করতে হবে। সারি ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অন্তরীক্ষণীয় পরিচর্যা

ভক্ত মৌসুমে জমিতে সেসের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষাকালে অতিমিত্ত পানি নিকাশের জন্য বালা কেটে দিতে হবে। চারা জন্ম লগ্না হলে ৩০ সেমি বেঁধে আগাছা লাগা সমান করে কেটে দিতে হবে। আনারসের জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। আনারস ফললে ভেতন কোনো অতিকর লোকায়াকড় ও রোগ সহজে আক্রমণ করে না। তাই বালাই ব্যবস্থাপনা আলাদা করা হলো না।

ফল সংগ্রহ

চারার বয়স ১৫/১৬ মাস হলে মাঝ মাস থেকে ঠৈর মাস পর্যন্ত সময়ে আনারসের ফল আসা শুরু করে। জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত সময়ে আনারস থাকে। পাছ থেকে আনারসের বৌমি কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন

এটি হেটের হানিকুইন ২০-২৫ টন এবং জায়েন্ট কিস্ট ৩০-৪০ টন ফলন দিয়ে থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি ফলের বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফল পাছ পরিদর্শন শেষে আনারস চার পদ্ধতির খাপছলো দলীয়ভাবে গোলায় লিখে প্রেসিতে উপস্থাপন করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাছ চাষ পদ্ধতি

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন- খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ডোবা-নালায় শিং, মাঙর, পাবনা ও টেঁরা মাছ এক সময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এরা আংশবিশীল ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ। নিলুইডারমিস বর্ণের অন্তর্ভুক্ত মাছ মাছের শরীরে খাঁশ নেই এবং ঘুমে বিড়ালের ন্যায় লম্বা পৌক বা উঁক আছে ভাস্কের ক্যাটফিশ বলে। প্রাকৃতিক জলাশয় পরিবেশে বিপর্বার ও অত্যধিক আহরণের কারণে বর্তমানে এসব মাছের প্রাপ্যতা অনেক কমে গেছে। চাষের মাধ্যমে এদের তাহিলা পূরণ করা সম্ভব। শিং ও মাঙর মাছের চাষ পদ্ধতি প্রায় একই রকম। আবার টেঁরা ও পাবনার চাষ পদ্ধতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের দেশে কয়েক ধরনের টেঁরা মাছ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ওলশা টেঁরার পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি উল্লেখিত হয়েছে। নিচে শিং, মাঙর, পাবনা ও ওলশা টেঁরার চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক) শিং ও মাঙর মাছ চাষ পদ্ধতি

শিং ও মাঙর মাছের পরিচিতি

শিং ও মাঙর মাছের লৈনিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছুটা মিল রয়েছে। এদের দেহ লম্বাটে, সামনের মিক মলাকার, পিছনের মিক চ্যাপ্টা ও খাঁশ বিহীন এবং মস্তকে উপর মিক চ্যাপ্টা। ঘুমে চার জোড়া শুক ও মাথার দুই পাশে দুইটি ঝাঁটা আছে। কিছু শিং মাছ মাঙর মাছের চেয়ে আকারে ছোট হয় এবং মাথা তুলনামূলক সরু হয়। শিং মাছের পার্শ্বের কটা দুইটি বিস্তৃত হয়। এজন্য শিং মাছের কটা থেকে আফ্রিকার ছাগে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব হয়। শিং মাছের দেহের তল ছোট অবস্থায় বাদামি লাল এবং বড় অবস্থায় ধূসর কালচে। অন্যদিকে মাঙরের দেহের তল ছোট অবস্থায় বাদামি হয়েছি ও বড় হলে ধূসর বাদামি হয়। শিং ও মাঙর মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তুলকা ছাড়ান এদের অভিনবিক স্বস্নেহের আছে বার মাছকে এরা বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন নিতে পারে। কলে এরা অল্প অক্সিজেনে সুস্থ পানিতে বা পানি ছাড়াও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে। এজন্য শিং ও মাঙর মাছকে সিল্প মাছ করা হয়। শিং ও মাঙর মাছ সর্বভুক জাতীয় মাছ। এরা জলাশয়ের তলদেশে থাকে এবং সেখানেকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও পাতা জৈব আবর্জনা খায়। এরা বছরে ১ বার প্রজনন করে থাকে। এদের প্রজনন কাল হচ্ছে মে থেকে সেপ্টেম্বর। তবে জুন-জুলাই মাসে এদের সর্বোচ্চ প্রজনন হয়ে থাকে।



চিত্র- শিং মাছ



চিত্র- মাঙর মাছ

শিং ও মাছের চাষের সুবিধা

বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাই এ ব্যয় চাষে অধিক মুনাফা লাভ করা যায়। চাষ পদ্ধতি সহজ। যে কোনো ধরনের জলাশয়ে এমনকি চৌবাচ্চা ও বাঁচাতেও চাষ করা যায়। প্রতিকূল পরিবেশে যেমন-অগ্নিভেদে বন্যতা, পাখির অত্যধিক তাপমাত্রা, এমনকি পচা পানিতেও এরা বেঁচে থাকে। অল্প পানিতে ও অধিক ফলদে চাষ করা যায়। রোগবশতই খুব কম হয় ও অধিক সহনশীল। অল্প পানিতে এমনকি পানি ছাড়াও এরা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে বলে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়। সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে অল্প সময়েই (৬-৮ মাস) বাজারজাত করার উপযোগী হয়। একক মাত্র চাষ ছাড়াও অন্যান্য কার্প মাছ, তেলাপিন্ডা ইত্যাদি মাছের সাথে পুকুরে মিশ্র চাষ করা যায়।

শিং ও মাছের চাষের পুষ্টিগত গুরুত্ব

বহু অনেক প্রজাতির তুলনায় শিং ও মাছের চাষের পুষ্টিগত অনেক বেশি। এসব মাছে শরীরের উপযোগী লৌহ অধিক পরিমাণে আছে। এসব মাছে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি ও তেল কম থাকে। এজন্য সহজে হজম হয়। অসুস্থ ও রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতির জন্য পখা হিসাবে এসব মাছ সমাদৃত। শিং ও মাছের মাছ রক্ত বৃদ্ধি রাখে ও কল বর্ধনে সহায়তা করে।

চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি

শিং ও মাছের চাষ চাষের জন্য পুকুর ১-১.৫ মিটার গভীর হওয়া দরকার। পুকুরের আয়তন ১০ শতক থেকে ৩০ শতক হলে ভালো হয়। চাষের জন্য নির্বাচিত পুকুরটির পাড় জমার থাকলে তা মেরামত করতে হবে। পুকুরে কুঠিখানা সহ অন্যান্য জলজ অপাধ্যা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। পাড়ে বহু পাইপলা থাকা উচিত নয়। পুকুরে কাকুলে ও অপর্যায়িততার ব্যয় থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুর শুকিয়ে, ব্যয় ব্যয় জাল টেনে বা পুকুরের পানিতে রোটেনন প্রয়োগ করে তা অল্প যায়। স্বীকৃতিতে বহন পুকুরের পানি অনেক কমে যায় তখন পুকুর শুকিয়ে ফেলে পুকুর প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করতে ভালো হয়। পুকুর শুকানো হলে তদায় মুন, গোবর বা হাঁসমুরগির মিঠা, ইকট্রিডা, টিএসপি সার প্রভিন্দ্রকে নির্ধারিত হারে বর্ষায্য নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে যদি পানি থাকে তাহলে পানিকেই মুন ও সার প্রয়োগ করতে হবে।

নেটের বেটী/বেড়া নির্বাচন

শিং ও মাছের চাষ চাষে পুকুর প্রস্তুতির সমস্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পুকুরের চারদিকে পাড়ের উপর অন্তত ৩০ সেমি উঁচু করে নেটের বেটী বা বেড়া নির্মাণ করা। বেটী নেওয়ার সুবিধা হচ্ছে এতে করে বৃষ্টির সময় মাছ পুকুরের বাইরে চলে যেতে পারে না। বিশেষক মাছের বাছকে সাধারণ বৃষ্টি বা বন্যা হলে প্রায়ই 'হেটে' (গড়িতে) পুকুর থেকে বাইরে যেতে দেখা যায়। অন্যদিকে বেটী নেওয়ার কালে মাছের শুষ্ক যেমন-সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি পুকুরে প্রবেশ করতে পারে না। নইলনের নেট গুটির সাথে বেঁধে পাড়ের চারদিকে ঘিরে দিতে হবে। নেটের নিম্নের দিক অটম ভিতর কিছুটা ঢুকিয়ে আটকে দিতে হবে ফেন মাটি ও নেটের মাঝে কীজ না থাকে। পুকুর শুকানো হলে শুকানোর পর শরই এ কাজ করতে হবে। কারণ শুকানো অবস্থায় পুকুরে কোনো ক্ষতিকর প্রাণী যেমন-ব্যাঙ, সাপ থাকে না। পানি থাকা অবস্থায় পুকুরে এসব প্রাণী থাকে বিধায় তখন বেটী দিলে এরাও পুকুরে আসিগা পড়ে যায়। সেজেকের ভিতরে সেগুলোকে মারার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন- কোচ দিয়ে বা বিব টোল দিয়ে।



চিত্র. মাছের মাছের পুকুরে খেঁচের খেঁচ

পোনা মছল

পুকুর প্রস্তুতির ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রতি শতাংশে ১৫০-২০০ টি মাছের মাছের পোনা মছল করতে হবে। শিং মাছ বেছে নেওয়া থাকবে যেটা তাই এ মাছ কিছু বেশি বেচন- ৩০০-৪০০টি পর্যন্ত মছল করা খেঁচ পায়ে। শতকে ৩-৪টি সিলভার কার্পের পোনা ছাড়া খেঁচ পায়ে যা পুকুরে উৎপাদিত অতিরিক্ত কাইটোপ্রাক্টেস থেকে পরিবেশ ভালো রাখবে। পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকলে শতকে মাছের পোনা ২৫০-৩০০টি এবং শিং মাছের পোনা ৪০০-৫০০টি মছল করা চাবে। কার্প বা দুই আকীর মাছের সাথে শিং/মাছের এর মিশ্রণ করতে চাইলে শতকে শিং/মাছের এর পোনা ৫০টি এবং দুই আকীর মাছের পোনা ৪০টি মছল করা যায়। পোনা ছাড়ার আদর্শ সময় হচ্ছে সকাল বা বিকাল (চোখ মাছের ওজার)। দুপুরে রোদে বা মেঘলা দিনে পোনা মছল করা উচিত নয়। পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে পানি বা লবণ পরিবেশে পোনা শেখন ও পুকুরের পানিতে বাপ বহিয়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কে কৃষি উপকরণ অধ্যায়ে ২য় পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তারিত জানেছি।

মছল পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

১. খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মাছের ও শিং মাছ চাবে যত্নে সম্পূর্ণ খাবার সরবরাহ করতে হবে। সিতে মাছের সম্পূর্ণ খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ও এতদসহ মিশ্রণের হার সেওয়া হলো-

শিং ও মাছের সম্পূর্ণ খাদ্য তৈরির উপাদান ও মিশ্রণ হার

খাদ্য উপাদান	লবন মিশ্রণ হার (%)
কিশকিল	২০
ভুগিরি শাক্তি কুড়ি ও হাড় চূর্ণ (মিট ও সেসে মিল)	
সরিষার পৈল	২০
চালের চূড়া	৩০
গমের কুসি	১২
আটা/জিরা	৫
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	১ গ্রাম/কেজি
সয়াবিন চূর্ণ	৮
চুড়া চূর্ণ	৫

শিং/মাড়র মাছের দৈনিক ওজননের সাথে খাদ্য গ্রহণের মাত্রা নিচে দেওয়া হলো-

মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
১-৩	১৫-২০
৪-১০	১২-১৫
১১-৪০	৮-১০
৪১-১০০	৫-৭
> ১০০	৩-৫

খাবার গ্রহণের পদ্ধতি: প্রতিদিনের খাবার ২ ভাগ করে দিনে ২ বার (সকাল ও বিকালে) দিতে হবে। খাবার অল্প পরিমাণে মিশিয়ে ছোট ছোট বল করে পুকুরের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে পানির নিচে ছুপিত ট্রেতে দেওয়া হবে। খাদ্য গ্রহণের ২৪ ঘণ্টা পূর্বেরি সন্ধ্যার তৈল পানিতে তিজিরে রাখতে হবে। বাজার থেকে কেনা ঘাসজাত খাবারও মাছকে প্রদান করা যায়। এতে কৈরিকৃত খাদ্যের চেয়ে দাম কিছুটা বেশি পড়তে পারে।

২. মাছ ব্যবস্থাপনা

চাষকালীন মাছ নিয়মিত বন্ধুকে কিনা এবং বড় যোগাযোগ হচ্ছে কিনা জাল টেনে মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করতে হবে। শিং ও মাড়র মাছে সাধারণত কোনো রোগ হয় না। তবে মাঝে মাঝে শীতকালে ক্ষত রোগ, সেজ ও পাখনা পড়া রোগ এবং পেট ফেলা রোগ দেখা যায়। নিচে এসের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দেওয়া হলো:

ক্ষত রোগ: সুস্থতা। এ্যাক্টোমাইসিস ইন্ফার্ডেল নামক একধরনের ছত্রাকের আক্রমণ এ রোগ হয়। এতে মাংশেপনিকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পুকুরে ১-১.৫ মিটার পানির পরীক্ষা-৪ সতকে ১ কেজি হারে মূল ও ১ কেজি লবণ প্রয়োগ করলে আক্রান্ত মাছগুলো ২ সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। অগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে শীতের শুরুতে একই হারে পুকুরে মূল ও লবণ প্রয়োগ করলে শীতকালে এ রোগ থেকে মুক্ত থাকে মাছ।

সেজ বা পাখনা পড়া রোগ: এ্যারোমোনাডস ও মিস্টোব্যাকটেরি জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। প্রতি মিটার পানিতে ৫ লিটারাম পটাসিয়াম পারমেনগেট মিশ্রিত করে অক্রান্ত মাছকে ৩-৫ মিহিটি গোপল করাতে হবে। পুকুরে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। প্রতি শতক পুকুরে ১ কেজি হারে মূল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পেট ফেলা রোগ: এটি একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। এ রোগ হলে মাছের পেট ফুলে যায়। মাছ তারপাখাধীন ভাবে চলচল করে ও পরিশেষে মৃত্যু ঘটে। অক্রান্ত মাছের পেট হতে ঘাসি গিবিও দিয়ে পানি বের করে দিতে হবে। প্রতি কেজি খাবারের সাথে ২০০ মি গ্রাম ক্রোমিয়ামকেনিকল পাউডার মিশিয়ে সরবরাহ করতে হবে। অক্রান্ত পুকুরে প্রতি শতকে ১ কেজি হারে মূল প্রয়োগ করা যায়।

মাছ আহরণ

সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে ৭-১০ মাসে শিং ও মাড়র মাছ বাজারজাতকরণের উপযোঁগী হয়। উক্ত সময়ে শিং মাছ গড়ে ১০০-১২৫ গ্রাম ও মাড়র মাছ ১২০-১৪০ গ্রাম হয়ে থাকে। পুকুরে জাল টেনে বেশির ভাগ মাছ ধরতে হবে। সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করতে হলে পুকুর চকিরে কেনতে হবে।

কাজ : শিকারীরা দলগতভাবে এক একর একটি পুকুরে শিহ/হাতুর চাষের সন্ধ্যা উৎপাদন ও আয়বাহের হিসাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাতার লিখে রাখা নিবে।

খ) পাবনা ও তলশা মাছের চাষ পদ্ধতি

পাবনা ও তলশা মাছের পরিচিতি

বিস, হাতুর, নদী, পুকুর এবং লিখিত পাবনা ও তলশা মাছ পাওয়া যায়। পাবনা ও তলশা মাছ থেকে অত্যন্ত সুস্বাদু। এ কারণে এদের জাহিয়া ও বাজার মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। পাবনা মাছ ১৫-৩০ সেমি লম্বা হয়ে থাকে। দেহ চ্যাপ্টা ও সাহনের লিকের চেয়ে পেছনের লিক ত্র্যাপত্ত সত্ত্ব। এ মাছের মুখ বেশ বড় ও ঝাঁকানো। নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে বড় মুখের সম্মুখের লিকে দুইজোড়া লম্বা পৌক আছে। পুষ্ঠ পাখনা ছোট। পায়ু পাখনা বেশ লম্বা ও লোভ দুই ভাগে বিভক্ত। দেহের বং সাধারণত উপরিভাগে খুনের তুলসি ও পেটের লিক সাধা। হাতুরের কংহে কংহকের পিছনে কলো কেঁটা আছে। শিরদাঁড়া রেখার উপরিভাগে হলুদাভ তোরো সেবতে পাওয়া যায়। পাবনা মাছ যে থেকে আশপট হাস পর্যন্ত প্রজনন করে থাকে। জুন-জুলাই মাসে সর্বোত্তম প্রজনন সম্পন্ন হয়।

তলশা মাছের সৈর্য ১৫-২০ সেমি হয়ে থাকে। হাতুরের দেহ পার্শ্বীয় ভাবে স্পা। পিঠের অংশ ঝাঁকানো। মুখ বেশ ছোট, উপরের চোয়াল সামান্য বড়। মুখে ৫ জোড়া পৌক বা ঠিক আছে। পুষ্ঠ ও কানকো পাখনা লম্বা ঝাঁটা মুক্ত। শরীরের বং তলশাই খুনের, নিচের লিক কিছুটা হালকা। শিরদাঁড়া রেখা বরাবর লীলাভ তোরো দেখা যায়। এরা বছরে একবার ডিম দেয়। তলশা মাছের প্রজননকাল জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। জুলাই-অগস্ট মাসে সর্বোত্তম প্রজনন করে থাকে।



চিত্র : তলশা



চিত্র : পাবনা

পাবনা ও তলশা মাছ চাষের কনুত

১. বাজারে প্রচুর জাহিয়া রয়েছে এবং সূচ্য অন্যান্য মাছের তুলনায় বেশি। তাই এদের চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি সম্ভব।
২. এদের দেহে প্রচুর পরিমাণে আমিষ ও হাইড্রোনিট্রোজেন বিন্যাসন থাকে।
৩. যেতে খুবই সুস্বাদু।
৪. চাষ পদ্ধতি সহজ।
৫. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা যায়। কলে সহজে পোনা পাওয়া সম্ভব।
৬. বার্ষিক পুকুর ছাড়াও বৌসুনি পুকুর ও অন্যান্য অগভীর জলাশয়েও চাষ করা যায়।
৭. দ্রুত বর্ধনশীল ৫-৬ মাসেই বিপণনযোগ্য হয়।

চাষের জন্য পুকুর নির্মাণ

সামান্যত ১৫-২০ শব্বৎশের পুকুর যেখানে ৭-৮ হাল পানি থাকে এমন পুকুরে এ মাস দুইবার চাষ করা যায়। পুকুরে পানির গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভালো।

পুকুর এরতি

পুকুরের শাক দেয়ারমত ও জলজ জাপাচা পরিষ্কার করে দিতে হবে। পাতে বড় লাহপালা থাকা উচিত নয়। থাকলে তা ছোট্টে দিতে হবে যেন পুকুরে শাকা ও ছায়া না পড়ে। পুকুরে রাকুলে ও ক্ষত্রয়োজনীয় মাহ থাকলে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর পুকুরে শব্বৎশপ্রতি ১ কেজি ছারে চুন এরোগ্য করতে হবে। চুন এরোগ্যের ৪-৭ দিন পর পুকুরে প্রতি শব্বৎশ ৬-৮ কেজি ছারে গোবর, ১০০ গ্রাম ইটরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি এরোগ্য করতে হবে।

শোলা মছল

সার এরোগ্যের ৩-৪ দিন পর ৩-৫ হ'ম বজনের শোলা শব্বৎশ প্রতি ২৫০ টি ছারে মছল করা যেতে পারে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠান্ডা আরম্ভতহার পুকুরে শোলা ছাড়া উচিত। শোলার ছাটার সাথে সাথে নেভলো সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। শোলা ছাড়ার পূর্বে পটীশ বা লবণ পানিতে শোষণ করে দিতে হবে এবং শোলকে পুকুরের পানির সাথে বাপ খাইয়ে দিতে হবে।

ভালো। মশপত্বেবে পংখ্য ও গুলশা মাহ চাষের আর-ব্যয়ের একটি হিসাব তৈরি কর ও প্রেসিতে উপস্থাপন কর।

বাধ্য এরোগ্য

পাক্য ও গুলশা মাহের সম্পূরক বাধ্য তৈরির উপপাঠন ও মিশ্রণ হার:

বাধ্য উপাদান	মিশ্রণ হার (%)	বাধ্য এরোগ্য পদ্ধতি
কিশমিলা	৩০	২-৩ টি ছুরত প্রৈক করে প্রতিদিন দেহ ওজনের শব্বৎশ ৫-৬ ভাগ ছারে বৈদিক ২ বার (সকালে ও বিকালে) এরোগ্য করতে হবে।
মিট ও বোন মিল	১০	
সরিয়ান বৈল	১৫	
সরিয়ান বৈল	২০	
চাষের কুঁড়া	২০	
ম্যাটা	৪	
জিউমিল ও খনিজ লবণ মিশ্রণ	১	

সার এরোগ্য

সম্পূরক বাধ্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বাঁবার তৈরি হওয়ার জন্য ৭-১৫ দিন পর শব্বৎশপ্রতি ৪-৫ কেজি ছারে পচা গোবর, ক্রোড্রাক্স দিলে চলিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনা

মাহ নিয়মিত খাবার খায় কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে। ট্রেডে খাবার সেওয়ার আগে পূর্ববর্তী দিনের খাবার সম্পূর্ণ খেয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যে পরিমাণ খাদ্য থেকে বাবে তার সমপরিমাণ খাদ্য কম সরবরাহ করতে হবে। প্রতি মাসে ২ খার জাল টোনে দৈনিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। সন্ধ্যাবে একবার পুকুরে হররা টানতে হবে। পুকুরে পানি কমে গেলে বাইরে থেকে পানি সরবরাহ করতে হবে। পানির স্বচ্ছতা (সেডিমেন্ট গট্টরডা) ২৫ সেমি বাবে থাকলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

মাহ আচরণ

গুলশা মাহ ৬ মাসে ৪০-৪৫ গ্রাম এবং পাবলা মাহ ৭-৮ মাসের মধ্যে ৩০-৩৫ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। এই আকারের পাবলা মাহে বেড় জাল দিয়ে ও গুলশা মাহ পুকুর ঢাকিয়ে অহরণ করা মাহ।

নতুন শব্দ : জিওল মাহ, এ্যাকোসোমাইসিস ইনজারেস, মাইক্রোলিটোট্রফ

মাহ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কাজের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সামাজিক উন্নয়নে মাহ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। যিহে মাহ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

১. পুষ্টির চাহিদা পূরণ : আমাদের প্রতিদিনের খাবার অলিকার্ন আমিষের প্রধান উৎস হচ্ছে মাহ। এটি একটি সুবাসু ও পুষ্টিগত খাবার। আম হলের প্রতিদিনের খাদ্য অলিকার্ন প্রায় ৬০% আমিষের বোণাম সেহ মাহ। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক ৮০ গ্রাম আমিষ জাতীয় খাবারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা গড়ে মাত্র ৬০ গ্রাম আমিষ খেতে থাকি। মাহ চাষের মাধ্যমে আমিষের চাহিদা মেটানো সম্ভব। তাই মাহ চাষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া মাছের তেল সেহের জন্য উপকারী। বিভিন্ন জাতের ছোট মাহ যেমন- ঘসা, দেয়া, কাচকি মাছে প্রচুর ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। ভিটামিন 'এ' রাসকলা রোগ দূর করে। মাছের কাঁচা প্রচুর ক্যালসিয়াম ও কসমরাস পাওয়া যায় যা সেহের হৃৎ পর্বে সাহায্য করে।

২. কাজের সুযোগ সৃষ্টি : বাংলাদেশে ছোট জনসংখ্যার প্রায় ১১% বা অধিক প্রায় ১৬৫ লক্ষ লোক মৎস্য সেইর থেকে বিভিন্ন কাজে জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন- মাহ চাষ, মাহ বরা, মিকর ইত্যাদি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কালে আমাদের সেলে কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে। মাহ চাষের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

৩. রপ্তানি আর বৃদ্ধি : মাহ বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। সেলে রপ্তানি আয়ের ২.৪৬% আসে মৎস্য খাত হতে। মাহ চাষ বৃদ্ধি করে এ আয় আরও বাড়ানো সম্ভব।

৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : বাংলাদেশে অনেক শক্তিক পুকুর, ভোরা ও নলা রয়েছে যেখানে মাহ চাষ করা হয় না। এসব জলাশয়ে মাহ চাষ করে গ্রামের শক্তিক ও স্বল্প আয়ের লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি

সমন্বিত চাষের ধারণা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের গ্রামের গ্রাম বাড়িতেই হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন করা হয়। আবার সে সাথে অনেকের বাড়িতে রয়েছে পুকুর যেটি খেয়াসেঁচা, কান্নাবাজা, গোলাপ ইত্যাদি পুষ্পগুলির কাজে ব্যবহৃত হয়। সনাতন পদ্ধতিতে এই সব পুকুরে মাছও পালন করা হয়। এসব হাঁস-মুরগি, মাছ পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সুলভিমা রাখে। পুকুরের উপর ফল করে যদি হাঁস-মুরগি রাখা যায় তবে এদের জন্য অতিরিক্ত জয়গার দরকার হয় না। আবার পুকুর পেরে ও হাঁস-মুরগির বিটা পুকুরে সাহায্যে ব্যবহার করা যায়। সেইসাথে হাঁস-মুরগির উচ্ছ্রিষ্ট খাদ্য পুকুরে ফেলে দিলে তা মাছের সম্পূর্ণ খাদ্যের যোগান দেয়। অবশেষে পুকুরের পাড়ে কলা-শুশ এবং শাকসবজির চাষও করা যায় যেখানে পুকুরের তলার অতিরিক্ত খাদ্য (পচা জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ) সাহায্যে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে ফলশুশ ও শাকসবজির অগ্রাংশাদি কম্পোস্ট সাহায্যে হিসাবে পুকুরে ব্যবহার করা হয়। আবার কৃষকের খাদ্যের অধিকার যে কয়েকমাস পানি থাকে সে সময়ে খাদ্যের পাশাপাশি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মাছের বিটা ক্ষেতের উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই মাছ খাদ্যের কৃষিকারক পোকাফোঁকড় খেয়ে ফেলে এবং খেয়েও চলাচল করিতে আশ্রয় অনুভব করে থাকে। এভাবে যখন একই অধিকার একই সময়ে একমুখ কলস উৎপাদন করা হয় তাকে সমন্বিত চাষ বলে। সমন্বিত চাষে যখন মাছের সাথে অন্য কলসের চাষ করা হয় তখন তাকে সমন্বিত মাছ চাষ বলে।

সমন্বিত চাষের ভাব

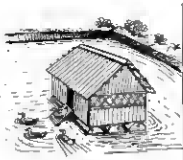
একই জমিতে একই সময়ে অল্প বরফে একমুখ কলস পাওয়া যায়। কলস বাড়তি খাদ্য উৎপাদিত হয়। একই কলস অপর কলসের সাহায্যে হিসাবে কাজ করে। পরিবেশের ভালোমাত্রা বজায় থাকে। সাহায্যের পরে কমে। প্রচুর খাদ্যব্যব ব্যবহার নিশ্চিত হয় (একটি কলসের জন্য যে প্রায় প্রয়োজন, সেই একই প্রমে একমুখ কলস উৎপাদিত হয়)। সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয় ও অপচয় হ্রাস হয়। বৃষ্টি কম থাকে অথবা কোনো কারণে একটি কলসের উৎপাদন ব্যাহত হলে অন্য উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে সে ক্ষতি অনেকটা পূরণে যেওয়া যায়।

নিচে আমরা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি (সমন্বিত মাছ-হাঁস/মুরগি চাষ এবং ধানক্ষেতে মাছ ও গবাদি চিহ্নিত চাষ) সম্পর্কে জানব।

ক) সমন্বিত মাছ ও হাঁস/মুরগি চাষ

মাছ ও হাঁস মুরগির সমন্বিত চাষের সুবিধা

১. পুকুরের উপর হাঁস/মুরগির পর তৈরি করা হয় বলে আলোয় জায়গার প্রয়োজন হয় না। ২. হাঁস/মুরগির বিটা সরাসরি পুকুরে পড়ে বা মাছ চাষের জন্য উৎকৃষ্ট জৈব সাহায্য, এই পদ্ধতিতে পুকুরে বাইরে থেকে কোনো সাহায্যের দরকার নেই। ৩. হাঁস/মুরগির উচ্ছ্রিষ্ট খাদ্য সরাসরি পুকুরে পড়ে বা মাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ফলে মাছের জন্য খাদ্যাদি কোনো সম্পূর্ণক খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ৪. হাঁস পুকুরের পোকাফোঁকড় ও ব্যাঙগুলি খেয়ে পুকুরের পরিবেশ ভালো রাখে। ৫. হাঁস পুকুরের পানিতে স্নাতক কাটে বলে বাতাস থেকে অক্সিজেন পানিতে বেশে কলস পানিতে অক্সিজেনের সমৃদ্ধ হয় না। ৬. একই জায়গা থেকে মাছ, হাঁস ও গবাদি পাওয়া যায় কলস অধিক খাদ্য উৎপাদন ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।



চিত্র : সমন্বিত মাছ ও হাঁস চাষ



চিত্র : সমন্বিত মাছ ও মুরগি চাষ

পুকুর নির্মাণ ও প্রক্রিয়া : পূর্ব হেঁচি আকারের পুকুর সমন্বিত মাছ ও হাঁস/মুরগি চাষের জন্য জেগুন উপযোগী নয়। পুকুরের আয়তন সুলভতম ৩০ লকত হলে ভালো হয়। বছরে কমপক্ষে ৮-১০ মাস ১.২ থেকে ১.৬ মিটার (৪-৬ ফুট) পানি থাকতে এখন পুকুর নির্মাণ করতে হবে। এরপর যথাযথ নিয়মে মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হবে। তবে সমন্বিত হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষে পুকুর প্রকৃতিকালীন সময়ে সারি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। চুন লেজনার পানি পর পুকুরের উপর বালিশো ঘেঁষে হাঁস/মুরগির বাচ্চা মজুল করতে হবে। হাঁস/মুরগির বাচ্চা মজুলের ৭-১০ দিন পর পুকুরে মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

হাঁস-মুরগির ঘর নির্মাণ : ঘরত কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বাঁশ, কাঠ ও চুন দিয়ে এক ঢালা বা পো-ঢালা ঘর তৈরি করা যায়। ঘরটি পাক থেকে ১.২ থেকে ১.৫ মিটার (৪-৫ ফুট) ভিতরে পানির উপর হবে যেন শুকনো হৌঁসুমে পানি কমে গেলেও বিট্টা ও উজ্জিষ্ট বাল্য মাটিতে না পড়ে পানিতে পড়ে। পানিত উপরিচাপ থেকে ঘরের মেঝের দূরত্ব ০.৪৬-০.৬ মিটার (১.৫-২ ফুট) এবং মেঝে থেকে ঘরের ঢালার উচ্চতা হবে ১.২-১.৫ মিটার (৪-৫ ফুট)। ঘরের ভিতরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের জন্য ঢালা ও ঘরের বেড়ার মাঝের জালের বকো বেড়া বা জাল দিয়ে ঘিরে নিতে হবে। ঘরের মেঝে বাঁশের বাচ্চা দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। এক বাচ্চা থেকে অন্য বাচ্চার দূরত্ব হবে ১ সেমি। এতে করে মুরগির বিট্টা ও উজ্জিষ্ট সরাসরি পানিতে পড়বে কিন্তু মুরগির পা বাচ্চার সাথে চুক অর্থাৎ প্রাপ্ত হবে না। হাঁস/মুরগির ঘর অনেকসময় পুকুরের পাড়েও তৈরি করা হয়।

হাঁস-মুরগির ক্ষেত ও সন্ধ্যা নির্মাণ : প্রতি শতাংশ পুকুরের জন্য উন্নতমানের ২টি হাঁস বা মুরগি ব্রেডলার বা পেয়ার) পালন করা যায়।

হাঁস-মুরগির খাদ্য : বাচ্চা অবস্থার ৯০ দিন পর্যন্ত প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রতিদিন ৬০-৯০ গ্রাম এবং পরবর্তীতে ১১০-১২৫ গ্রাম সুবাস খাদ্য দিতে হবে। হাঁসকে খাদ্য খাওয়ানোর সময় প্রয়োজনমতো পানি বিশিষ্টে দিতে হবে। ব্রাদলার মুরগিকে প্রয়োজন অনুযায়ী সব সময় খাবার প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি পেয়ার মুরগির জন্য ৪ সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮০-৯০ গ্রাম এবং পরবর্তীতে ১১০-১২৫ গ্রাম হারে দৈনিক খাবার প্রদান করতে হবে। খাদ্য ও পানি খাওয়ানোর জন্য পৃথক পৃথক পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

হাঁস-মুরগির রোগবালাই দমন : হাঁস/মুরগির রোগ হতে পারে। রোগ হলে লিকটাই পণ্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য হাঁস-মুরগির ঘর স্বেচ্ছায় শুকনো রাখতে হবে। ঘরের মেঝে

এবং খাদ্য ও পানির পায়া নিয়মিত পরিচার রাখতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত টিকা ও ইনজেকশন দিতে হবে। অসুস্থ হাঁস-মুরগিকে বহুদ্রব্য সত্ত্বর ভালোফলোর কাছ থেকে সরিয়ে ফেলাতে হবে।

মাসের প্রজাতি নির্ধারণ ও বহুদ্রব্য কলঙ্ক : পুঙ্কুর ৮-১২ সেমি আকারের বিভিন্ন কার্পজাতীয় মাসের পোনা শতক প্রতি ৩৫-৪০টি নিম্নলিখিত অনুপাতের ছাড়া যার তার মধ্যে শতক প্রতি কাজলা/বিগহেড ৪টি, সিলতার কার্প ৯টি, বুই ৮টি, দুগেশ ও কর্ণিও ৪টি করে, হাঁস কার্প ১টি এবং স্বর্ণপুটি ৫-১০টি ছাড়তে হবে।

এসকার্প হাঁসজাতীয় খাদ্য খার। তাই পুঙ্কুর পাড়ে জরানো ঘাস, নরম পাড়া, খাদ্য পাড়া ইত্যাদি নিয়মিত পুঙ্কুরে দিলে হবে। অন্য জাতের মাসের জন্য বইয়ে থেকে কোনো খাদ্য সেওয়ার দরকার নেই। পানিতে পড়া হাঁস/মুরগির উচ্চিই খাদ্যই এরা গ্রহণ করবে।

মাস বহুদ্রব্যের যত্ন : প্রতিমাসে একবার আল টেনে বহুদ্রব্য পরীক্ষা করতে হবে। পুঙ্কুরে অজিরেদের অভাব হলে নতুন পানি সরবরাহ বা বাঁশ গিটের বা সাঁতার কেটে পানিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। পুঙ্কুরের কলসে পানি জমা হলে হলো টেনে পুঙ্কুর থেকে পানি লুপ করা যেতে পারে। কত রোগের আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শাঁড়ের তলুকে শতক প্রতি ১ কেজি ছাড়ে মুন প্রয়োগ করা যায়।

উপপাদন : সূত্র ব্যবস্থাপনার সম্বন্ধে মাস ও হাঁস/মুরগির সমন্বিত চাষ করা হলে পুঙ্কুরে কোনো সাব বা খাদ্য প্রয়োগ ছাড়াই শতক প্রতি ১৮ থেকে ২১ কেজি মাস উপপাদন করা যায়। খাকি ক্যান্সারেল বা ইথিয়াল রাসায় জাতের হাঁস বছরে ২৫০-৩০০ টি ডিম দেয়। একটি ব্রুশার মুরগি ২ মাসে প্রায় ১.৫-২ কেজি ওজনবের হয় এবং সেবার মুরগি বছরে ২০০-২৫০ টি ডিম দিয়ে থাকে।

খ) ধানক্ষেতে মাস ও গলদা চিড়ি চাষ

ধান চাষের সময় আসলে জমিতেই লীলিম পানি ধরে রাখার দরকার হয়। এসব ধানক্ষেত একটু পরিকল্পনা মতকি রেঁবি করে দিলে একই জমিতে এক বছরে ধান এবং মাস ও গলদা চিড়ির একাধিক কলস কলসো সম্ভব। বিশেষজ্ঞের মতে বাংলাদেশে বর্তমানে ২.০০ লক্ষ হেক্টর জমি ধানক্ষেতে মাস বা চিড়ি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী বা এখনই ব্যবহার করা যায়। আরও ৩.০ লক্ষ হেক্টর জমির জমি ভবিষ্যতে গলদা ও মাস চাষের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

ধানক্ষেতে মাস ও গলদা চিড়ি চাষের সুবিধা : একই জমিতে অতিরিক্ত কলস হিসাবে মাস ও গলদা চিড়ি উপপাদন হয়। এতে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার হয়। মাস ধানের অধিকতর খীট গভীর ও শোভামায়ুক্ত হয়ে ফেলে। তাই ধানক্ষেতে খীটনাশক ব্যবহারের দরকার হয় না। মাস ও চিড়ির চলাফেরার কারণে ক্ষেতে আগাছা জন্মতে বাধা সৃষ্টি হয়। মাস ও চিড়ির বিটা ফেড়ের উর্বরতা বাড়ানতে সাহায্য করে কলসে সারের খরচ কুলনমূলক কম হয়। গবেষণার দেখা গেছে এ পদ্ধতিতে ধানের কলস গড়ে শতকরা ১৫ জন্য বৃদ্ধি পায়।

জমি নির্ধারণ : যেসব জমিতে কমপক্ষে ৫-৬ মাস পানি ধরে রাখা সম্ভব এবং চাষকারীরা সময়ে ক্ষেতের সব অংশে কমপক্ষে ১২-১৫ সেমি পানি থাকে সেসব জমিতে ধান এবং মাস ও গলদার সমন্বিত চাষ সম্ভব। যে সব জমি উচ্চ অর্ধাং পানি ধরে রাখতে পারে না, অথবা যে সমস্ত জমি বেশি নিচু অর্ধাং সম্বন্ধে প্রাপ্ত হয় এদের কোনোটিই মাস ধানের জন্য উপযোগী নয়।

মাস ও গলদা চাষের জন্য ধানক্ষেত প্রস্তুতকরণ

জমির অধিল তৈরি/মেরামত : জমির অধিল শক্ত, সমতল করে তৈরি বা মেরামত করতে হবে। সাধারণ বন্যার যে পরিমাণ পানি হয় তার চেয়ে ৩০-৬০ সেমি উচ্চ করে অধিল তৈরি করা ভালো। অধিল পর্যাপ্ত চওড়া হতে হবে। এতে অধিল ভাঙাচাঙি নাহলে না ও অধিলে কিছু শাকসবজি চাষ করা যাবে।

ধানক্ষেত্রে জোবা ও নালার বন্টন : মাহ ও চিত্রির অশ্রয় ও চলাচলের সুবিধার জন্য ধান ক্ষেতের আলোর চারপাশে ভিতরের দিকে নালার বন্টন করা হয় অথবা আলোর এক বা দুইপাশে নালার জোবা বন্টন করা হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে ধান ক্ষেতের মাঝখানে বা কেন্দ্রের জোবা বন্টন করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষেতের নালার দুই-ই বন্টন করা হয়। সেক্ষেত্রে জোবার সাথে নালার সংযোগ থাকে। যেটি জমির শতকরা ১৫ ভাগ জায়গা জোবা ও নালার দখলেই চলে। এদের পটভূমি ০.৫-০.৮ মিটার হলে ভালো হয়। জমির চালু বা নিচু অংশে জোবা তৈরি করা হয়।

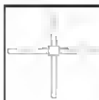
ধানক্ষেত্রে জোবা ও নালার বৈশিষ্ট্য সুবিধা হচ্ছে- (১) ক্ষেতের পানি কমে গেলে বা খুব পরম হয়ে গেলে চিত্রি ও মাহ পর্জ ও নালার অংশক-কৃত পটভূমি ঠাণ্ডা পানিতে অশ্রয় নিতে পারে। (২) আশাচ্য পরিষ্কার বা মাহ খরায় এয়োজন হলে জমির পানি শুকিয়ে মাহ ওনোকে নালার জোবার এনে জা সহজেই করা যায়।

পলদার চিত্রির অশ্রয়স্থল সৃষ্টি : চিত্রির জন্য জোবা বা নালে কৃষির প্রাস্টিক বা ওকনো ককি দিয়ে পলদার অশ্রয়স্থল তৈরি করতে হবে। চিত্রি এখানে কোলস কলসের সমর সামুত অবস্থার অশ্রয় নিতে পারবে।

ধানের জমি তৈরি : জমিতে কালোজারে চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত দিয়ে সপ,পোষক ইত্যাদি প্রয়োগ করে ধান রোপণ করতে হবে।

ধানের জমি নির্বাচন : ধানের সাথে মাহ ও চিত্রি চাষের জন্য বি আর-৩ (বিপ্লব), বি আর-১১ (মুজা), বি আর -১৫ (পারী), বি আর -২ (মলা) ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল ধান নির্বাচন করা উচিত।

ধান রোপণ পদ্ধতি : ধানের চারা সারিবদ্ধভাবে রোপণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি রাখতে হবে। পর পর ৫-৬ সারি লাখানোর পর ৩৫-৪০ সেমি বাকী রাখতে হবে। এতে মাহ ও চিত্রির চলাচলে সুবিধা হয় এবং পানিতে পর্জ ও সূর্যাসেক পড়তে পারে বলে মাহের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হতে পারে।



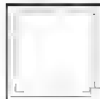
সহজল জমি



দুই দিকে চালু জমি



দুই দিকে চালু জমি



সহজল জমি

চিত্র: ধানক্ষেত্রে জোবা ও নালার বন্টনের কয়েকটি নকশা

হাছের গুণগতির নির্বাচন : যেহেতু খানক্ষেতে খুব বেশি পানি থাকে না তাই কম পানিতে ও কম অগ্নিবেগে বাঁচতে পারে, উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এবং সেইসাথে খান চাষকাপীন সময়ের মধ্যে খাদ্যের উপযোগী হয় একদম হ্রাস বর্ধনশীল হাছ নির্বাচন করতে হবে যেমন- কার্পিত, সরপুটি, তেলশিলা। তবে এগুলোর সাথে অল্পসংখ্যক বুই, কাকলা মেওরা বেতে পারে। আবার হাছের হাছের পোনাও ছাড়া যায়। তবে গ্রাস কার্প ছাড়া বারে না করণ করা খান পাছ খেয়ে কলতে পারে।

পোনা মজুল : খান রোপনের ১০-১৫ দিন পর যখন খান বাছ শক্তভাবে হাটিতে লেগে পারে তখন চিড়ি ও বাছ মজুল করতে হবে। শতাব্দেবর্তি হাছের পোনা ১৫-২০টি ও চিড়ির পোনা ৪০-৫০টি মজুল করা যেতে পারে।

সম্পূর্ণক খাদ্য তৈরি ও গ্রহণ : চালের কুঁড়া, খৈল, ফিশ্রিল ১১১১ অনুপাতে নিয়ে এর সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অটা পানিতে কুটিয়ে অগ্নীতে করে উচ্চ উপকরণগুলোর সাথে মিশিয়ে কই করে ছোট ছোট বল বানিয়ে হাছ ও চিড়িকে সরবরাহ করতে হবে। প্রতিদিন সেহের গরমের ৩-৫% খাবার কিন ভাণ করে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় গ্রহণ করতে হবে।

স্বাস্থ্যশপা : খানের সাথে হাছ চাষ করতে কীটনাশক সেওয়া উচিত নয়। কয়ে কীটনাশক ব্যবহার অত্যাবশ্যক হলে ক্ষেতের পানি কমিয়ে হাছকে জোবা/খালার অটকিয়ে তা করতে হবে। কীটনাশক ব্যবহারের অন্তর ৫ দিন পর সেহ নিয়ে পুনরায় হাছকে সমস্ত জমিতে চলাচলের সুযোগ করে দিতে হবে। ক্ষেতের পানি কমে গেলে হ্রাস সেহের ব্যবস্থা করতে হবে। হাছে রোগ বলাই এর লক্ষণ দেখা দিলে হাছগুলোকে জোবার মধ্যে নিয়ে পত্রক প্রতি ১ কেজি দুই গ্রহণ করতে হবে।

খাল, হাছ ও চিড়ি আচ্ছন্ন : খাল কাটার সময় হলে ক্ষেতের পানি কমিয়ে চিড়ি ও হাছগুলোকে দালা বা জোবার এসে খাল কাটতে হবে। খাল কাটার পরও যদি ক্ষেতের পানি থাকে বা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পরবর্তী কাল শুু কবের পূর্ব পর্যন্ত হাছ চাষ চালিয়ে সেওয়া বেতে পারে।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৃহশালিত পশুপাখি পালন শঙ্কতি

গৃহশালিত পশু আবাসন

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং অধিক উৎপাদনের জন্য অধিকতর আরামদায়ক পরিবেশে পশুকে আগ্রহ প্রদানকে গৃহশালিত পশু আবাসন বলা হয়। পশুকে খাবার, খাওয়ার ও বিশ্রামের জন্য যে আরামদায়ক ঘর তৈরি করে দেওয়া হয় তাকে বাসস্থান বা গোয়াল ঘর বলে। পশু বাসস্থান বা গোয়াল ঘরের অনেক সুবিধা রয়েছে। গোয়াল ঘরে একক বা মলপত্রজাত পশু পালন করলে স্বাস্থ্যপূর্ণ অনেক সহজ হয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে আসে। গোয়াল ঘরে সব সময় পশুকে আবদ্ধ না রেখে থাকে মধ্যে বাইরে ঘুরিয়ে আনা পশু বাছুরের জন্য উত্তম।

আবাসনের উদ্দেশ্য

- ১। আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- ২। পশুকে আশ্রয় ও বিশ্রাম দেওয়ার জন্য।
- ৩। খাবার অবশেষেরা থেকে রক্ষা করা।
- ৪। পোকা-হাফড় ও বর্গ পশুপাখি থেকে রক্ষা করা।
- ৫। চোরের হাত থেকে রক্ষা করা।
- ১১। পশু একক ও শিথিল বন্ধ দেওয়া।
- ১২। সময়মতো চিকিৎসা দেয়া দেওয়া।
- ১৩। সহজে গোয়াল ঘর পরিষ্কার করা।
- ৬। পশুকে শান্ত করা।
- ৭। সর্বমুখী, এসুটি ও বায়ুর সঠিক পরিচর্যা করা।
- ৮। পশু থেকে অধিক দুধ ও আসে উৎপাদন করা।
- ৯। পশুকে সঠিক পুষ্টি সরবরাহ করা।
- ১০। খাদ্য ও পানি সরবরাহ সঠিক ও সহজ করা।
- ১৪। রোগ প্রতিরোধ ও সিরিগ্রন করা।
- ১৫। পোকা ও অন্যান্য বর্গ সিরিগ্রন করা।
- ১৬। উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

পশু আবাসনের স্থান নির্বাচন করা

পশু আবাসনের জন্য স্থান নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থান নির্বাচন সঠিক না হলে খাদ্য লাভজনক করা যায় না। পশু আবাসন স্থান ও পশু সংখ্যার মধ্যে সম্পর্কযুক্ত। গৃহশালিত পশু আবাসন বা বাসস্থান এমন জায়গায় তৈরি করতে হবে, যেখানে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো বিদ্যমান থাকে।

- ১। উঁচু, শুষ্ক ও কল্যাণকর এলাকা হতে হবে।
- ২। খাবার, অগ্নিপ্রস্তুত ও বসতি থেকে একটু দূরে হবে।
- ৩। দুধ ও মাংস বাজারজাত করার সুবিধা থাকতে হবে।
- ৪। জালো বাজারজাত ব্যবস্থা থাকবে।
- ৫। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা থাকতে হবে।
- ৬। গোয়াল ঘর বা খামার এলাকা থেকে সহজে পানি নিষ্কাশন হতে হবে।

৭। পোরাল ঘরে বেন সূর্যালোক পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

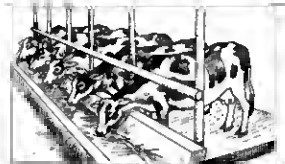
৮। পোরাল ঘরের চার পাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৯। পতর জন্য পান্য ও গানি সরবরাহের ব্যবস্থাটি মনে রাখতে হবে।

১০। অবশ্যই খাবার বড় করার সুযোগ থাকতে হবে।

পশুর আবাসন

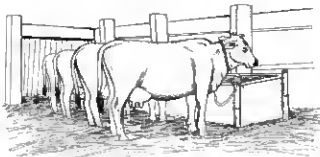
পশুর আবাসনের অনুগ্রহ পদ্ধতি হলো পোশালা বা পোরাল ঘরে বেঁধে পশু পালন করা। পোরাল ঘরের আকার পতর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। পতর সংখ্যা ১০ এর কম হলে ১ সারি বিশিষ্ট ঘর এবং ১০ বা তার অধিক হলে ২ সারি বিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হবে।



চিত্র: পশুর আবাসন

গাভী পালন

কৃষি ও অর্থনীতির সাথে পশু ও গাভী পালন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বলা হচ্ছে থাকে একটি জাতির মেধাও বিকাশ নির্ভর করে মূলত ঐ জাতি কতটুকু দুধ পান করে তার উপর। আজকের বিশ্বে যেখানেই কৃষি বিকাশ লাভ করেছে গাভীর দুধ উৎপাদন ও ব্যবহার সেখানে শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমাদের দেশেও সেটিসুচিকরণে বলা যায় যে গাভী পালন একটি শিল্প হিসাবে পড়ে উঠছে। আমাদের দেশে পাঁচ খরনের উন্নত জাতের গাভী দেখা যায় সেগুলো হলো-হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, পাহিওরাল, সিডি, রোড ডিউপাং প্রভৃতি। এই সমস্ত জাতের গাভীর দুধ উৎপাদনকমতা খেতিমুটি আলো। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পালনপালন ও প্রজনন করলে এদের উৎপাদন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।



চিত্র : বাছকের দুগ্ধদায়ী গাভী

গাভীর পরিচর্যা

গাভীর পরিচর্যার লক্ষ্য হলো গাভী যাতে অধিক কর্মক্ষম থাকে। গাভীর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও দুগ্ধদায়ক কালের পরিচর্যার নিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গাভীকে নিয়মিত পোষণ করানো, শিং কাটা, খুর কাটা ইত্যাদির নিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রসব পরিচর্যা গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং উৎপাদনে ভালো প্রভাব পড়ে। গর্ভকালীন সময়ে গাভীর নিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত কারণ এই সময়ে গাভীর ভিতরের বাতাস বড় হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে গাভীকে প্রচুর পরিমাণে লানাগার জলীয়খাল দিতে হবে। প্রসবকালীন সময়ে এবং প্রসবের কয়েক দিন আগে গাভীকে আশামা জারগায় রেখে পর্ববেক্ষণ করতে হবে। এই গাভীকে সমতল জারগায় রাখতে হবে। গর্ভকালে ও প্রসবকালে গাভীকে সঠিকভাবে খাদ্য ও পরিচর্যা করতে হবে। গর্ভকালীন অবস্থায় করলে বাতাস নষ্ট হয়ে পেলে পারে। কাছাকাছি গাভী প্রজনন ও গর্ভধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। প্রসবের লক্ষণ দেখা গিলেই গাভীকে শাল পরিবেশে রেখে ২-৩ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রসব অসমত না হলে ভেটেরিনারি ডিক্লিনারের পরামর্শ দিতে হবে। প্রসবের পর যত্নরকম অবশ্যই শাল দুধ খাওয়াতে হবে, কারণ এই শাল দুধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সঠিক ভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। বাতাস প্রসবের পর খুল পড়ে গেলে তা সাথে সাথে মাটিতে গুঁতে ফেলতে হবে। গাভী প্রসবের ৫-৭ দিন পর্যন্ত শাল দুধ দেয় এর পরে বাতাসিক দুধ পাওয়া যায়। দুধ সোষনের সময় গাভীকে উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং দুগ্ধতার সাথে সোষনের কাল শেষ করতে হবে। গাভীর বাতাস প্রসবের ১০ দিনের মধ্যে গাভী বরষ না হলে ডাক্তারি পরীক্ষা করে পরামর্শ করতে হবে। গাভী পরিচর্যার আরও একটি লক্ষ্য হচ্ছে, গাভীকে সোকাহালু ও মশামছি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা।

গাভীর খাদ্য

গাভীর শারীরিক বৃদ্ধি ও কোষকলার বিকাশ ও কনসারভেশন, জল ও শক্তি উৎপাদন, রোগ পদার্থ সঞ্চার, দুধ ও হালো উৎপাদন, প্রজননের সক্ষমতা অর্জন, পর্ববয়স্ক বাতাসের বিকাশ সাধন প্রভৃতি কাজের জন্য উপযুক্ত

খাস্যের প্রয়োজন। খাস্য পরিবেশনে শর্করা অমিষ ও চর্বিজাতীয় খাস্যের প্রকৃতকার নিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ পাকীর শারীরিক বিকাশের জন্য সব ধরনের খাস্য উপাদানের জড়িত অপরিণীত। এসব খাস্য মিশ্রণে পাকীর সৈমিক প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়া উপযুক্ত পরিমাণ ও অনুপাতে সব রকম পুষ্টি উপাদান থাকতে হবে। পাকীর পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎপাদনের জন্য তাই সুস্থ খাস্যের প্রয়োজন। পাকীর খাদ্যদ্রব্য সাধারণত জিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-অঁশবৃত্ত খাস্য, দানাদার খাস্য ও কিট অ্যাডিটিভস। অঁশবৃত্ত খাস্যের মধ্যে খড়বিচালি, কাঁচাঘাস, লতাশাক, হে, সাইসেজ ইত্যাদি প্রধান। দানাদার খাস্যের মধ্যে শস্যদানা, গমের ছুনি, চালের ভূঁড়া, তৈল ইত্যাদি প্রধান। ভাছড়া খনিজ ও ভিটামিন এর মধ্যে হাঁড়ের ভূঁড়া, বিভিন্ন ভিটামিন - খনিজ প্রিমিক্স পদার্থ রয়েছে। এসব পত খাস্য প্রয়োজন মতো সম্বাহ করে পাকীকে পরিবেশন করতে হবে। পাকীকে যে পরিমাণ খাস্য পরিবেশন করতে হয় তা একধরনের ব্যবস্থাপন পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন-

- ১। প্রতিদিন একটি পাকী যে পরিমাণ মৌটি অঁশবৃত্ত খড় ও সবুজ ঘাস খেতে পারে তা ভাজে খেতে দিতে হবে।
- ২। পাকীর শরীর তাক্যাবেকপের জন্য ১.৫ কেরি দানাদার এবং প্রতি ১.০ সিটার সুস্থ উৎপাদনের জন্য পাকীকে খড় ও সবুজ ঘাসের সাথে ০.৫ কেরি দানাদার খাস্য দিতে হবে।
- ৩। পাকীকে ৪০-৫০ গ্রাম হাঁড়ের ভূঁড়া ও ১০০-১২০ গ্রাম খাস্য লবণ সরবরাহ করতে হবে।
- ৪। তাছাড়া সুস্থবতী পাকীকে প্রতিদিন পর্দাও পরিষ্কার জীবাণুবৃত্ত খাঁচার পানি সরবরাহ করতে হবে।

পাকীর খাদ্যসম্বন্ধ দামল-পালন ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

খাদ্যসম্বন্ধ দামলপালন বলতে এমন কতগুলো খাদ্যসম্বন্ধ বিবিধব্যবস্থাকে বোঝায় যা এ যাবৎকাল পতসম্পন্ন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। একলো হলো-

- বাসস্থান নির্মাণে আদো-সাহাসের ব্যবস্থা ও সুরোঁপ নিয়ন্ত্রণ করা।
- খাস্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- পচা, খাসি ও ময়লাবৃত্ত খাস্য ও পানি পরিষ্কার করা।
- সর্বপ্য ভাছা খাস্য ও পানি সরবরাহ করা।
- প্রজনন ও প্রসবে মিঠীবাধু পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- দ্রুত মলমূত্র নিষ্কাশন করা।
- অসুস্থ পাকীর পুষ্কীকরণ ও সুস্থ পাকীর সপকোর করা।
- নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা।
- সক্রিয়ক ব্যাধির প্রতিরোধক ডিঙ্ক প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

পাখীকে প্রাথমিক পর্ববেকন ও রোগ চিকিৎসা

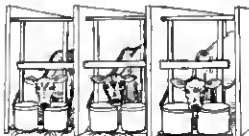
নিরমিত পর্ববেকন করে অসুস্থ পাখী শনাক্ত করা যায়। পাখীর বিভিন্ন রোগ বালাই ফেন বা হয় সেই জন্য সময়মতো টিকা দিতে হবে। পাখী ডাক্তার, বাদলা, ছুরা রোগ, গলরকলা, রিভারশেল্ট, ম্যান্ডাইটিস, পরাঙ্গীহী ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পাখীর যেকোনো রোগ দেখা দিলে পথ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বাহুর পালন

পল্লী মহিষের শৈশবকালকে বাহুর বলে। সাধারণত জন্মের পর থেকে ৬০ বছরের বেশি বয়সের পল্লী মহিষের বাচ্চাই বাহুর নামে পরিচিত। দুগ্ধ বাহুরের জবিহৃত বাহুরের সন্তোষজনক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ ছাগলের বাহুরই জবিহৃতের দুগ্ধ উৎপাদনশীল পাখী, উন্নত মানের প্রজনন উপযোগী খাঁড় বা মাংস উৎপাদনকারী পল্লী। তাই পশুপালন ক্ষেত্রে বাহুর পালন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যত্ন বাহুরের এই পল্লী বা মহিষের বাচ্চা অত্যন্ত রোগ সংবেদনশীল হয়। জন্মের পরেই যে সংখ্যক পূর্ণাঙ্গ পালিত হয় তার মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগেরও বেশি বাহুর। তাই সুস্থ সবল বাহুর পেতে হলে একদিকে যেমন-পরিচর্যা পাখীর স্ত্রী ও পর্ষদ সুখর বাগেরে প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন প্রসবকালীন ও স্বরাজ্য বাহুরের সঠিক যত্ন।

বাহুরের বাসস্থান

দেশীয় জাতের একটি বাহুরের জন্মকালীন পড় প্রজন সাধারণত ১৫-২০ কেমি হয়। অবশ্য উন্নত ও সংকর জাতের বাহুরের জন্মকালীন তখন প্রায় ২৫-৩০ কেমি হয়। একটি বাহুরের বাসস্থানের জায়গা কতটুকু হয় বাহুরের আকারের উপর তা মূলত নির্ভর করে। প্রতিটি বড় বাহুরের জন্য ৩৫ বর্গফুট (৩.২৫ ব.মি.) জায়গার ভিত্তিতে বাহুরের বাসস্থান তৈরি করা হয়।



চিত্র - কলে ছোট খোশে বাহুর

বাহুরের বাসস্থানের জায়গা এমন হতে হবে যে ঘরে প্রচুর পরিমাণ আলো ও বাতাস প্রবেশ করে। বাহুরের বাসস্থান কাঁচা বা পাকা হতে পারে, তবে এতে অসুস্থ নিদ্রাশনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি ছোট বাহুরের জন্য ১২ বর্গফুট (১.১১ ব.মি.) জায়গার প্রয়োজন। বাহুরের খোশে বড় বিমালি দিয়ে বিছানা তৈরি করতে হবে। সেবে পাকা হলে তা খেঁচ কর্মমুক্ত ও গৌরবোন্মিত না হয় সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

বাছুরের পরিচর্যা

বাছুরের পরিচর্যা বলতে এসের খাদ্য পরিবেশন, রোগব্যাধিই মুক্ত রাখা, দেখাশোনা করা ইত্যাদি বোঝায়। আমাদের দেশে বাছুরের ভালোদা বন্ধ নেওয়ার তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাছুর জন্মের পর থেকে সৈনিক বিশপদ্ধতি অর্জন না করা পর্যন্ত এসের পালন করা বা এসের দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বাছুর জন্মের পরবর্তী কল্যাণ

বাছুর জন্মের পর পরই ছালত উপর রেখে বাক দুধ পরিষ্কার করার পর শরীর পরিষ্কার করার জন্য পাণ্ডীর সামনে নিয়ে হবে। বাছুরের শরীর কল্লু করে না গেলে শরীর থেকে ৫ সেরি দুধে প্রোটিন দিয়ে কেটে স্যাঁতকন বা টিচার আরোজিন লাগতে হবে।

বাছুরকে পাণ্ডীর দুধ পান করা দেখানো

জন্মের পর পরই বাছুরকে শাল দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। জন্মের পর পরই অনেক বাছুর মায়ের বাসি থেকে দুধ চুষে খেতে পারে না। তাই বাছুরের মুখের চিহ্নের বাসি দিয়ে দুধ খাওয়ান অভ্যাস করাতে হয়। পাণ্ডীর উৎপাদন কমত; কম হলে অনেক সময় অন্য পাণ্ডীর দুধ পান করানোর প্রয়োজন হয়ে পারে। শৈশবে বাছুরকে ৩৭.৫ সে. তাপমাত্রার দুধ পান করানো হয়। সাধারণত বোতলে বা বাসিভিত্তে করে বাছুরকে দুধ খাওয়ানো হয়। বিচ্ছিন্ন দুধ ও পানি ১ : ২ অনুপাতে মিশিয়ে পাতলা করে পান করানো উচিত। দুধ খাওয়ানোর পর বোতল অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।



চিত্র : বাছুর মায়ের দুধ পান করছে



চিত্র : বাছুরকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে

খাবার পর্যায়ে বাছুর চিহ্নিকরণ বা ট্যাগ নম্বর লাগানো

এটি ছোট খামারের জন্য তেমন প্রয়োজন না হলেও বড় খামারের জন্য জরুরি। পশুর আঁত উল্লঙ্ঘন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত কানে ট্যাগ নম্বর লাগিয়ে পত চিহ্নিকরণ করা হয়।

পরিমিত খাদ্য পরিবেশন, কলম্বুর ও বিচ্ছিন্ন পরিষ্কার রাখা

বাছুরের সঠিকভাবে বৃদ্ধির জন্য পরিমিত খাদ্য পরিবেশনের কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত সৈনিক ওজন অনুসারে খাবার প্রদান করা হয়। বর্ধিত বাছুরের চাহিদা অনুসারে অন্য থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যতালিকা অনুসারে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। বাছুরসম্বন্ধেই প্রতিশ্রুততার জন্য বাছুরের থাকার ঘরটিতে মলমূত্র নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিম্নমিত বাছুরের থাকার ঘরের বিধান

বাছুর সময়মতো ঘরে কোলা ও বের করা

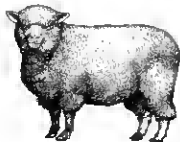
বাছুরকে সময়মতো ঘরে তুলতে হয় এবং ঘর থেকে বের করতে হয়। বাছুরকে সারা দিন যেমন ঘরে আবদ্ধ রাখা ঠিক নয় এবং তেমনি দিনের বেলায় জাহাজে রাখাও ঠিক নয়। বৃষ্টিতে ভেজা বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থাকলে বাছুরের তুলতুল শ্রবাহ রোগ হতে পারে।

বাছুরের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও রোগ চিকিৎসা

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রোগব্যাপিতে নিয়মিত ঔষধ সেবন বাছুর পরিচর্যার অন্যতম কল্পনী। এই সময়ে বাছুরের শারীরিক বৃদ্ধি ভালোভাবে না হলে পরবর্তীতে ভালো উৎপাদনশীল লবু হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। বাছুরের বিভিন্ন রোগবালাই খেন না হয় সেই জন্য সময়মতো টিকা দিতে হবে। বাছুরের ভায়া, নিউমোনিয়া, হুজাক, বালসা রোগ, কৃমি ও অঁগুলি রোগ দেখা যায়। বাছুরের বেকোনো রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ভেড়া পালন

ভেড়া একটি দ্বিচরী প্রাণী। এরা সারথ খাদ্য খেতে খুব পছন্দ করে এবং দলগতভাবে ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রজনন কক্ষতা বেশি, ১৫ মাসে ২ বার বাচ্চ দেয়। ভাই ভেড়া পালন শুধু কবলে কমেক বছরের মধ্যে খামারের আকার বড় হয়ে উঠে এবং ব্যবসার লাভবান হওয়া যায়। এরা তু খাদ্য খেতে বেঁচে থাকতে পারে। তবে কিছু সাদাকার খাদ্য সরবরাহ করলে ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। ভেড়া পশম (Wool) ও মাংসের জন্য পালন করা হয়। এসেলে ভেড়ার ভেমন কোনো জাতো জাত নেই। বাংলাদেশের ভেড়া মেটো পশম উৎপাদন করে। ভাই এরা পশমের জন্য জনপ্রিয় নয়। এখানে ভেড়া মাংসের জন্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে। করে পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশগুলোতে ভেড়ার পশম খুব মূল্যবান ও জনপ্রিয়। ভেড়ার পশম দিয়ে কবল, শাল, সোয়েটার, জ্যাকেট তৈরি করা হয়। মেটো পশম কাপেট তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। ভেড়ার এত গুণাগুণ থাকলেও চরপছিমি ও উলোপের অভাবে এসেলে এর পালন জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি।



চিত্র : সুন্দ পশমের মেটো ভেড়া



চিত্র : মেটো পশমের কাঁকড়া ভেড়া

ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়ার বাসস্থান তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ এরা ঘাবারের জন্য সারাদিন ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। শুধুও নিম্ন লিখিত কারণে এদের বাসস্থান প্রয়োজন হয়।

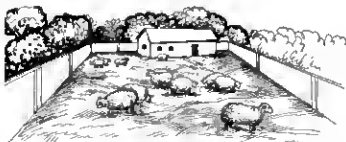
- হাওতর বেলায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।
- বন্য প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
- ঝড় ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য।
- বেশি উৎপাদনক্ষম ভেড়ার সুলভ সোহন করার জন্য।
- গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাচ্চা ভেড়ার পরিচর্যা করার জন্য।
- ভেড়ার পশম কাটার জন্য।
- চোরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

ভেড়া পালনের জন্য তিন ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়। যথা :

ক, উনুত ঘর, আখা উনুত ও প, আবদ্ধ ঘর। আফ্যাবা ও জলবাহুর কথা স্মিত করে যাতে আগ্রয়েন জন্য ভেড়ার ঘর তৈরি করা হয়। ভেড়ার ঘরের থেকে ভূমি সমকালে বা মাচার তৈরি হয়ে থাকে।

ক, উনুত ঘর: যেসব অঞ্চলে কৃষ্ণপাত কম হয় সেখানে এ ধরনের ঘর উপযোগী। একটি নির্দিষ্ট আয়তায় চারিদিকে বেড়া দিয়ে উনুত ঘর তৈরি করা হয়। এধরনের ঘরে কোনো ছাদ থাকে না। সারাদিন চরে খাওয়ার সব রাতে ভেড়ার পাল এখানে আস্তায় দেয়। এখানে মেঝেতে বড় ব্যবহার করা হয়।

খ, আখা উনুত ঘর: উনুত ঘরের নির্দিষ্ট স্থানের এক কোণে কিছু জায়গা যখন ঘাসসহ তৈরি করা হয় তখন তাকে আখা উনুত ঘর বলে। যেসব এলাকায় মাঝে মধ্যে কৃষ্ণি হয় সেখানে আখা উনুত ঘর ব্যবহার করা যেতে পারে।



চিত্র : ভেড়ার আখা উনুত ঘর

প, আবদ্ধ ঘর: যেসব অঞ্চলে প্রচুর বড়বৃষ্টি হয়, সেখানে এ ঘর বেশি উপযোগী। আবদ্ধ ঘরের পূর্বা অংশেই ছাদ থাকে। ঘরের পশ দিয়ে প্রচুর আলো বাতাসে গ্রীষ্মেরে সুবাহা থাকে। আবদ্ধ ঘরের মেঝে পালা ও আখা পালা হয়ে থাকে।

বৃক্ষ ভেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কারণের পরিমাপ-

মাচার মেখে (বর্গমিটার)	ফুসিলমতলে খড়ের মেখে (বর্গমিটার)
০.৪৫-০.৫৫	০.৯৫-০.৯৫

ভেড়ার পরিচর্যা

ভেড়াকে সুস্থ, সকল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য এবং এদের থেকে বেশি উৎপাদন পেতে হলে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে। নিম্নলিখিত ত্রাণ দিয়ে ভেড়ার পশম পরিচর্যা করতে হবে। এতে পশমের মজলা বেহিয়ে আসবে। ভেড়ার সাথে সাথে মধ্য বহিঃপর্যায়ীঐনালক প্রয়োগ করতে হবে। ভেড়ার পশম কাটার পূর্বে গোসল করাতে হবে।

ভেড়ার খাদ্য

ভেড়া যে কোনো ধরনের খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এটি গু, মহিষ ও ছাগলের মতোই জাবরকটি গ্রাসী। ভেড়ার খাদ্যের প্রেসিফিক্যাস গু ছাগলের মতোই। এদের বেশে আশ্রিত খাদ্যের পরিমাণ মালানার খাদ্যের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। পর্বতী জেড়ির তুলনায় প্রসূতির খাদ্য তালিকায় অধিক পরিমাণে মালানার খাদ্য প্রদান করা হয়। বাচ্চা প্রসবের একমাস পূর্ব থেকে জেড়ির খাদ্য তালিকায় দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম হারে মালানার খাদ্য যোগ করতে হয়। একটি বরষ ভেড়ার দৈনিক ২.০-২.৫, কেজি সবুজ ঘাস এবং ২৫০-৩০০ গ্রাম মালানার খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার খাদ্য তালিকা-

উপাদান	পরিমাণ (%)
ছুটার গুড়া	৪০
চিটা গুড়	৫
গমের ছুসি	১০
খৈল	৯
ভাওসো লিপিউম ঘাস	৩৬
মোট	১০০

কারণ :

পাঁচটি মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার প্রতিদিন কী পরিমাণ খাদ্য ও মালানার খাদ্যের প্রয়োজন হবে তা হিসাব করে প্রেনি শিক্ষককে দেখাও।

পর্বতী জেড়ির খাদ্য তালিকা

উপাদান	পরিমাণ (%)
ছুটার গুড়া	৪৫
খৈল	১০
চিটা গুড়	৫
ছুটার সাইলোজ	২০
ভাকানো লিপিউম ঘাস	২০

প্রসূতি জেড়ির খাদ্য তালিকা

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভাকানো ঘানের ভাকানো লিপিউম ঘাস	৮০
ছুটার গুড়া	১০
খৈল	৪
গমের ছুসি	৩

নবজাতকের যত্ন

নবজাত মেঘ শাবককে জনের পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ওজন অনুপাতে খালদুধ পান করাতে হয়। এতে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ কমাতে পড়ে উঠে।

ডেয়ার রোপযাখি প্রতিরোধ ও সনাক্ত

ডেড়াকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। সঙ্গ বয়সের ডেড়াকে নিয়মিত কুমিলশ ও খাওয়াতে হবে ও সময়মতো টিকা প্রদান করতে হবে। জেফা কাদলা, ডকুন, ম্যাণ্টাইটিস, খুরা রোগ, চর্চরোগ, কৃমি, বহিঃপরজীবী ইত্যাদিতে বেশি আক্রান্ত হয়। রোপাক্রান্ত ডেড়াকে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা সেবা নিতে হবে।

ইঁস পালন পদ্ধতি

বাংলাদেশে এমীয়ার্ভুগ শেখ। এ দেশের আবাদ্যভাড়া এবং জলবায়ু ইঁস পালনের উপযোগী। এখানে অনেক খালবিশ, জোখানালা, হাওয়ার-বীণ্ড, পুকুর ও নদী রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট, হরদুপসিংহ, কিশোরগঞ্জ, যশোরসহ অনেক জেলার বাসিন্দিক বিভিন্ন ইঁসের খাওয়ার পড়ে উঠেছে। হায়েক ইঁসের খারাকিরা প্রচলিত পদ্ধতিতে ইঁস পালন করে থাকে। কিন্তু ইঁস পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

১। উনুজ পদ্ধতি

৩। অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি

২। আবদ্ধ পদ্ধতি

৪। ভাসমান পদ্ধতি

১। উনুজ পদ্ধতি

ইঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে উনুজ পদ্ধতি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এ পদ্ধতিতে ইঁস পালন করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে সকাল কোয়ার ইঁসগুলোকে বাসা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং রাতে নিশিটি ঘরে আবদ্ধ থাকে। এখানে ইঁসকে সাধারণত কোনো খাবার দেওয়া হয় না। ফলস্বরূপ, এরা সাধারণ প্রাকৃতিক উঁহল থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য যেমন, ছোট মাছ, শাদুক, জলজ উদ্ভিদসহ বিভিন্ন দানাদার ও কীটপতঙ্গ নিয়েই সাহায্য করে খায়। ইঁস সকাল কোয়ার ভিন্ন পড়ে। তাই এই পদ্ধতিতে ইঁস পালনের সময় ভিন্নপাত্তা ইঁসকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। আয়েনের মেঘের মেঘের অঞ্চলে পড়িত জমি, হাওয়ার-বীণ্ড ও নদী রয়েছে সেখানে এ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি উপায় ও লাভজনক। কিন্তু উনুজ পদ্ধতিতে ইঁস পালনের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

উনুজ পদ্ধতিতে ইঁস পালনের সুবিধা

- প্রমিত কম লাগে।
- খাদ্য খরচ কম।
- বাসস্থান তৈরিতে খরচ কম হয়।
- পরিবেশের সাথে অভিযোজন ভালো হয়।
- এদের দৈনিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন ভালো হয়।



চিত্র : উনুজ পদ্ধতিতে ইঁস পালন

উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধা

- অনেক পতিত জমি ও কলারহলের প্রয়োজন হয়।
- বন্য পতঙ্গাধি দ্বারা হাঁসের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- অনেক সময় খরাপ আবহাওয়ার হাঁসের ক্ষতি হয়ে থাকে।
- সবসময় পর্যবেক্ষণ করা যায় না।
- অনেক সময় জমির ফসল নষ্ট করে থাকে।

২। আবদ্ধ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে হাঁসকে সব সময় আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। বাচ্চা হাঁস পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। আবদ্ধ পদ্ধতি আবার দুইধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

i) ঘেরে পদ্ধতি ii) বাঁচা পদ্ধতি বা ব্যাটনি পদ্ধতি

i) ঘেরে পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চা আবদ্ধ অবস্থায় ঘেরেতে পালন করা হয়। এ ধরনের ঘেরেতে বিছানা হিসাবে ধানের লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাবার এবং পানি দিয়ে বিছানা থাকে নষ্ট না হয় সেমিকে লক্ষ রাখতে হবে।



চিত্র : ঘেরেতে হাঁসের বাচ্চা পালন

ii) ব্যাটনি বা বাঁচা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাকে বাঁচার পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়। বাচ্চা পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।



চিত্র : বাঁচার হাঁসের বাচ্চা



চিত্র : আবদ্ধ পদ্ধতিতে বড় হাঁস পালন

আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধা

- খাদ্য গ্রহণ সহজভাবে হয়।
- সহজে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- প্রমিত কম লাগে।
- বন্য পতঙ্গাধি হাঁসের ক্ষতি করতে পারে না।
- প্রতিটি হাঁসের কার্যগত কম লাগে।

আবদ্ধ পদ্ধতির অসুবিধা

- বেশি পরিমিশ্র খাবার সরবরাহ করতে হয়।
- দূর নির্ধারণ করা বেশি হয়।
- হাঁসের সুস্থ আশেপাশের অস্তর হয়।
- নির্দিষ্ট বয়স নিতে হয়।
- এখানে হাঁস সাঁতার কাটার সুযোগ পায় না।

৩। অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁসকে রাতে ঘরে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় ছরসলেখে একটি নির্দিষ্ট জলাধার বা জায়গার মধ্যে বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এ নির্দিষ্ট জায়গার চিত্তরে প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রায় ০.৯০ বর্গমিটার (প্রায় ১০ বর্গফুট) জায়গার প্রয়োজন হয়। ছরসপাটি জলাধার না হলে হাঁসকে সাঁতার কাটার জন্য কৃত্রিম জলাধার, মলা বা গ্রেবাক্স তৈরি করে দিতে হয়। এখানে হাঁসগুলো সাঁতার কাটতে পারে ও খাবার পানি খেতে পারে।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা

- এখানে হাঁস সাঁতার কাটার সুযোগ পাায়।
- দৈনিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে।
- শ্রমিক কম পালে।
- খাদ্য গ্রহণ সমভাবে হয়।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধা

- হাঁস পালন খরচ বেশি।
- নিয়ন্ত্রিত বয়স দিতে হয়।
- খাদ্য খরচ বেশি।
- খাদ্য গ্রহণ সমভাবে হয় না।



চিত্র : অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালন

৪। ভাসমান পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে হাঁসের জন্য ভাসমান ঘর তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতি বাঁড়ত ও বরফ হাঁস পালনের উপযোগী। বড় পুকুর, মিষি বা নদীর কিনারায় পানির উপর হাঁসের সংখ্যা বিবেচনায় রেখে ঘর নির্মাণ করা হয়। এখানে নির্মাণ খরচ একটু বেশি হলেও খাদ্য খরচ কম। ভাসমান ঘর তৈরির জন্য দ্রুত ব্যবহার করা হয়। হাঁসগুলো সারাদিন বাসোবাসে সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়ায় এবং রাত্রে ঘরে আস্তুর নেয়। সাধারণত নিচু এলাকা যেখানে কন্যা বেশি হয়, সেখানে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন খুবই সুবিধাজনক।

তথ্য : পিকলীবা ভাসমান পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা ও অসুবিধা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

হাঁসের রোগস্বাধি প্রতিরোধ ও দমন

হাঁসকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। হাঁসকে সমস্তমতো টিকা দিতে হবে ও কৃত্রিমপক খাওয়ানো হবে। হাঁস ভাক প্রেণ, কলেরা ও পরজীবী ইত্যাদিতে বেশি আক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত হাঁসকে পত চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা সেবা দিতে হবে।

সকল শব্দ : হাওর-বঁড়ত, ভাসমান পদ্ধতি, অভিব্যজন, জলমহল, কৃত্রিম জলাধার, ভাক প্রেণ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিল্পের কাঁচামাল : কৃষিজ প্রযাদি

কৃষি স্থানবজাতির বেঁচে থাকার একটি অনন্য নিয়ন্ত্রিত এবং সজলতা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি শিল্পের কাঁচামালও যোগান দিয়ে থাকে। আবার পৃথের নৌদর্ঘ্য বৃদ্ধির জন্য কাঁচামাল হিসাবে কাঠ, গন্ধু ও ঘাস জাতীয় প্রযাদি সরবরাহ করে। চা, ককি, ভিনি, তুলা, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কৃষিজ প্রযাদি ছাড়াও বাঁশ, বেত, কাঠ, নারিকেলের ছোবড়া, আমে ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশের কৃটির শিল্পের উত্থান হচ্ছে বাঁশ-বেতের মাধ্যমে। অতএব, আমাদের সবারই জানা থাকে দরকার বাঁশ-বেত হ'লে কিসের জিনিস তৈরি হয়, নারিকেলের ছোবড়া কী উপকারে আসে- আর আম ছাড়া কি ধরনের খাদ্য পণ্য তৈরি হয়। নিচে কয়েকটি কৃষিজ পণ্যের ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

আমজাত খাদ্যশস্যসহী ও ব্যবহার

আমকে কলের রাস্তা বলা হয়। বাংলাদেশে যত জল আছে তদন্তেই আমের সিক থেকে আমের অবস্থান গ্রন্থ। আম সার্বিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ এবং আফ্রিকার অনেক দেশেই আম উৎপাদন হয়। তবে উৎপাদনের সিক থেকে জরত গ্রন্থ স্থান দখল করে আছে। আর বাংলাদেশের স্থান অষ্টম। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়ই কমবেশি আম আছে। তবে বেশি আম উৎপাদনকারী জেলাগুলো হচ্ছে- বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, সিরাজপুর, কুষ্টিয়া ও খুলনা। যেটি আমের শতকরা ৯০ জলের বেশি বৃহত্তর রাজশাহী জেলার উৎপাদন হয়।

চাঁচা আম, পাকা আম প্রক্রিয়াজাতকরণ করে আমের সোরকা, আমের চাটনি, আমের আচার, আমচুর, আমসবু, পাকা আমের পোডলজাত খুস ইত্যাদি সুখরোচক খাদ্য তৈরি হচ্ছে।

নারিকেলজাত প্রযা ও ব্যবহার

নারিকেল একটি অর্থকারী ও জৈবজাতীয় ফসল। নারিকেল গাছ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ফলের ভিতরের অংশ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তা হতে তেলও পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে লড়ি, মধুর প্রকৃতি তৈরি হয়। নারিকেল গাছের পাতা ব'লে নীচীও তৈরি হয়।

নারিকেলের কড়ি ফলকে ডাব বলা হয়। ডাবের পানি সুখাদু এবং পুষ্টিকর। রোগীর পান্য হিসাবেও ডাবের পানির ব্যবহার হয়। উপকূল অঞ্চলের লোকেরা ডাবকরিকে নারিকেলের স্থান ব্যবহার করেন। আর ক্ষীর, পায়ের, মিষ্টি ইত্যাদি তৈরিতে বাংলাদেশের অনেক পরিবারেই নারিকেল ব্যবহার করে। নারিকেল হতে মাখার দেওয়ার এবং খাওয়ার তেল তৈরি করা হয়। প্রিসারিশ সাবান ও অন্যান্য কসমেটিকস তৈরিতেও নারিকেল ব্যবহার করা হয়।

নারিকেলের ছোবড়া

বাংলাদেশে সারা বছরই প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়। নারিকেল উৎপাদনের সাথে নারিকেলের ছোবড়াও প্রচুর পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া ঘিরে নানা গৃহস্থালি বস্তু তৈরি হয়।

যেমন- খাটের জালিস, ওয়ালম্যাট, পাগোল, রশি ইত্যাদি।

শিল্পের বাঁগামাল হিসাবে কৃষি দ্রব্যালি ব্যবহারের প্রচুর

বীশ ও বীশজাতক দ্রব্যালি ব্যবহার

বীশ ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। এটি গুরুত্বপূর্ণ অকার্য ফল ও প্রাকৃতিক সম্পদ। আসহাবাশর, গৃহনির্মাণ ও গৃহ সজ্জার কাজে প্রাচীনকাল থেকেই কার্ঠের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো বীশকে পরিবারিক বা গৃহস্থালির নানান কাজে ব্যবহার করা হয়। গৃহনির্মাণ ও গৃহস্থালী থেকে শুরু করে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত এর ব্যবহার বিদ্যুত। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে বীশ থেকে কাগজ, পার্টিকেল বোর্ড, প্রাইবোর্ড, ডেউটিন এমনকি প্যানেল পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই বীশ পাতলা করে ফেরাই করে চটাই, ডোল, বীশ, জাড়, মজের খুট, খেলনা, বান্যময়, টুকরি, কুড়ি, কুলা, বাহ ধবাহ বঁচা, পলো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হয়।

আধুনিক বিশেষ সেপে ও বিশেষে বীশের রস ও কুটির শিল্পের প্রচুর উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে বীশ থেকে শাস্ত্রকার সেমিন্টেট বীশের মেপে ও সেওয়ারলকার, হালুয়, কুশন, পিটলকার এমনকি পাদুকা পর্যন্ত তৈরি সম্ভব হচ্ছে।

বীশ শিল্পের বেশি বিকাশ

বীশ শিল্পকে সিন্থ্রাক শ্রেণিতে রাখা করা যায়, যথা :

- ১। কাগজশিল্প
- ২। নির্মাণশিল্প
- ৩। ক্ষুদ্র হস্তশিল্প

কাগজ শিল্প

মূলনির্মাণ কাগজ শিল্পের জন্য বিশেষ উপযোগী। মূলবীশের তৈরি কাগজের মত দিয়ে উন্নত মানের কাগজ তৈরি হয়। কাগজের উপভোগ হিসাবে রেকলও প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশের নানা ক্ষায়ণায় কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অসিকশে বীশই এই শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়। কাগজ ছাড়ার বীশ থেকে পার্টিকেল বোর্ড, প্রাইবোর্ড, ফ্রেকবোর্ড বীশের ডেউটিন, প্যানেল বোর্ড ইত্যাদি তৈরি করা যায়।



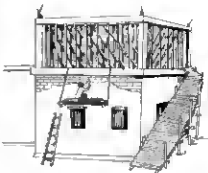
চিত্র : নারিকেলের ছোবড়া



চিত্র : বীশ

নির্মাপশিল্প

বিভিন্ন নির্মাণ শিল্পেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়। নির্মাণশিল্পের মধ্যে গৃহ বা দালান কোঠা নির্মাণই প্রধান। বাঁশ প্রাচীন গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন কাজ যেমন খুঁটি সেতলা ঘরের বেড়া সেতলা, বীঘ বা আড় তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় দালান কোঠা নির্মাণেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : দালানকোঠা নির্মাণে বাঁশ

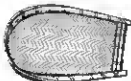
আরও অনেক নির্মাণশিল্পে যেখানে বাঁশ অত্যন্তকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন গ্রামের ঘাল বা অপ্রশস্ত সলীতে সেতু বা সীকো তৈরিতে, পৌকার মাস্তুল, ছই, পাটাতন, পল্লব পাকি, ঠেলাপাকি, জোহাল, ঘাসি ও হাতুই কল ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক খুঁটি, হাথ ধরার ঠুঁই, ব্যাড়া জাল ইত্যাদি তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। ধর্ম জলের লত, সবজির পাত বেয়ে উঠার জন্য ম্যাগ, পৌকার ঘাল ও সীকোর লত, বন্ধুতার মক, জোহল এসব তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হচ্ছে নিয়মিত। পাহাড়ি এলাকার বাঁশ দ্বারা স্থান তৈরি করা হয়, যাকে কলা হয় আঠেজীর স্থান। এই স্থানের সাহায্যে পাহাড়ি এলাকার জমি চাষ করা হয়।

স্থল হস্তশিল্প

স্থল হস্তশিল্পেই অধিক হারে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। কেননা এই শিল্পের প্রবাস্যত তৈরি ও ব্যবহার বেড়ে গেছে। সমস্ত প্রকার বাঁশ বয়ন স্থল হস্তশিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত। এই শিল্পের অধীনে তৈরি হয় চাটাই, জোল, কুলা, কুড়ি, আকা, চালনি, খাঁচা, ফেলনা, কলস, টুপি, ফুলদানি, লাঠি স্ট্যান্ড, লাঠি, কাঠি এমনকি গাঁত খিলা, হুতসোলক ইত্যাদি।



চিত্র : টুকরি



চিত্র : কুলা



চিত্র : পালো



ঐক্য বীণ

চিত্র : বীণের চেয়ার ও সোফা

বীণ তথু কাগজ তৈরি বা পুঁথ সাদা তৈরি কাজেই ব্যবহার হয় না। ঐক্য তৈরি কাজেও বীণ ব্যবহার হয়। বীণের অনেক জাত আছে। অন্যতে সোনালি বীণ বিভিন্ন রঙের কাজে লাগে, কপি, শেখ রোপ, প্রোথাক্ষিত রোপ, ফোঁড়া পাতা ইত্যাদি মানুষের সাধারণ রোপ। এই রোপগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার মতোই হয় এই সোনালি বীণ। ঐক্য হিসেবে বীণের শীষ, পাতা ও মূল ব্যবহার করা হয়। অবশ্যই এগুলো কবিরাজের পরামর্শমত ঐক্য তৈরি ও ব্যবহার করতে হবে।

জাত : শিকারীরা বেখানে মুক্তি তৈরি করা হয় এমন স্থান পরিমার্জন করবে এবং মুক্তি তৈরি ধাপগুলো লিখে আদবে। পরবর্তীতে হাতে কলমে লিখে রাখা হবে।

বেত ও বেতের ব্যবহার

বেত কাঠ ও বীণের মতো প্রাকৃতিক দ্রব্য সম্পদ। বাংলাদেশের বনে জঙ্গলে অনেক ধানের বেত পাওয়া যায়। বেত উৎপাদনের জন্য কৃষি জমি ব্যবহার করা হয়না। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর বেত উৎপন্ন হয়। বেত, তাল ও সারিকেল গোত্রীয় কিছু ঝটোফুল লতা ও ভলুগাভী উদ্ভিদ। এর ফল হয়। যা বেত ফল নামে পরিচিতি।



চিত্র : বেত গাছ

বেত শিল্প

বেতের শিল্পওপের জন্যই বেত সবার নিকট সুপরিচিত। বেতের কাণ্ড বেত শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বেতের কাণ্ড শক্ত বটে কিন্তু নমনীয়ও ফেরাইযোগ্য। এ থেকে অকর্ষীয় ও অভিজাত্যবহনকারী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

বেতের কার্শিচার তৈরি

বেতের তৈরি কার্শিচার একেবারেই প্রাকৃতিক। এতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা নেই। বেতকে সুতার মতো ব্যবহার করে কোনো শক্ত জিনিসের (বেত, বীণ) উপর পেঁচিয়ে কার্শিচার তৈরি করা যায়। আবার বেতের মোট শাখা প্রশাখা তকিরে শোখন করে শক্ত কঠিনো দাঁড় করিয়ে সোফা, চেয়ার, টেবিল, বুকসেলফ, খাট, সেলনা, মোড়া, জুতা রাখার তাক, কর্ণার সেলফ, গ্যার্ডেনবান, বকিং চেয়ার, আঠার কেনারা ইত্যাদি কার্শিচার বা আসবাবপত্র তৈরি করা যায়।

ফার্নিচার তৈরির আগে বেতগুলোকে সইজ্ব যতো কেটে গোমন করতে হবে। একটি চাফিতে আনুমানিক হাতে বরিক এশিঙ ও পানির মিশ্রণ তৈরি করে এই ম্রব্যে বেত এক সম্ভ্রাহ ভিজিয়ে রাখলে ভালোভাবে শোধিত হবে। এতে খুণ বা অন্যান্য পোক-মাকড় আক্রমণ করবে না।

বেতজাত শিল্প প্রতিষ্ঠান

বেতের ব্যবহার ব্যাপক। বেত শিল্পই হচ্ছে গ্রামীণ শিল্প ঐতিহ্য। বেতের শিল্পকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

১। হালকা নির্মাণশিল্প

২। বুনশিল্প

৩। ক্ষুদ্র হস্তশিল্প

৪। মিশ্রশিল্প

হালকা নির্মাণশিল্প

বেতের হালকা নির্মাণশিল্প বলতে বোঝায় যেটা বেতের আসবাবপত্র, যা হালকা আর বহন করতে পারে। হালকা নির্মাণ শিল্পের প্রধান উদাহরণ হচ্ছে- সোফাসেট, চেয়ার, খাট, পার্টিশন, পেলক, টেবিল ইত্যাদি। এই শিল্পের যে বেত ব্যবহার করা হয় তা অপেক্ষাকৃত মোটা এবং পরিমতল বেগি। আর এই বেত ব্যবহারে শিল্প সৈন্যগণের দরকার হয়ে থাকে। দেশ-বিদেশের অভিজাত মহলে হালকা নির্মাণ শিল্পের ম্রব্যাদির ক্ষুদ্র চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পে সাধারণত গোম্মাবেত, উদমবেত, কলমবেত ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : বেতের সোফা সেট

বুন শিল্প

বুনশিল্পে সূত্রে ও নমনীয় বেত ব্যবহার করা হয়। এসব বেত চেঁচাই করে আরও সূত্রে কালি পাওয়া যায়। এই সূত্রে কালিকে বেঁধি কলা হয়। বাঁধাই ও বুনন কাজে এই বেঁধি ব্যবহার করা হয়। বুনন শিল্পের মাধ্যমে হালকা নির্মাণ শিল্পকে কাঙ্ক্ষারমর ও নান্দনিক করা হয়। বুনন শিল্পের মন্য বাস্পরিবেত ও জালিবেত ব্যবহার করা হয়।

ক্ষুদ্র হস্তশিল্প

কমবেত শিল্পের পুরোটাই হস্তশিল্প- ক্ষুদ্র ছোট অথবা বড় ছোট। নির্মাণশিল্প ও বুনশিল্পের অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশে ব্যবহার করে সৌন্দর্যবর্ধক বেসর ম্রব্যাদি হাতে তৈরি করা হয় তাৎকেই বলে বেতের ক্ষুদ্র হস্তশিল্প। বেতের ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের উদাহরণ হচ্ছে ফোনা, কুলের সাজি, কলমদানি, বেতের থামা, ক্ষুদ্র ব্যাক, মোড়, ফুলদানি ইত্যাদি।



চিত্র : বেতের থামা

মিশ্রশিল্প

বেতের সাথে বাঁশ, কাঠ, প্রাস্টিক, নাইলন, সিল ইত্যাদি মিশ্র করে বেশের চুবালি তৈরি হয় তাকে বেতের মিশ্রশিল্প বলে। যেটা বেতের অভাব হলে এর স্থলে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করে মিশ্র শিল্প হিসাবে দোলানা, ঘোড়া, ব্যাক, সেকক, চেয়ার তৈরি করা হয়। আবার সন্ম বেতের অভাব হলে এর স্থলে নাইলনের বা প্রাস্টিকের বেতি যেটা বেতের সাথে মিশ্রণ করে খট, বাক্স, সোফা ইত্যাদি তৈরি করা যায়।



চিত্র : কুলপালি



চিত্র : কুলপালি

আম পরিচ্ছেদ

ঔষধি উদ্ভিদ ও এর ব্যবহার

ঔষধি উদ্ভিদ

আমাদের চারপাশের পরিবেশে অনেক ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে। প্রাকৃতিক জীবনে আমরা বহুবিধ উপায়ে এসব উদ্ভিদ ও এর উৎপাদিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকি। পান্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিকা ও চিকিৎসার জীবনের সকল চাহিদা মেটাওয়ার জন্য আমরা বিশাল উদ্ভিদবিশ্বের উপর নির্ভরশীল। এসম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা এতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমরা দেখেছি বা শুনেছি বাড়িতে বিশেষ করে ছোটদের সর্দি-কাশি হলে তুলসী পাতার রসের সাথে কয়েক কেঁটা নমু মিশিয়ে খাওয়ারো হয়। এর ফলে তাদের সর্দি-কাশি উপশম হয় এবং তারা আশ্রয় পায়। রক্তচাপ কমে এবং শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে পান্য কুলের পাতা বা দুর্বাখাল ভালো করে চুয়ে শীলপটীর বেটে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে সাথে সাথে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। দুই-তিন দিনের মধ্যে ক্ষত চকিরে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এভাবে পরিবেশের বেসব উদ্ভিদ আমাদের রোগ ব্যাধির উপশম বা নিরাময়ে ব্যবহার হয়, সেক্ষেত্রেই ঔষধি উদ্ভিদ বলা হয়।

ঔষধি উদ্ভিদ শস্যক্ষেত্রে

আমাদের দেশ এক সময় ঔষধি উদ্ভিদে সমৃদ্ধ ছিল। বাঁট-খট, পাখ-হাতের, বন-জঙ্গল সর্বত্র অসংখ্য ঔষধি উদ্ভিদে ভরপুর ছিল। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে ভূমির বহুবিধ ব্যবহার বেড়েছে। এছাড়া অজ্ঞতা, অবহেলা ও অবহেলার কারণে বর্তমানে এসব ঔষধি উদ্ভিদের প্রধান উৎপত্তিস্থল প্রাকৃতিক উল্ল বনভূমি কমে যাওয়ার ঝুঁকির মুখোমুখি বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে

গেছে। এখনও আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে কয়েক ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে। সেগুলো আমরা চিনি না। এমনকি সেগুলোর ব্যবহার ও কণাভণ সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই। চরপাশের এসব ঔষধি উদ্ভিদসমূহ শনাক্ত করলে পারা এক সেতুঘের ব্যবহার ও কণাভণ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। এর ফলে আমরা আমাদের দেশের আশামর জনসাধারণের রোগবাণি নিরাময়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারব।

ঔষধি উদ্ভিদ



আলুপুটি



কুলদী



কালমেঘ



বালক



সর্বপল্লী



অর্জুন



হরিদকী



জাম্বলকী



অরেকা



দুতকুমকী



কোলাকুল

কাঃ। শিক্ষক নমুনা ঔষধি উদ্ভিদ প্রদর্শিত করে আসবেন, সেগুলো শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পর্যবেক্ষণ ও শনাক্ত করবে। দলীর আলোচনার মাধ্যমে ঔষধি উদ্ভিদসমূহ নামের তালিকা তৈরি করবে।

ঔষধি উদ্ভিদ ও এর ব্যবহার

আমাদের দেশের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে প্রাচীনকাল থেকে রোগব্যাধি উপশমে বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে। ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে এসব উদ্ভিদকে ঔষধি বা ডেমেডিক্যাল উদ্ভিদ বলা হয়। নিম্নে কয়েকটি ডেমেডিক্যাল উদ্ভিদের পরিচিতি ও ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

- ১। **ধানকুনি** : ধানকুনি একটি ছোট লতানো বীজ্য জাতীয় উদ্ভিদ। এর প্রতি পর্ব থেকে নিচে মূল এবং উপরে পাতা ও পাতা পত্র। পাতা সরল কুঞ্চিত হলে, একান্তর।

ব্যবহৃত অংশ : সমগ্র উদ্ভিদ

ব্যবহার : হেলে মেয়েদের পেটের অসুখ, বিশেষ করে বদহজম ও আমাশয় রোগ নিরাময়ে ধানকুনি খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ধানকুনি জ্বাৰবর্ধক, ক্ষুধিবর্ধক, আম্বাভঙ্গক, চর্মরোগনাশক।

- ২। **তুলসী** : তুলসী অতিপরিচিত বীজ্য জাতীয় উদ্ভিদ। এটি সাধারণত ৩০ সেমি থেকে ১ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। পাতা সরল, প্রতিমুখ, ত্রিভাঙ্গ, সুগন্ধযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহৃত অংশ : পাতা

ব্যবহার : সাধারণ সর্দি-কাশিতে তুলসী পাতার রস বেশ উপকারী। ছোট মেয়েদের পেটের তুলসী পাতার রসের সাথে অমল রস ও মধু মিশিয়ে খাওয়াতেনো হয়।

- ৩। **কলোমেথ** : এটি একটি ছোট বীজ্য জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত ২০ সেমি থেকে ১ মিটার উঁচু হয়। পাতা সরল, প্রতিমুখ, কিছুটা লম্বা ধরনের। পাতা তিক্ত। বর্ষার শেষ হতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহৃত অংশ : সমগ্র গাছ, বিশেষ করে পাতা।

ব্যবহার : ছোট মেয়ে-মেয়েদের জ্বর, অর্জুন ও শিতার সোথে এত রস একটি আত্মা ভালো ঔষধ।

- ৪। **হালক** : গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল, প্রতিমুখ, লম্বাকৃতি।

ব্যবহৃত অংশ : পাতার নির্ভস

ব্যবহার : কাশি নিরাময়ে অধিক ব্যবহৃত হয়। সমগ্ররস, অম্বাভঙ্গ রস ও মধুসহ হালক পাতার রস খেলে কার্যকরী হয়।

- ৫। **সর্পপত্র** : সর্পপত্র একটি বহুবর্ষজীবী বিজ্য। প্রতিপর্বে সাধারণত ৩টি পাতা থাকে। বর্ষার ফুল ও ফল হয়। ফল পাকলে কালো হয়।

ব্যবহৃত অংশ : ফুল বা ফলের রস।

ব্যবহার : সর্পপত্রের ফুলের বা ফলের রস উচ্চ রক্তচাপে ব্যবহৃত হয়। পাণ্ডুর টিকিদোষও এটি ব্যবহৃত হয়।

- ৬। **অর্জুন** : অর্জুন হাঝরি থেকে বৃহৎসাকৃতির বৃক্ষ। কাণ্ড সরল উন্নত, মন্থ এবং আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। গাছ থেকে সহজে ছাল উঠানো যায়। পাতা সরল, লম্বা, ত্রিভাঙ্গকৃতি। ফুল হলুদাভ হুদ্রাকৃতির, উন্নত পর্ষাশিষ্ট।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, ছাল, ফল ও কাঠ।

ভেষজ ব্যবহার : কাঁচা পাতার রস আমাশয় রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। অর্জুনের ছাল ভালোভাবে বেটে তার রস তিনি ও দুধের সাথে গ্রহণ করলে সেননে ব্যবতীর জনরোগ আরোগ্য হয়। নিম্ন রক্তচাপ থাকলে অর্জুনের ছাল সেবনে উপকার হয়। হালের রস সেবনে উদরাময় ও অর্শ রোগের উপশম হয়। রক্ত আমাশয়ে অর্জুনের ছালের চূর্ণ দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে নিরাময় হয়। অর্জুনের ছালের মিহি রঁড়া বহুর সাথে মিশিয়ে খুবে লাগালে মেতজ্বর সাপ মিলিয়ে যায়।

- ৭। **হরিতকী :** বৃক্ক জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সফল, একাত্তর, উপবৃত্তাকার, সবুজক। ফুল ধোতকর্ণ ও ছোট হয়। ফল লম্বাকার হালকা বাদামিকৃত।

ব্যবহার্য অংশ : কল ও কাঠ

ভেষজ ব্যবহার : আয়ুর্বেদিক ঔষধ শিকলার অন্তর্ভুক্ত কল হরিতকী। হরিতকী কল চূর্ণ করে একটু লবন মিশিয়ে সেবন করলে অর্শরোগ নিরাময় হয়। হরিতকী চূর্ণ পাইপে ভরে মুচপান করলে হাঁপানি উপশম হয়। যে কোনো ক্ষত হরিতকী গোড়া হাঁহের সাথে মাখন মিশিয়ে লাগালে যা দেরে যায়। তিনি ও পানির সাথে হরিতকী চূর্ণ ব্যবহার করলে প্রোণ ঝাঁ কাটো হয়। কাঁচা ফল আমাশয় এবং পাতাকল রক্তশূন্যতা, পিত্তরোগ, জনরোগ, পেটের ব্যাধ ও গলা ক্ষত ব্যবহার্য। কলচূর্ণ লবুরোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। হরিতকী কলবৃদ্ধিকারক, জীবাণীশক্তি বৃদ্ধিকারক ও বার্ধক্য নিবারণক।

- ৮। **আমলকী :** মাংসবি আকারের বৃক্ক। পাতা বৈদিক, উপশর বিশদ্রীভভাবে বিস্তার। ফুল ছোট, সবুজাভ হলুদ। কল রসাল, হালকা, সবুজ, গোলাকৃতি, সুবাসিতক ও উপাঙ্গের। কাঠ থেকে যে আসে ফুল আসে।

ব্যবহৃত অংশ : ফল

ভেষজ ব্যবহার : আমলকী পাতার রস আমাশয় প্রতিষেধক এবং টনিক। কল তিটমিল সি সমুদ্র এবং শিকলার একটি কল। কলের রস হৃক্ক, পেটের পীড়া, অজীর্ণতা, হৃদয় ও কানিতে বিশেষ উপকারী। আমলকীর কল শিকলার সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে রক্তবৃদ্ধি, জডিস, চর্মরোগ, ডায়াবেটিস, ফুল পড়া, প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

- ৯। **বহেড়া :** এটি একটি শাখা-প্রশাখাবৃত্ত বৃক্কজাতীয় উদ্ভিদ। পাতা একক, বৈটী লম্বা। ফুল সবুজাভ নানা, ত্রিখাকৃতির। ফলে একটি করে বীজ থাকে। কল গোলাকৃতির বা ঈষৎ লম্বাটে।

ব্যবহৃত অংশ : কল

ভেষজ ব্যবহার : শিকলার অন্যতম কল বহেড়া। বীজের শাঁস (বানামের রসো) দুই একটি করে দুখটা অস্ত্র একে গিলে দুইটি করে তিবিরে খেলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়। বহেড়া চূর্ণ সকাল-বিকাল পানিসহ খেলে উপকার হয়। কল পেটের পীড়া, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়াবেটিস ও হৃদয়ে ব্যবহার্য। কল ছর্ষপিত্ত, কুসকুল, সালিকা, গলায় রোগ ও অজীর্ণতার ভালো ঔষধ। বীজ থেকে প্রাপ্ত তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখে এবং ফুল পড়া বন্ধ করে।

১০। মৃত কুমারী : বীজ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা লম্বা কিনারা খোঁচা কাটা, বসাল।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা থেকে নির্গত ঘন পিচ্ছিল রস।

তৈয়্যাক ব্যবহার : পাতা থেকে নির্গত ঘন পিচ্ছিল রস তোলকটিনা রোগের কলত্রসু ঔষধ। এটি ক্ষুধামন্দা, জডিস, সিউকোবিরা, অর্ধরোগ, কট-শোভা ও কতের ডিকিন্সা ফলত্রসু অবদান রাখে। প্রাচীন ব্রহ্মে এর বিশেষ প্রস্বাদের মান উন্নত হয়।

১১। ডেলাকৃত : এটি লতানো বীজ জাতীয় উদ্ভিদ। বন বানান্তে আশনা-আশনি এ গাছ, জন্মতে দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ : কাণ্ড ও পাতা

তৈয়্যাক ব্যবহার : এ উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতার নির্গল ডায়াবেটিস রোগের ডিকিন্সা ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। এর নির্গল সর্পি, ছুর, হাশনি ও হুর্ঘরোগ ডিকিন্সা ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগে এর পাতা কাটার প্রলেপ বেশ উপকারী।

কাজ : ঔষধি উদ্ভিদের নাম ও ব্যবহার নিয়ে নবীম আলোচনা উপস্থাপন কর।

ঔষধি ঔষসম্পন্ন বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা

অতি প্রাচীনকাল থেকে ঔষধি ঔষসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ রোগ নিরাময় উপশমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। আধুনিক ডিকিন্সা শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতির পিছনে ঔষধি উদ্ভিদের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের দিকই ঔষধি উদ্ভিদের মাধ্যমে রোগ নিরাময় খুবই জনপ্রিয়। কারণ ঔষধি উদ্ভিদের ডিকিন্সা ব্যবস্থা সহজলভ্য, সস্তা এবং তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এ কারণে বর্তমানে ঔষধি ঔষসম্পন্ন আত্মবৈদ্য ও ইউনানি ডিকিন্সা ব্যবস্থাও আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আধুনিক ডিকিন্সাব্যবহার উৎকর্ষ দ্রুতই পৌছালেও মানুষ অব্যবহিত সেই প্রাচীন ঔষধি ঔষসম্পন্ন উদ্ভিদের ঔষুধ দ্বারা ডিকিন্সা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। পৃথিবীর বহুক্ষেপে জৈবজ ঔষধের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যাপক গবেষণা শুরু করেছে। কল্যাণে জৈবজ উদ্ভিদের ব্যাপক চাষাবাদ ও যত্নের মাধ্যমে ঔষধিউদ্ভিদের ও ঔষধনৈতিক উন্নয়ন সাধনের সম্ভাবনা খুবই উচ্চ।

কাজ : 'রোগ নিরাময়ে ঔষধি গৃহশাস্ত্র' এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিকল্পন তৈরি করে জমা দিবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন পোকা ধানের সুখ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে ?

- | | |
|---------------|-------------|
| ক. মাজরা পোকা | খ. পানিসোকা |
| গ. গাউপোকা | ঘ. ছুই পোকা |

২. পানী ধানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- পাছ খাটো হয়।
- পান্ডা ছেলানো থাকে
- ফলন বেশি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. কোনটি পাটের কাড় পরে রোপের লক্ষণ?

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ক. কাড়ে কাণো বেটীরা অনেক লাগ থাকে। | খ. কাড়ে পাড় বাগানি লাগ হয়। |
| গ. অক্রান্ত ছাঁপ কেটে যায়। | ঘ. কাড়ে কলচে লাগ হয়। |

নিচের উদ্দেশ্যকটি পড় এবং ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ডাসকি মিয়া একজন পাট চাষি। তিনি এ বছর তার দুই ষথ জমিতে সি-সি-৪৫ ও গ্রিন সুজা গ্রিন জাতের পাটের চাষ করেন। তিনি সি-সি-৪৫ জাতের পাট আশাৎ মানে ৩ গ্রিন সুজা গ্রিন জাতের পাট তিন মাসে কাটেন। তিনি প্রতি ষথ থেকে ১৫০০ টি করে খঁটি পান। পাট জাপ সেওয়ার সময় তিনি ইউরিয়া সার ব্যবহার করেন।

৬. ডাসকি মিয়া দুই ষথ জমির পাট তিন ভিন্ন সময়ের কাটার কাজ-

- কসলের পরিস্ফুট তিলতা হওয়ার
- জমির উর্বরতার পার্থক্যের জন্য
- কসলের জাতের ভিন্নতা থাকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৫. তাসফি মিহর পাঠ পড়ানোর জন্য কত কেজি ইউরিয়া প্রয়োজন?

ক. ১৫ কেজি

খ. ২০ কেজি

গ. ২৫ কেজি

ঘ. ৩০ কেজি

সুজনশীল প্রশ্ন

১. আতশা বেগম বিল অঞ্চলে উঁচু ভিটে বাড়িতে বসবাস করেন। খুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ির আশেপাশে ৫ শতক জমিতে পালংশাক চাষ করে সফলতা লাভ করলেন। এ সমলতার পর তিনি বিলে অবস্থিত কান্না জমিদারের উঁচু আইলেও পালংশাক চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

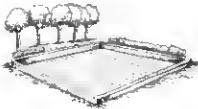
ক. পালংশাকের একটি জাতের নাম লেখ।

খ. পালংশাক চাষে 'ইউরিয়া সার' উপরি প্রয়োগের কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. আতশা বেগম জমিতে কী পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করেছিলেন নির্ণয় কর।

ঘ. আতশা বেগমের পরিকল্পনা তার কৃষি কার্যক্রমকে কীভাবে প্রভাবিত করবে বিশ্লেষণ কর।

২.



চিত্র - ক



চিত্র - খ

- ক. সম্ভবিত চাষ কাজে বসে ?
- খ. সম্ভবিত চাষে জমির ব্যবহার বিভণ হয় কীভাবে ? ব্যাখ্যা কর :
- গ. চিহ্ন ক ও খ-এ উদ্ভিতির পদ্ধতির মধ্যে কোনটির উৎপাদন করা কমে কারণ ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. পরিবায়ের আয় ও পুষ্টি বৃদ্ধির চিহ্নে উদ্ভিতির কোন পদ্ধতিটি উল্লেক-বৈজ্ঞানিকতা ব্যাখ্যা কর ।
৩. মেঘদার গ্রীষ্মের বাসিন্দা কৃষক ভোগ্য ভর দুই একর জমিতে পাট চাষ করলেন । কিছুদিন পর তার পাটের জমিতে ঐচ্ছানুভ এক ধানের শোকার ব্যাপক আক্রমণ হলো । ভোগ্য বিভলিত না হয়ে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শোকা নরন করলেন । ফলে তার জমিতে পাটের আলাতীক উৎপাদন হওয়ার পরবর্তী বছর এলাকার অন্যান্য কৃষকরা তাদের জমিতেও পাট চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ।
- ক. পাটের জাত উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী ?
- খ. আভাবিক হারার ক্ষেত্রেও পাটের বীজ বেশি ঘোষার কারণ ব্যাখ্যা কর ।
- গ. কৃষক ভোগ্য অঙ্গীর জমিতে শোকা নরন পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. কৃষকদের সিদ্ধান্ত ঐ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটুকু সুকল বয়ে আনবে তা মূল্যায়ন কর :

পঞ্চম অধ্যায়

বনায়ন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বনভূমিতে গাছা-পানো, পরিচর্যা ও সংরক্ষণকে কলা হয় বনায়ন। বনায়নের ফলে বনভূমি হতে সর্বাধিক বনজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বসন্তবৃষ্টি, বিভিন্ন প্রাণিসম, সড়ক ও বাতের ধার, পাহাড়ি অঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত উপায়ে সৃষ্টিত বনায়নকে কলা হয় সামাজিক বনায়ন।

বাস উপযোগী পরিবেশ তৈরি ও তা সংরক্ষণে বনের ভূমিকা অপরিহার্য। কোনেও দেশের বা অঞ্চলের বিদ্যুৎ এলাকাছাড়া বড় বড় বৃক্ষশ্রেণি ও লতা-শৃঙ্গের সহায়তায় গড়ে উঠে। অন্যকোন বনভূমি কলা হয়। এসব বনভূমি কখনো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয় ও গড়ে উঠে। আবার কখনো মানুষ তার প্রয়োজনে বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকে। প্রাকৃতিক জরসাহ্য রক্ষার একটি সেতের মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ এরোজনের তুলনায় খুবই কম। সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১৭ ভাগ। ইউনেস্কোর মতে বর্তমানে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ শুধুমাত্র ১০ ভাগ। এ অধ্যায়ে আমরা আমাদের দেশের বন্যজালের বিস্তৃতি, ধারণ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব। এছাড়াও কন সংরক্ষণ বিধি, কন মার্গারি, কন মার্গারির বীজ, বৃক্ষ কর্তন ও কণ্ড সংরক্ষ এবং উপকূলীয় বনায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।



চিত্র : উপকূলীয় কন

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের নাম উল্লেখ করতে পারব।
- বিভিন্ন বনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- বন সংরক্ষণ বিধি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বন নার্সারি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বন নার্সারির বীজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বন নার্সারি তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অড়া বা কাঠ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- গোল কাঠ বা অড়া পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংরক্ষণের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উপকূলীয় বনাঞ্চলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উপকূলীয় বনাঞ্চলের অন্য ব্যবহৃত নামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- উপকূলীয় বনাঞ্চলের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারব।

এখব পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের বনাঞ্চলের বিস্তৃতি

বন একটি দেশের মূল্যবান সম্পদ। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির আয়তন প্রায় ২২.৫ লক্ষ হেক্টর। বনভূমির এ পরিমাণ দেশের মোট ভূমির শতকরা ১৭ ভাগ। এই বন সারাদেশে সমানভাবে বিস্তৃত নয়। অধিকাংশ বনভূমি দেশের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ খুবই কম।

অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ধরন

বনভূমির অবস্থান ও বিস্তৃতি অনুসারে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হলো-

১। পাহাড়ি বন ২। সমভূমিভূমির বন ৩। মহানদীভূমির বন ৪। সামাজিক বন ৫। কৃষি বন

নিম্নের ছক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ দেখানো হলো—

অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বনাঞ্চলে (লক্ষ হেক্টর)

বনের ধরন	প্রাকৃতিক বন	কৃত্রিম বা সুশিক্ষিত বন	মোট
পাহাড়ি বন	১১.০৬	২.১০	১৩.১৬
ম্যানগ্রোভ বন	৬.১৬	১.০৪	৭.২০
সমতল ভূমির বন	০.৮৭	০.০৬	১.২৩
গ্রামীণ বন	-	২.৭০	২.৭০

বনাঞ্চলের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

পাহাড়ি বন

আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি বন অবস্থিত। বাংলাদেশের বন এলাকার অর্ধেকেরও বেশি এলাকা ছুড়ে রয়েছে পাহাড়ি বন। কক্সবাজার, রাঙামাটি, বাপারঝাল, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে এ বন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

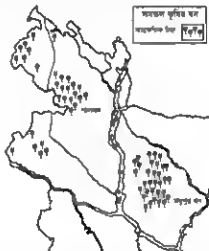
বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পাহাড়ি গাছ হচ্ছে— পর্জন, রাজককড়ই, চাপলিশ, ফেলসুর, কড়ই, গামার, চম্পা, জাহুল, সেগুন, বন্য আম প্রভৃতি। পাহাড়ি বন এলাকার দানা ধরনের বাঁশের জলো থাকে। এসব বাঁশের মধ্যে ববাক, মুলী, উরা, হরাল, ভট্টা, কেইয়া, নাল প্রভৃতি। পাহাড়ি বনাঞ্চলে ছাতি, বানর, শুকর, ভালুক, কুমুদুগি, শিয়াল, মেকড়ে, কর্ণবিড়ালি প্রভৃতি বন্য প্রাণী বাস করে। বিভিন্ন রকমের পাখি ও বীট পতঙ্গ পাহাড়ি বনাঞ্চলে দেখা যায়। বড় বড় গাছপালা ছাড়াও লতা-ভালুর অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ পাহাড়ি বনাঞ্চলে জন্মে থাকে। দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু ও পরিবেশের উপর পাহাড়ি বনের ঘর্ষণে প্রভাব রয়েছে। এ বনের পরিমাণ ১৩.১৬ লক্ষ হেক্টর।



চিত্র : পাহাড়ি বন

সমতলভূমির বন

বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা অঞ্চলের বনকে সমতল ভূমির বন বলে। এ বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ পাল ও পছরি, এছাড়া কড়ই, খেঁইনটী, ছত্রপল ইত্যাদি বৃক্ষও এ বনে জন্মে থাকে। সমতলভূমির প্রাকৃতিক বনের কাছাকাছি বসতি থাকায় এ বনের উপর মানুষের চাপ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক স্থান কনশূন্য হয়ে পড়েছে। সরকারিভাবে এসব এলাকার সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জনশ্রমের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কোনো কোনো স্থানে সামাজিক বনায়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ বনের লক্ষ্য করে খুবই উল্লেখ্যমানের হয়ে থাকে। পুঁই নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরি ও অন্যান্য নির্মাণ কাজে পাল কাঠের ব্যবহার করা হয়। এ বনের বন্য প্রাণী প্রায় ফলে হয়ে গেছে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অল্প সংখ্যক সেকড়ে, হরিণ, বানর, সাপ, ঘুঘু, সোয়েল ও শালিক দেখা যায়। এ বনের খেঁই পরিমাণ ১.২০ লক্ষ হেক্টর।



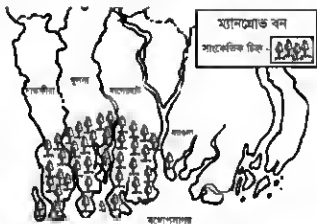
চিত্র ১. সমতলভূমির বন

হ্যান্ড্রোপ্ট বন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এ বন অবস্থিত। প্রত্যেক সাপ্তাহিক জেলাবারে পানিতে এ বন প্লাবিত হয় বলে একে পোনা পানির বনও বলা হয়। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বার্ষেখহাট জেলার দক্ষিণের কিছুই এলাকা হ্যান্ড্রোপ্ট বনে পরিচিত। এ বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরি। সুন্দরি বৃক্ষের নানানুসারে এ বনের নামকরণ করা হয়েছে সুন্দর বন। এ বনের অধিকাংশ উদ্ভিদের উর্বরিত্বীয় ব্যাবহার মূল রয়েছে। যার সাহায্যে এরা খসন ক্রিমায় জন্য অগ্নিজেন গ্রহণ করতে পারে। কারণ জলাবদ্ধ মাটি থেকে সাধারণ মূলের পক্ষে অগ্নিজেন গ্রহণ সম্ভব নয়। এ বনের গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ হলো- খেওলা, পরান, পতর, কেওলা, বাইন, কাকড়া, গোলপাতা ও মোটা বেত। বিখ্যাত রঙেল বেক্স টাইগার এ বনে বাস করে। ডিতাবাঘ, হরিণ, বানর, অজগর, বিভিন্ন

বকমের পাখি ও কীট-পতঙ্গ এ বনে বাস করে। সুন্দর কান্নের নদী ও গাঙ্গে কুমির ও অন্যান্য জলাজ প্রাণী বাস করে। প্রতি বছর সুন্দরবন থেকে শতর সশু ও হেংব পাওয়া যায়। সুন্দর বন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বন। পৃথিবীর সর্বাধিক বড় ও সম্পদশালী স্থানমধ্যে বন হলো সুন্দরবন। এ বনের মোট আয়তন ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের এটি জায়গায় স্থানমধ্যে বনভূমি রয়েছে। অর্থাৎ- ১। চকোবিয়া সুন্দরবন ২। টেকনাফ উপকূল ৩। সুন্দর খুলনার সুন্দরবন।



চিত্র : স্থানমধ্যে বন

প্রাণীবন। বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে প্রাণী বন রয়েছে, মানুষ বসতিভিটা, পুকুর, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের পাশে এসে বন গড়ে তোলে।

কাজ - ১ বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নিম্নের কাজের কাজটি পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করবে।

বনের নাম	অবস্থান	উদ্ভেদযোগ্য উদ্ভিদ	বসবাসকারী প্রাণী
১। গাছাড়া বন			
২। সমতল ভূমির বন			
৩। স্থানমধ্যে বন			

কাজ - ২ শিক্ষার্থীরা খানিকটা সবে বিভিন্ন বনের অবস্থান চিহ্নিত করবে।

বনভূমিতে মছদ কাঠের পরিমাপ

জরীপ ও সমীকার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বনভূমিতে মছদ কাঠের পরিমাপ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বনে মছদ থাকে; কাঠের পরিমাপকে গ্রোথিং স্টক বলা হয়। এই গ্রোথিং স্টক এর পরিমাপের উপর ভিত্তি করেই বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন বনভূমিতে সমীকার প্রাপ্ত কাঠের পরিমাণ নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো।

বন ভূমিতে মছদ কাঠের পরিমাপ

বনের ধরন	মছদ কাঠের পরিমাপ মিলিয়ন* বন মিটার
পাহাড়ি বন	২০.৭১
খানসোজ বন	১২.৩২
সমতল কুমির বন	১.২০
গ্রামীণ বন	৫৪.৬৮
মোট	৮৮.৯১

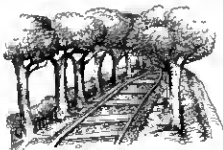
* মিলিয়ন = ১০ লাখ

বনাঞ্চলের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

সামাজিক বন

সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনার জনসাধারণ সনাক্তি সম্পৃক্ত থাকে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণে যে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়, তাকেই সামাজিক বনায়ন বলা হয়।

বাংলাদেশের বন বিভাগ এরই মধ্যে উপকূলীয় চক্ৰবর্তনসূত্রে খানসোজ বনাঞ্চল সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার অনুসরণ থেকেই সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এতে জনসাধারণ সরাসরি অংশগ্রহণ করছে এবং উপকৃত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় সকল সড়ক, মহাসড়ক ও রেল লাইনের পাশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সমন্বিত ত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকৃতির উন্নতি ও মাঝারি উন্নতিতে সামাজিক বন প্রভাবিত করা হয়েছে।



চিত্র : সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা:

- ১। গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের জন্য কাঠের জোগান দান ও জ্বালানি কাঠের ঘাটতি পূরণ।
- ২। পতিত জমি, বনভূমি, সড়ক, রেলপথ, বাঁধ, খাল বিল ও নদীর পাড়ে, বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানে কনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ।
- ৩। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো এক সাফল্য বিমোচন।
- ৪। পড়াশোনা, শাকসবজি, ফলমূল, চেনার ও বিনোদনের জন্য বন সৃজন।
- ৫। বন উৎপাদিত কাঁচামাল গ্রামীণ কুটির শিল্পে সরবরাহ করা ও জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- ৬। প্রাকৃতিক অবসার্য বৃক্ষ, পরিবেশ সূচক রোম ও ফলিভার রোম করা। ভূমিক্ষয় রোম করা।
- ৭। জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।

কাজ- দলপত্র কাজ

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তার ম্যাপ গোষ্ঠীর কাগজে তৈরি কর।



কনায়নের ধরন ও বৈশিষ্ট্য: কৃষি বন

পরিবেশ বাঁচানো, জ্বালানি সরবরাহ, কাঁচ ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ বৃদ্ধানের জন্য বিশ্বব্যাপী কৃষি বনের প্রসার ঘটছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে কৃষি বনজন পছন্দের মধ্যেই উল্লেখ ঘটছে। কৃষি বনায়ন হলো কোনো জমি থেকে একই সময়ে বা পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন পাত, ফসল ও পত্রপাখি উৎপাদন ব্যবস্থা। সাধারণভাবে কৃষি বনায়ন হচ্ছে এক খরনের সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এতে কৃষি ফসল, পত্র, ইংসা এবং অন্যান্য কৃষি অবশ্য সহযোগে বহু বর্ষজীবী কাঠের উদ্ভিদ জন্মানোর ব্যবস্থা করা হয়।

কৃষি বনায়নের বৈশিষ্ট্য

- ১। একই জমি বারবার ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।
- ২। বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও ফসলের সমন্বিত কাঁচ ও উৎপাদন সৃষ্টি করে যায়।
- ৩। আমাদের উৎপাদন হ্রাসিত্বশীল হয় ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে।
- ৪। সামাজিক ও পরিবেশগত গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।
- ৫। প্রান্তিক ভূমির সম্পদ ব্যবহার হয়।
- ৬। স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারে সুযোগ থাকে।
- ৭। ফসল খামার মালিক, মিশ্র খামার মালিক ও বন বাগান মালিকের চাহিদা পূরণ হয়।
- ৮। কৃষি বনে উৎপাদিত দ্রব্যাদি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যায়।

কৃষি বনায়ন : পদ্ধতি ও প্রকার

- ১। ফসলবন : বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গাছ ও অন্তঃফসল সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন।
- ২। তৃণবন : মিশ্র খামার হয়ে থাকে। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন।
- ৩। কৃষি তৃণবন : ফসলের জোড় চাষ। মাঝে মাঝে বনজ গাছের উৎপাদন করা যায়।
- ৪। কৃষিবন মত্যা খামার : মিশ্র খামার করা যায়। উঁচু নিচু জমি সমন্বয়ে খামার স্থাপন করতে হয়। ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ও মত্যা উৎপাদন করা যায়।

কৃষিবনের প্রয়োজনীয়তা

- ১। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- ২। খালের চাহিদা পূরণ ও বৈশেষিক মুদ্রা অর্জন করা।
- ৩। ফসলি জমির বহুবিধ ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়ে দেয়া।
- ৪। বিরাট জনগোষ্ঠীর কাজের ব্যবস্থা করা ও শান্তি হটানো।
- ৫। এলাকাভিত্তিক কৃষি বজার তৈরি করে গ্রামীণ জনজীবনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন।
- ৬। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার করা।
- ৭। কৃষি গবেষণার ফলাফলভিত্তিক উন্নয়নকে উপস্থাপিত করা।
- ৮। শান্তি-উর্বরতা বৃদ্ধি করা এবং শান্তিভর যোগ করা।
- ৯। পশুখাদ্য উৎপাদন এবং পশু পালন ও উপকারী কীট পতঙ্গের নিরূপণ আদায় তৈরি করা।
- ১০। পরিবেশের তারতম্য বজায় রাখা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা।

কাজ-২ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে দুইটি করে বনে রৈখিক উল্লেখ করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন সংরক্ষণ বিধি

বনভূমির সকল লতাশৃঙ্গ, বৃক্ষরাশি ও বন্যপ্রাণী নিয়ে বনজ সম্পদ গঠিত। এ বনজ সম্পদ একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বনভূমির এসব গাছপালা ও বন্য প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন আন্তঃসম্পর্ক বিরাজমান। কোনো কারণে এর যে কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যগুলোও অপনো-অপনি ক্ষণে হয়ে যায়। কোনো অঞ্চলে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি বা সরু-চিহ্নিত বনাঞ্চল থেকে গাছ কাটা, অপসারণ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধান রয়েছে। এসব আইন বা বিধানকে বন বিধি বা বন আইন বলা হয়। বনভূমির সকল সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য এ উপমহাদেশে ১৯২৭ সালে বন সংরক্ষণ আইন করা হয় যা “বন আইন, ১৯২৭” নামে পরিচিত। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে এ আইনের বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন

করে যা "বন আইন (সংশোধন), ১৯৯০" নামে পরিচিত। এ আইনের পর অর্ধ বন ধ্বংসের প্রবণতা কমে বাটে কিছু পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ১৯৯০ সালের এ আইনকে সময় উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। জনস্বত্বিতে ১৯৯৬ সালে এ আইনের আরও কিছু সংশোধনী আনা হয়। এ আইন বলে বনজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এসব বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বনবিধি বলে আরও যা করতে পারবেন তাহলে-

- ১। সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোনো বনভূমিতে সংরক্ষিত বন পঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।
- ২। এ প্রজ্ঞাপন বলে অভিগ্রহ ব্যক্তি বা অন্যকেসে লালিয়ার প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হতে সূচনাময় তিনমাস এবং অধিক চার মাসের মধ্যে বন কর্মকর্তার লিখিত পিবিভিভাবে লিখে ছাফির হয়ে অভির বিস্তারিত উল্লেখ করে আবেদন করতে পারবেন।
- ৩। সরকার একইভাবে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ছাফির হয়ে সংরক্ষিত কোনো বন বা তার অংশ বিশেষ সংরক্ষিত, রহিত এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

বনবিধির বর্ণনা

এসো আমরা এবার বন সংরক্ষণের প্রচলিত আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ জেনে নেই। এ বিধি বলে নিম্নলিখিত কাজসমূহ লঙ্ঘন করায় বন্য হয়ে পড়ে। যথা-

- ১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত সরকারি বনভূমি থেকে পাখিপলা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ করা।
- ২। অনুমতি ব্যতীত আশাসরকারি বা স্থানীয় সরকারি অর্থ বা মাদকদ্রব্যের সত্ত্বা বা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব জমি বা বাগান হতে কাঠ বা অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজ জেলায় যে কোনো স্থানে প্রেরণ।
- ৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সরকারি বনাঞ্চলে প্রবেশ করা, বনভূমিতে ঘরবাড়ি ও চাষাবাদ করে বনাঞ্চলের ক্ষতিসাধন করা।
- ৪। বনাঞ্চলে পরাণিপত চরানের।
- ৫। প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতীত বনের গাছ কাটা, অপসারণ ও পরিবহন করা।
- ৬। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কৃত্ত ব্যতীত অন্য সময়ে আগুন ছালাসে, আগুন রাখা বা বহন করা।
- ৭। বনের কাঠ কাটার অথবা কাঠ অপসারণের সময় অসাবধানজনকত বনের ক্ষতিসাধন করা, গাছ ঘেঁটে ফেলা, ছিন্ন করা, বাকল ভেঙা, পাতা ছেঁড়া, গুঁড়িয়ে ফেলা অথবা অন্য কোনো প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করা।
- ৮। বনে শিকার করা, গুলি করা, জাল ধরা, পানি বিসর্জ করা অথবা বনে কঁদ পাতা।
- ৯। বনজ দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অপসারণ, পরিবহন ও হস্তান্তর করা।
- ১০। বন কর্মকর্তা অথবা বন রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির কাছে বাধা প্রদান করা।

১১। যথাযথ অনুমতি ব্যতীত কনের মধ্যে পর্ভ খোদা, চুন বা কাঠ কল্যাণা গোড়ালো অথবা কাঠ ব্যতীত অন্য কোনো বনজাত পণ্য সংগ্রহ করা অথবা স্থিতিস্থাপক দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করা, অপসারণ করা।

১২। বিতরণীর বন কর্মকর্তার পূর্বনুমতি ব্যতীত কোনো সংরক্ষিত বনে আগ্র্যেয়ালসহ প্রবেশ করা।

৩৯ আইন লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান

৩৯ আইন লঙ্ঘনের বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। উপরোক্ত আইন ভঙ্গের জন্য ন্যূনতম ছয় মাসের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এসব অপরাধের বিচার প্রথম স্টেপের জ্যাজিস্ট্রেট আদালতে হয়ে থাকে।

কন্যাপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি

কন্যাপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালে একটি আইন প্রণয়ন করেন যা বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ), অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ নামে অভিহিত। এ আইন বলে বিনা অনুমতিতে যে কোনো উপায়ে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, বন্যপ্রাণী প্রজননে বিঘ্ন সৃষ্টি, জাতীয় উদ্যানের সীমানার এক মাইলের মধ্যে কোনো প্রাণী শিকার, বিশেষি প্রাণী আবাসনি বা বিশেষে রক্ষা করা প্রকৃতির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এ আইন লঙ্ঘন করা প্রতিযোগে অপরাধ। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি লঙ্ঘনকারীকে আদালত ছয় মাসের জেলসহ পাঁচশত টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুই বছরের জেলসহ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে। এ আইন ভঙ্গকারীকে আর্থিক জরিমানাসহ বিভিন্ন মের্যাদা জেল সেওয়ার বিধাও রয়েছে। তবে মানুষের জীবন ঝুঁকিতে, কসলের কতি রোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা প্রতিযোগে অপরাধ নয়।

কাজ-২ : বন বিধি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি নিয়ে সলীদ আলোচনা কর। এ সম্পর্কীয় পোস্টার তৈরি করে প্রেক্ষিতে উপস্থাপন কর।

৩৯ সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা

দেশের বিরাটমান বন সংরক্ষণ ও নতুন বন সৃষ্টি করে দেশের কনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি। কারণ বন পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যার দ্রুত অত্যন্ত বেশি। এ অধিক জনসংখ্যার মৌসিক চাহিদা মেটাওয়ার জন্য সীমিত বনজ সম্পদের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। প্রত্যাহিক চাহিদা মেটাওয়ার জন্য মানুষ বনের বৃক্ষসজ্জি ও বন্য প্রাণী উজাড় করছে। বন ধ্বংস হওয়ার কারণে বন্য প্রাণীর আবাসস্থল কতিপয়ে হচ্ছে প্রজন্ম বিধ্বিত হচ্ছে, বাস্য সংকট হচ্ছে। অবৈধ শিকারির কনলে পড়েও বন্য প্রাণী মরেছে হচ্ছে। বনে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ছে। বনজ সম্পদ হুমি ও পাচার করে এক প্রেমির অসামু সৌক বন ধ্বংস করছে। বনের নিকটবর্তী এলাকাবাসী ধীরে ধীরে বন সঞ্চন করছে। বন এলাকার অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে। অসামু চক্র শার্কী এলাকার পাহাড় কেটে, কাঠ পাচার করে পাহাড়ি বন ধ্বংস করছে। এ হাডাও সৃজিত সামাজিক কনের বৃক্ষসজ্জি আবাসস্থল করছে। এর কলে ভূমিক্ষয়, ভূমি ধ্বংসসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বাড়ছে। দেশ পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বনজসম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে কনসার্বেশন বিধি প্রণীত হয়েছে। এ বিধির কার্যকরী প্রয়োগে সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কনবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসংখ্যায় বাড়াতে হবে। বন সংরক্ষণ ও কন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি বাস্তবায়িত হলে অনেক সুফল পওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন নার্সারি

বন নার্সারি

অতিথানিক অর্থে বনজ নার্সারি হলো চারা গাছের আলয় বা চারালয়। নার্সারি হলো এমন একটি স্থান যেখানে চারা স্থানান্তর ও রোপণের পূর্ব পর্যন্ত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি আদর্শ নার্সারি থেকে সুস্থসবল ও সুন্দর চারা পাওয়া সম্ভব। নার্সারিতে বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয়। আবার আধুনিক পদ্ধতিতে কলম থেকেও উন্নতমানের চারা উৎপাদন করা হয়।

নার্সারির প্রয়োজনীয়তা

এমন অনেক বীজ রয়েছে যেগুলো গাছ থেকে করে পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপন করতে হয়। তা না হলে অঙ্কুরোদগমের হার কমতে থাকে। এসব প্রকারটির জন্য নার্সারি একান্ত অপরিহার্য। যেমন- পূর্জন, শাল, রাবার, ডেলসুর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপণ করতে হয়। ভালোমানের বাগান করতে প্রয়োজন উন্নতমানের সুস্থ, সবল চারা। এ ধরনের চারা নার্সারিতে তৈরি করা যায়। আরও বেশকিছু কারণে নার্সারি অপরিহার্য কাহলো-

- সময়মতো উন্নতমানের সুস্থসবল ও বড় চারা পাওয়া যায়।
- বিভিন্ন ধরনের চারা বিপণন ও বিতরণে সুবিধা হয়।
- অনেক চারা একসাথে পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।
- কম পরিচর্যা ও কম খরচে চারা উৎপাদন করা যায়।
- খসড়া ব্যয়ে এ খসড়া খরচে অনেক চারা পাওয়া যায়।

আর্থসামাজিক দৃষ্টিকোণে নার্সারির অবদান

- নার্সারিতে বসজ, ফলজ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়। এর ফলে বৃত্তান্তন বৃদ্ধি পায়।
- নার্সারিতে কাজ করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে।
- নার্সারি স্থাপনা করে অনেক সোকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।
- নার্সারিতে উৎপাদিত চারা দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি কান্টন করা হয়।
- উপকূলীয় সবুজ বেটনী তৈরিতে নার্সারিতে উৎপন্ন চারা রোপণ করা হয়।

বন নার্সারির ধরন

নার্সারির ধরন : নার্সারি বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন- ১. মাধ্যম ভিত্তিক নার্সারি ২. স্থায়ী ভিত্তিক নার্সারি ৩. অর্থনৈতিক ভিত্তিক ৪. খাবার ভিত্তিক নার্সারি

১। মাধ্যমভিত্তিক নার্সারি আবার দুই ধরনের

ক. পলিথ্যাগ নার্সারি

এ ধরনের নার্সারিতে পলিথ্যাগে চারা উৎপাদন করা হয়। পলিথ্যাগ সহজে সরানো যায় বলে চারা পত্রা, বৃষ্টি ও দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করা যায়। পাছ থেকে পাছ রোপে সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে সিবিডুজাবে চারার বয়স নেওড়া যায়।

খ. বেড নার্সারি

নার্সারি তৈরিব এ পদ্ধতিতে সরাসরি মাটিতে বেড তৈরি করে চারা উৎপাদন করা হয়। এ নার্সারিতে এক সাথে অল্প জায়গার অধিক সংখ্যক চারা তৈরি করা যায়। ফলে বীজের অপচয় কম হয়। মৃত্তক বর্ধনশীল চারা উৎপাদন ভালো হয়। কাটিং ও মোথা থেকে চারা উৎপাদন সহজ হয়। চারা উৎপাদনের জন্য বেডের মাটি উর্বর হতে হবে।

২। ছারিচ্ ভিত্তিক নার্সারি দুই ধরনের বেহন-

ক. ছারী নার্সারি

এ ধরনের নার্সারিতে বছরের পর বছর চারা উৎপাদন করার সুযোগ থাকে। ছারী নার্সারির সুবিধা হলো নার্সারির জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন করা যায়। গ্রিন হাউস ও বীজাণুর নির্মূল করা যায় তবে মূলধনের প্রয়োজন বেশি হয়। চারার পরিবহন খরচ বেশি হয়।

খ. অছারী নার্সারি

এ নার্সারিতে চাহিদা অনুযায়ী চারা উৎপাদন করা হয়। অসুবিধাটি হলো এ ধরনের নার্সারি সংরক্ষণে বেগ পেতে হয়।

৩. অকৌশিক ভিত্তিতে নার্সারি দুই ধরনের বেহন-

ক. পার্বেছ নার্সারি

পরিবারিক প্রয়োজন অনুযায়ী ফুল, কল ও কাঠের চারা উৎপাদন করা হয়।

খ. ব্যবসায়িক নার্সারি

এ নার্সারিতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কল, সবুজি, ফুল, কাঠ ও ঠাণ্ডি উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করে বিক্রয় ও সরবরাহ করা হয়।

৪। ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারি

উদ্ভিদের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের নার্সারি করা হয়। বেহন- মেছপনি, সেগুন, রেইনট্রি পাছের চারা উৎপাদনের জন্য তৈরি নার্সারি।

কাজ : শিক্ষাবীরা মনগত জাবে বন নার্সারি পরিদর্শন করে নুচ্ছেন তালিকা তৈরি করবে।

বন নার্সারির বীজ

বনজ উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বীজ হলো উদ্ভিদের প্রথম বংশ বিচারক উপকরণ। ভালো চারা পেতে হলে ভালো বীজ প্রয়োজন। এ জন্য নির্দিষ্ট ওষাণ্ডন সম্পন্ন মাড়গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সম্পূর্ণ বীজ আহরণ থেকে রোপনের পূর্ব পর্যন্ত সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হলে বীজ পোকা-মাকড়, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি দিতে আক্রান্ত হয়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। অতুপাদপন ক্ষমতা করে

যায়। তাছাড়া বীজ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এর গুণাগুণ নির্ণয় করতে হবে। বীজকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করলে পর বাজারজাতকরণ ও বিতরণ করা সম্ভব। এ পাঠে আমরা নির্বাচন, বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি, বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি, বীজ পরীক্ষা ও বীজ বপন পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে জানব।

হাতুপাহ নির্বাচন : মধ্য বয়সী, সুস্থসকল, রোগমুক্ত এবং অধিক ফল উৎপাদনকারী গাছকে নির্বাচন। নির্বাচিত এসব গাছ থেকে উপযুক্ত সময়ে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। ভালো চারা উৎপাদনের জন্য উত্তম গুণাগুণ সম্পন্ন হাতুপাহ থেকে বীজ সংগ্রহ করা অপরিহার্য। আমাদের দেশে এক বা একাধিক উৎস হতে গাছ শনাক্ত করে বীজ সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

- ১) নিজ ও অন্য এলাকায় বৃক্ষের বাড়ি
- ২) পার্ক বা বাগান এলাকা বা কন্যামল
- ৩) হাতুপাহ পাশের বৃক্ষ

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি

সাধারণত দুইভাবে গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

- ১) **ফুটি হতে বীজ সংগ্রহ :** বীজ পাকার পর যখন কিছু বীজ হাড়িয়ে পড়ে তখন বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। বীজ পাকার মধ্যবর্তী সময়ে এ বীজ সংগ্রহ করতে হয়। যেসব গাছের ফল থেকে ফাটে না এবং বীজ ছড়িয়ে পড়ে না সেসব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। সেজন্য, গর্জন, শাল, তখন, শিরবাক, রেলসুর প্রকৃতি উদ্ভিদের বীজ ফুটি থেকে সংগ্রহ করা যায়।
- ২) **গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহ :** এ পদ্ধতিতে বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যখন ফল পরিপক্ব হবে তখন তা না ফুটি দিয়ে গাছের ছোট ছোট ডাল কেটে সরাসরি গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করা হয়। ছোট ছোট বীজ যা হাড়িতে পড়বে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে পারে তাই হতে সরাসরি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সে সব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

ক) পড় জাতীয় - বাগুল, কড়ই, খ) ক্যাপসিউল- মেহেন্দি, ডাল্কা, গ) জেব-পাইন।

গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহের পর গ্যাসে শুকাতে হবে। এরপর পড়, ক্যাপসুল বা কোষ ফাটিয়ে বীজ পৃথক করতে হবে।



চিত্র : মেহেন্দির ক্যাপসুল



চিত্র : কড়ই এর পড়



চিত্র : পাইন কোণ

বীজ নিষ্কাশন : কল সংগ্রহ করার পর বীজগুলোকে শাঁস, আবর্জনা, খোসা ইত্যাদি থেকে পৃথক করাই হলো বীজ নিষ্কাশন। বীজ নিষ্কাশনের প্রধান তিনটি পদ্ধতি হলো-

- ১। **বাছাই পদ্ধতি :** যে সব গাছের অম্লরোগদগ্ধকাল সঠিকের অর্থাৎ ৪-৫ দিন, এসব ক্ষেত্রে বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার হয়। এসব গাছের পেটা ভলাই বীজ হিসাবে বপন করা হয়। যেমন-বারিকেল, গর্জন, শাল, সেজন বীজ। সেজন বীজ বেলে ঢাকলে অম্লরোগের ক্ষয়তা বাড়ে।
- ২। **চকনো পদ্ধতি :** জাবুল, তুলা, ইপিল-ইপিল, হেনজিয়ার, বাবুল মেহগনি, কড়াই গাছের বীজ চকনো পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। পছ থেকে কল পেড়ে আলো করে বেলে চকতে হয়। কল ফেটে যখন বীজ বেহিয়ে আসে, তখন মাড়াই করে বীজ নিষ্কাশন করা হয়।
- ৩। **পালন পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে কল পানিতে পচানোর পর বীজ বের করা হয়। যেমন- আম, কাঁঠাল, বেঁটুল, পেয়ারা ইত্যাদি ঘরে পরে ব্যাঙে চকতে হয়।

বীজ সংরক্ষণ

পাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর পরবর্তী বপন পর্বের বীজ সংরক্ষণ করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ না করলে বীজের জগাভগ সই হয়ে যায়। ফলে বীজের মরনের অবশিষ্ট হয়। যেমন- গর্জন, শাল, সেজন, চাপালিশ, জেলসুর প্রকৃতি গাছের বীজ ওলাসজাত করলে অম্লরোগের ক্ষয়তা হ্রাস পায়। এসব গাছের বীজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই বপন করতে হবে। বীজ অপেক্ষাকৃত হালকা করে বিছিয়ে ভনামজাত করা আবশ্যিক। বীজ সব সময় শুকনো রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে বীজ রাখতে হবে। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ স্বত্বাই বীজ খোসা অবস্থার রক্ষা হয়। আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক তাপমাত্রার এক-২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এ বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

কাজ : বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থাপন করবে।

কন নার্সারি তৈরির কৌশল

ছায়া ও অছায়া উভয় নার্সারি তৈরির জন্যই প্রয়োজন সুস্থ পরিবেশনা ও কিছু নিয়মনিতি।

ছায়া নার্সারি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চারা উৎপাদনের জন্য ছায়া নার্সারি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কন বিভাগ, হার্টিকালচার, বিএডিসির উদ্যান, প্রাইভেট নার্সারি কেন্দ্রগুলো ছায়া নার্সারি। ছায়া নার্সারি স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো-

১। স্থান নির্বাচন

বাণোবাসাসম্পূর্ণ খোশা মেলা উঁচু ভূমি হবে। বর্ষা পানি উঠে না এবং জলাবদ্ধতা হয় না এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। উর্বর বেলে সোয়াংশ বা সোয়াংশ অতি সম্ভব হবে। উন্নত বোলাখোশ ও পানির সুস্থ ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত জমি ও শ্রমিক পাওয়া যায় এমন অংশ নির্বাচন করতে হবে।

২। নার্সারির জায়গার পরিমাপ নির্ণয়

এক বর্গমিটার সীড বেড বা পট বোন্ডের জায়গা নির্ণয়

পলিথায়লের আকার	প্রতি বর্গ মিটারে চাচার সংখ্যা
১৫ সেমি x ১০ সেমি	৬৫ টি
১৮ সেমি x ১২ সেমি	৪৫ টি
২৫ সেমি x ১৫ সেমি	২৬ টি
সীড বেডে চাচার হতে চাচার দূরত্ব	প্রতি বর্গ মিটারে চাচার সংখ্যা
৫ সেমি x ৫ সেমি	৪০০ টি
১৮ সেমি x ১২ সেমি	২০০ টি
২৫ সেমি x ১৫ সেমি	১০০ টি

৩। বেড়া নির্মাণ

অনিষ্টকারী জীবসমূহ ও পখ্যাবীচের হাত থেকে চাচার পাত বক্ষা করার জন্য বেড়া সেতারা ব্যবহার। স্থায়ী মার্সারিতে বেড়া সেতায়ন উপায়-

- ইটের সেতায়ন। স্থায়ী মার্সারির চার দিকে ঠাঁই ইটের সেতায়ন নির্মাণ করে বেড়া সেতয়া যায়।
- কঁটা তারের বেড়া। স্থায়ী মার্সারিতে কঁটা তারের বেড়া সহজে সেতয়া যায়।
- সোহোর জালের বেড়া। সোহোর জাল খুঁটির সাথে বেঁধে দিয়ে বেড়ার পাশ দিয়ে জীবসমূহ পাত সাগানো মতো পারে। কঁটা তারের বেড়ার মতো এ বেড়াকেও তিন ধরনের খুঁটি ২ মিটার অন্তর অন্তর ব্যবহার করা যায়।
- জীবসমূহ বেড়া। মুক্ত, কটা মেহেলী, মেসী, ফেল কলসী প্রভৃতি জীবসমূহ পাত দিয়ে মার্সারির চার দিকে স্থায়ী বেড়া সেতয়া যায়।

৪। ফুমি উন্নয়ন

মার্সারি স্থান নির্বাচনের পর পরই উন্নয়নের কাজ করতে হয়। মার্সারি খেত খেঁচির স্থান উন্নয়নকালে পরিচালনা করতে হবে। মাটি তৈরির সময় খুঁটি বা সেতোর পানি মাঝে মাঝেতে না পারে সে জন্য মাটি ঢালা ও প্রেঁদ করাতে হবে। ফুমির মাটি মোতাশ বা বেলে-সেতাশ হতে হবে।

৫। অফিস ও আবাসিক এলাকা

মার্সারির অফিস মরটি প্রধান রাজ্যের পার্শ্বে মূল সেটের কাছে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন। অফিস ও আবাসিক এলাকা চাচার উৎপাদন এলাকার বাইরে রাখতে হবে। মার্সারি এলাকার ভিতরে আবাসন ঠিক নয়।

৬। বিদ্যুতায়ন

স্থায়ী মার্সারিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা ভালো। এতে মার্সারি স্বকল্যাবেকল সুবিধা হয়।

৭। রাজ্য ও পথ

মার্সারিতে প্রবেশের জন্য একটি প্রধান রাজ্য থাকা আবশ্যিক। প্রধান রাজ্যটি পরিকল্পিতভাবে মার্সারির ভিতরের পথগুলোর সাথে যুক্ত থাকবে।

৮। সেচ ব্যবস্থা

নার্সারিতে চারা উত্তোলনের জন্য পানি প্রয়োজন। সে জন্য নার্সারি স্থাপনের ততুতই উত্তম সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯। নর্দমা ও মলা

নার্সারিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ কারণে প্রয়োজনীয় নর্দমা ও পার্শ্বাঙ্গার ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্থায়ী নার্সারিতে একটো পাকা করতে হবে। নিম্নমিত পরিমাত্র রাখতে হবে।

১০। নার্সারি ত্রুণ

নার্সারির চারা উত্তোলনের স্থানকে করেকটি ত্রুণে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ত্রুণকে আবার করেকটি সীত বেড বা পট বেডে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ত্রুণে ১০-১২ টি বেড থাকতে পারে। স্লিন হাউস সেচ রাখার জায়গা, কমপোস্ট তৈরির পর্ড, যাটি রাখার স্থান ইত্যাদি সুবিধামতোভাবে বিভিন্ন ত্রুণে ভাগ করে দিতে হবে।

১১। নার্সারি বেড

বেড সাধারণত দুই ভকম হতে পারে-

- সরাসরি বীজ বপন করে চারা উত্তোলনের জন্য বেড। এ জন্য জমি ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। জমির যাটি খোলাস বা লাঙল দিয়ে আগলা করতে হবে। সব রকম আগাছা দূরিত পাথর পরিষ্কার করে ভালো করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমিরপর জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ১ মিটার \times ৩ মিটার \times ২০ সেমি আকারে বেড তৈরি করতে হবে। বেড তৈরির পর প্রয়োজনীয় গোবর বা কমপোস্ট ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে কয়েকদিন রেখে সেচের পর বীজ বপন করতে হবে।
- পলিথ্যানে চারা উত্তোলনের জন্য বেড তৈরি। এফেরে মাটিকে চাষ করার প্রয়োজন নেই। কেবল দুটি বেডের মধ্যবর্তী স্থানের মাটি তুলে বেডকে ১০-১৫ সেমি উঁচু করে উপরিভাগ সমান করতে হয়। এরপর বেডের ধার তৈরি করা হয়। তবে নার্সারি স্থানের প্রয়োজ্যতা অনুযায়ী বেডের আকার ছোট বড় হতে পারে।

কাজ-২। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের মিকটবর্তী যে কোনো একটি বনজ নার্সারি পরিদর্শন করতে। নার্সারিতে যে সব বৃক্ষের চারা আছে তার তালিকা তৈরি করে মালগতভাবে শিক্ষকদের কাছে জমা দিতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ

বৃক্ষ নামালের অতিমূল্যবান জাতীয় সম্পদ। অর্থনৈতিক দ্রোহোচ্চলে যেমন বৃক্ষ রোপণ করতে হত তেমনি একই কারণে বৃক্ষ কর্তন করতে হতে পারে। সাধারণত পাহার অর্বর্তনকাল শেষ হলে পাহ কর্তন করা হয়। তবে যেসব পাহ সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে লাগানো হয় সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। পাহ কাটা ও তা থেকে কাঠ সংগ্রহ করার বিষয় অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিগত কৌশল জানা সরকার। পাহ কাটার পর যদি সে পাহকে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা না হয় তবে তা টিয়াই করতে হবে এবং তা থেকে দ্রোহোচ্চলীর পরিবাহণের কাজ বের করতে হবে।

এরপর কাঠের হুটিয় দীর্ঘায়িত করার জন্য কঠোর ব্যবহার উপযুক্ত করা বা সিজনিং করা হয়। বাঁশের হুটিয় দীর্ঘায়িত করার জন্যও সঠিকভাবে প্রক্রিয়াক্রম করার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় কাঠ বা বাঁশকে সিজনিং করে কর্তির কাঠ বা বাঁশের গুণগতমান ও হুটিয়কালে বেশ করেকতন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এ পরিচ্ছেদে আমরা বৃক্ষ কর্তনের সময় ও সিরমাবলি, কর্ত শ্রেয়শন পদ্ধতি, তখন পরিমাণ পদ্ধতি, বৃক্ষকর্তন ও কাঠ সংরক্ষণের উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও সতর্কতা অর্জন করব।

বৃক্ষ কর্তন সময় বা অর্বর্তনকাল

বৃক্ষের দ্বারা রোপণ থেকে শুরু করে যে সময়ে বৃক্ষের বৃদ্ধি সর্বাধিক হয় এবং পাহ পরিপন্থতা লাভ করে ব্যবহার উপযোগী হয়, সে সুসিদ্ধি সময়কালকে অর্বর্তনকাল বা কর্তন সময় বলে। পরিপন্থ হওয়ার আগেই বৃক্ষ কর্তন করলে ভালো মানের কাঠ পাওয়া যায় না। বন ব্যবস্থাপনায় বৃক্ষের অর্বর্তনকালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

- ১। **যত্ন অর্বর্তন কাল** : যে সব পাহের কাঠ সময় এবং দ্রুত বর্ধনশীল জ্বালানি কাঠ পাত খাদ্য ও মৃত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, সেসব উদ্ভিদের কর্তন সময় কম হয়। সাধারণত ১০-২০ বছর অর্বর্তনকালে এসব বৃক্ষ কর্তন করা হয়। যেমন-আকাশমনি, কলম, শিমুল, ডেলিকান, কেওড়া, বাঁশ, বাকলা, খাই, ইপিল ইপিল ইত্যাদি।
- ২। **মাঝারি অর্বর্তনকাল** : আর্থিক শক্ত কাঠ প্রদানি প্রজাতিসমূহ খুঁটি ও কাঠের উৎপাদনের জন্য ২০-৩০ বছর অর্বর্তনকালে কাটা হয়। যেমন-পামার, শিত, আম, কড়ই, খরের বকুল, হরিভতী, হুতিয়ান, চন্দন, রেডি কড়ই বা য়েইনট্রি ইত্যাদি।
- ৩। **দীর্ঘ অর্বর্তনকাল** : শক্ত জাতীয় কাঠ ও দীর্ঘ বর্ধনশীল প্রজাতিসমূহ ৩৫ খুঁটি উৎপাদনের জন্য ৪০-৫০ বছর অর্বর্তনকালে কাটা হয়। যেমন- সেজন, গর্জন, পাল, জাকুল, পীদকড়ই, মেহশনি, তেলসূত্র, চাপালিশ, কাঁড়াল, জাম ইত্যাদি।

বৃক্ষ কর্তনের সিরমাবলি

- পাহ বয়সী সম্ভব সড়িত কাজকরি করতে হবে। কারণ পাহের গোড়ার অংশটা বেশি মোটা হয়। এ অংশে কাঠের মানও ভালো থাকে। সাধারণত ম্যানি ১০ সেমি উপরে পাহ কর্তনে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাঠ পাওয়া যায়।

- পাছ কাটার পূর্বে ভাঙ্গাশালা ছেঁটে নিলে পাছ নিয়ন্ত্রিতভাবে কলতে সুবিধা হয়।
- পাছ সব সময় করাচ দিয়ে কাটতে হবে। এতে কাঠের অংশস পুরপুরি রোধ করা সম্ভব। প্রথমে যে দিকে পাছকে ফেলতে হবে সেদিকে করাচ দিয়ে কাটতে হবে। পরবর্তীতে আগের মতই বিপরীত দিকে করাচ দিয়ে কাটতে হবে এবং কাটা অংশ খিল বা কাঠের টুকরা মুকিয়ে দিতে হবে। এতে পাছ কলিত দিকে পড়বে।
- কাটা পাছ যাটতে পড়ার পর খচিত করতে হবে। তবে কী কাজে কাঠ ব্যবহার করা হবে তার ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারিত করতে হবে। খচিত গোল অংশকে কলা হয় পশ। এ পশকে করাচ কলে দিয়ে দিয়ে ব্যবহার উপযোগী চিরাই কাঠে পরিণত করা হয়। চেরাই কাঠের চেরা, বাহ ও পুহুহ থাকে। চেরাই কাঠের প্রস্থ ১৫ সেমি এর বেশি হলে এক পুহুহ ৪ সেমি হলে তাকে কলা হয় তড়া।
- পাছ কাটার সময় যে দিকে পাছ পড়বে প্রথমে কুড়াল দিয়ে মাটির ১০ সেমি উপরে সেই দিকে দুই-তৃতীয়াংশে কাটতে হবে। পরবর্তীতে কাটা হবে ট্রাক ও কাটার বিপরীত দিকে ১০ সেমি উপরে। এভাবে পাছ ভাটলে পাছকে সুবিধিত দিকে ফেলা সম্ভব হয়। এতে পার্শ্ববর্তী গাছের ক্ষতি কম হয়। কুড়াল/করাচ উভয় ব্যবহার করে পাছ কাটা বেশ সুবিধা জনক।



চিত্র : পাছ কাটার পদ্ধতি

গোল কাঠ ও চিরাই কাঠের পরিমাণ পদ্ধতি

গোলকাঠের বা লগের সঠিক আয়তন বা ভলিউম নির্ণয়নের সূত্রের সাহায্যে বের করতে হয়।

সূত্রটি এরূপ :

$$\text{ভলিউম} = 0.08 \times \frac{(\text{বেড় } ১)^2 + ৪ \times (\text{বেড় } ২)^2 + (\text{বেড় } ৩)^2}{৬} \times \text{দৈর্ঘ্য}$$

এখানে, বেড় ১ = ভিতল প্রান্তের বেড়

বেড় ২ = লগের মাঝখানের বেড়

বেড় ৩ = মোটা প্রান্তের বেড়

দৈর্ঘ্য ৩ বেড় মিটারে বাপা হলে ভলিউম হবে ঘন মিটার।

উদাহরণ : একটি পর্ণন গাছের লগ ৬ মিটার দীর্ঘ। এটির ভিতল মাথার বেড় ১.৫০ মিটার, মাঝখানের বেড় ২.০ মিটার এবং মোটা মাথার বেড় ২.৫ মিটার। লগটির সঠিক আয়তন বা ভলিউম কত?

$$\begin{aligned}
 \text{সমাধান : তলিউম} &= 0.08 \times \frac{(\text{বেড় } ১)^2 + ৪ \times (\text{বেড় } ২)^2 + (\text{বেড় } ৩)^2}{৬} \times \text{সৈর্ষা} \\
 &= \left\{ 0.08 \times \frac{(১.৫)^2 + ৪ \times (২)^2 + (২.৫)^2}{৬} \right\} \times \text{ফনমিটার} \\
 &= \left\{ 0.08 \times \frac{২.২৫ + ৪ \times ৪ + ৬.২৫}{৬} \times ৬ \right\} \times \text{ফনমিটার} \\
 &= \left\{ 0.08 \times \frac{২৪.৫}{৬} \times ৬ \right\} \times \text{ফনমিটার} \\
 &= \left\{ 0.08 \times ২৪.৫ \right\} \times \text{ফনমিটার} \\
 \text{তলিউম} &= ১.৯৬ \text{ ফনমিটার}
 \end{aligned}$$

হাবহার উপযোগী কার্টের পরিমাপ

গোলকাঠ সেরাইকালে কিছুটা অপত্তর হয়। সবটুকু কাঠই হাবহার উপযোগী করা যায় না। গোলকাঠ থেকে কী পরিমাণ হাবহার উপযোগী কাঠ পাওয়া যায় তা হ্রাস এর সূত্রের সাহায্যে বের করা হয়।

$$\text{সূত্রটি এরূপ : তলিউম} = \left\{ \frac{\text{লগের মাঝের বেড়}}{৪} \right\}^2 \times \text{সৈর্ষা}$$

তত্ব : বা সেরাই কার্টের তলিউম মাথা সহজ। সেরাই কার্ট/তলির সৈর্ষা, গ্রহ এবং পুরুত্ব জানা থাকলে অতি সহজেই এর তলিউম বের করা যায়। একটি পরিমাপ কিতার সাহায্যে অতি সহজেই এক খণ্ড সেরাই কার্টের সৈর্ষা, গ্রহ ও পুরুত্ব জানা যায়। তারপর নিম্নের সূত্রের সাহায্যে তলিউম নির্ণয় করা যাবে।

$$\text{তলিউম} = \text{সৈর্ষা} \times \text{গ্রহ} \times \text{পুরুত্ব}$$

সৈর্ষা, গ্রহ মিটারে জানা হলে তলিউম হবে ফনমিটারে।

কাঠ সিজনিং ও ট্রিট্রিমেন্ট

জীবন অবস্থার বৃদ্ধির জন্য পানি অপরিহার্য হলেও কটীর পর কর্তিত বৃক্ষে পানির পরিমাপ হত কম থাকবে কাঠ তত বেশি টিকবে। পানির পরিমাপ যদি কাঠ ওজনকে ১২% এ বামিয়ে আনা যায় তাহলে ধরে নিতে হবে কাঠের ওপলত্ব হান সর্বোত্তম হবে। সহজে দুন্দপেকা, পোকা-মাকড় বা ছত্রাক আক্রমণ করতে পারবে না। বেশি দিন টিকবে নিরস্ত্রিত পদ্ধতিতে কাঠ থেকে পানি বের করে নেওয়ার পদ্ধতিকে সিজনিং বলে। সিজনিং দুইভাবে করা যায়-

১। এয়ার ড্রাইং

পাছ কেটে চিতাই করার পর বাক্যাসে কাঠ চকানোকে এয়ার ড্রাইং বলা হয়। তবে হালকা পাতলা সেরাই করা কাঠ গ্রন্থর রোসে চকালে কাঠ কেটে বা বেঁকে যেতে পারে। তাই একসোকে মাটি থেকে ৩০-৪০ সেমি উঁচুতে ছায়ায় শুকোতে চকতে হয়। এমনভাবে সাজতে হবে যেন প্রতিটি টুকরার চারপাশে সমভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে। কাঠের ছাপি এলোমেলোভাবে বা বঁকা করে সমানো যাবে না। একে করে কাঠ বেঁকে যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে কাঠ সিজনিং হতে কমপক্ষে এক মৌসুম লাগে এবং অল্পতর পরিমাণ ২০% এর কলকাকি থাকে।



চিত্র। এয়ার ক্রাইল

২। কিলন পদ্ধতি

সাধারণত বেশি কাঠ একসাথে সিজান করার জন্য কিলন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিলন পদ্ধতিতে একটি বড় পাকা বায়ুনিবলেক ককে কাঠের তক্তার পরে বা লাগে এবং দুইটি তক্তার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। এ কাঠটি করার জন্য দুইটি তক্তার মধ্যবর্তীস্থানে ৩-৪ সেমি পুরু দুইটি কাঠের টুকরা দুইপাশে বসাতে হবে যাতে দুটি তক্তার মধ্যস্থান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। অতঃপর বায়ুনিবলেক ককে গ্রহণে জলীয়বাষ্প গ্রহণ করিয়ে কাঠের পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পরবর্তীতে তাপ গ্রহণের পরে সে কক থেকেও একই সাথে কাঠ থেকে পানি বের করে নেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সিজানিং করে পানির পরিমাণ ১২% এ বামিয়ে আসা যায়। তবে প্রজাতিভেদে সিজানিং এর সময় কম বেশি হতে পারে।

কাঠ সংরক্ষণ

কাঠ ট্রিট্রিমেন্টের স্পর্শহীন হওয়া প্রবণতায় প্রাসারমিক প্রযুক্তি কাঠ ও বাঁশের মধ্যে চুকিয়ে দেওয়া। সিসিএ (CCA) নামের প্রাসারমিক প্রযুক্তি সংরক্ষণী হিসাবে আমাদের থেকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। সিসিএ সংরক্ষণী ৩টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে ক্রোমিক অক্সাইড ৪৭.৫%, কপার অক্সাইড ১৮.৫%, আর্সেনিক পেট্রা অক্সাইড ৩৪%, সিসিএ এর মিশ্রণ বাজারে পাওয়া যায়। উপাদানগুলো পৃথক পৃথকভাবে কিনে ও আনুষঙ্গিক হয়ে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা যায়। পানিতে মিশ্রণটি ২.৫% প্রবণ তৈরি করা হয়। প্রবণটি বিশেষ তাপ পদ্ধতিতে কাঠের মধ্যে চুকানো হয়। প্রতি ঘনফুট কাঠে সাধারণত ০.৪ পাউন্ড সংরক্ষণী প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠ সংরক্ষণের ৭ দিন পর ব্যবহারযোগ্য হবে। সিসিএ সংরক্ষণী দিয়ে সংরক্ষিত কাঠ পালন প্রতিবেশ করতে পারে। উইশোকার আক্রমণও প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

বৃক্ষ কর্তন সংরক্ষণের উপযোগিতা

পাছ লাগানো ও গাছ মেয়াদি পরিচর্যার মাধ্যমে সেগুলো বড় করে জেলায় পিছনে নামা উদ্দেশ্য থাকে। তবে যে উদ্দেশ্যেই পাছ লাগানো হোক না কেন সুনির্দিষ্ট আবর্তনকাল শেষে পরিপন্থতা লাভ করলে পাছ কর্তন করাই হোক। কারণ নির্দিষ্ট সময় পরে পাছের কাঠের মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় পাছের বাকল কেটে না রোগাক্রান্ত হতে ধীরে ধীরে কালের অত্যন্ত অল্পকাল অতিবাহিত করে থাকে। তাছাড়া পাছ কখন কাটতে হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন-

- ১। কাঠ গিরে কী করা হবে ?
- ২। কোন পরিমাপের কাঠ প্রয়োজন ?
- ৩। কী মাপের কাঠ প্রয়োজন ?
- ৪। এখনই টাকার প্রয়োজন কিনা ?
- ৫। পাছ আরও বড় হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা ভালশালার ছোট ছোট পাতে কিনা ?
- ৬। বড় পাছের ডাল কেড়ে বা পাছ উপড়ে পড়ে ছুপনা বা মানবাসের ক্ষতিত কারণ হতে পারে কিনা ?
- ৭। পাছ কোনো বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা ?
- ৮। পাছের আবর্তন কাল শেষ হয়েছে কিনা ?

যে কারণেই পাছ কাটা হোক না কেন নির্দিষ্ট সময় কাল মেলে কাটতে হবে। পাছ ও সঠিক নিয়মে কর্তন এবং প্রতি বছরের মাধ্যমে অপর্যাপ্ত রোগ করা হয়। আর ব্যবস্থারের আগে বিজ্ঞান সম্মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এরমতো গাছকাটা করা হয়। বৃক্ষ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কতগুলো সময় অনুসরণ করতে হবে। কোনো বন এলাকার বছরে কী পরিমাণ কাঠ বৃদ্ধি পায় সব সময় তার চেয়ে কম কাঠ আহরণ করতে হবে। এর কালে বনজ সম্পদ সংরক্ষিত হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে খোল কাঠ বা ডাল পরিমাপ করে পরিশোধের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখে জমা দেবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ উপকূলীয় বনায়ন

উপকূলীয় বনায়নের ধারণা

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে লবণাক্ততা ও উপকূলীয় প্রাকৃতিক সুরক্ষার ফলে প্রাকৃতিক হয় রক্ষা ও সৃষ্টি স্থানীয় মুখে পড়িত হয়েছে। এসব উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য সারা দেশের পরিবেশের উপর নান্য ভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অতীত বিপুল উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা রোধী, জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে টিকে থাকতে পারে এমন বৃক্ষ প্রজাতি রোপণ এবং লবণাক্ততা সনাক্তকারী ফসলের চাষ করে উপকূলীয় সমুদ্র বেড়ী সৃষ্টি করা আবশ্যিক। এ পরিস্থিতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে প্রাকৃতিক সুরক্ষার কবল থেকে মানুষ, পশু-পাখি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা স্বাভাবিক উপকূলবাসী আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে।

উপকূলীয় বনায়নের জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য (খাট পাত ও সেবাদালগাছ)

উপকূলীয় বনাজালকে পোশাঘাটের অঞ্চলও বলা হয়। পোশা ঘাটের অঞ্চল বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, মেঘনা, বরিশালের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা ও ভদ্রাবাসী জেলায় পড়ে চতাকালসমূহ। এসব অঞ্চলের প্রধান প্রধান বন বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ - নারকেল, আমড়া, বেহুড়, বাকলা, কাছুরাশা, শিরিষ, মেইগা, তাল, বেঁকুল, সুপারি, জলপাই ইত্যাদি। তবে উপকূলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ হিসাবে খাট ও সেবাদালগাছও উল্লেখযোগ্য। এসব উদ্ভিদের মূলক বৈশিষ্ট্য থাকার লবণাক্ততা সহ্য করে উপকূলীয় আবহাওয়ার সাথে সবচেয়ে খাপখাইয়ে দিতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলের অধিক সোনাগুড় ঘাটতে সুপারি, পেঁগা, ফেঁগা, কাঁকড়া, বাঁহ, পলাশ, সোলাপাড়া ইত্যাদি ভালো জন্মে। লবণাক্ততার সাথে খাপখাইয়ে এসব উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

- উপকূলীয় বনায়নের জন্য বেশি এলাকা জুড়ে শিকড় বিস্তৃত থাকে এরকম গাছ নির্বাচন করতে হবে। এ জন্য উপকূলীয় বনে নারকেল, সুপারি বা অন্যান্য একবীজপত্রী উদ্ভিদের পরিমাপ বেশি থাকা যাকার। এদের শিকড় অনেক এলাকা জুড়ে থাকে বলে মাটি কম রোধ করা সহজ হয়। তবে উপকূলীয় বাঁধের বনায়নের ক্ষেত্রে সতর্কের পরিবেশ মতো একাধিক করে গাছ লাগাতে হবে। এতে মাটি কম কম হবে।
- অন্যান্য বাঁধের মতো উপকূলীয় বাঁধের ক্ষেত্রে বেঁকুলে গাছ লাগাতে হবে সে স্থান বেশ ভাল হয়। তাই লাগিবদ্ধভাবে গাছ লাগাতে হবে। প্রথম লাইন যেখানে তল্লাহে দ্বিতীয় লাইন তার দূরত্বের সা হয়ে মধ্যবর্তী স্থান থেকে শুরু করা হয়। দূরে দূরে আর লাগাতে হলেও প্রকৃত পক্ষে একটি রাসা থেকে অন্য রাসার দূরত্ব হবে ২ মিটার \times ১ মিটার। এর ফলে মাটির ক্ষয়প্রাপ্ত কমে যাচ্ছে।
- উপকূলীয় উদ্ভিদের সমুদ্র বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন পাতার ডিম্বাকৃতির গুণ খুব পুরু হয়। এ কারণে এসব উদ্ভিদ খুব প্রতিরোধক হয়।
- ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোনের মতো সুরক্ষা সোনাগুড় করে টিকে থাকতে পারে। কারণ এসব উদ্ভিদের ফল বেশ লম্বা ও পাত বড় এবং শাখা-প্রশাখা কম হয়। যেমন- নারকেল, পলাশ, বেহুড়, তাল, খাট,

আকাশমনি, বাসলা, দেবদারু প্রভৃতি।

- উপকূলীয় বাঁধসমূহ দুর্গোপেক্ষ সময় পর-ছাপনের আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কাজেই গাছপাশোনের সময় গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয় এরকম গাছও লাগাতে হয়। যেমন- ইপিল-ইপিল, আকাশমনি, খৈজা প্রভৃতি।
- যে সব উদ্ভিদ জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে উপকূলীয় কনায়নের জন্য যে সব উদ্ভিদ লাগাতে হবে।
- উপকূলীয় বনায়নে শক্ত ও লম্বা কাণ্ড এবং ছোট পাতা ও ভালপলা কর্তন সহনীয় গাছ নির্বাচন করতে হবে। যেমন:- শিত, ব্যবদা, কড়ই, পেছুর, ভাল ইত্যাদি উদ্ভিদ।

খাট গাছ

কর্ণি : খাট খুবজাকার তিনসবুজ বৃক্ষ। উচ্চতা ১৫-১৮ মিটারের মধ্যে হয়ে থাকে। বাকল যাদামি ও অমসৃণ। খাট খুব শক্ত তবে ফেটে যায়। যে বাসে কুল হয়। কল পাকতে এক বছর সময় লাগে। খাট গাছ কনায়নের জন্য জেলমাটি খুবই কার্যকরী।

প্রাচীরদ্বন্দ্ব : প্রচলিত উপকূলীয় এলাকা তবে বেশের বিভিন্ন স্থানেও খাট গাছ লাগে থাকে।

বীজ : মে-জুন মাসে-বীজ সংগ্রহ করা হয়।

চারা উৎপাদন : ফেব্রুয়ারি মাসে কচিয়ার চারা উৎপাদন করা হয়।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি : কল সরাসরি গাছ থেকে পাকতে হয়। ভাসের পোকুর ফল ভালো পরিপক্ব হয়ে তাই এ কল সংগ্রহ করা উত্তম। ২-৩ দিন রোতে গন্ধিরে লারী গিড়ে মাকুই করে বীজ খোসা থেকে আলাদা করা হয়।

বীজ সংরক্ষণ : বীজ রোলে গন্ধিরে বায়ুচোখক পায়ে ৫-৭ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

বীজ বপন পদ্ধতি

জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি মাসে বীজ তখন অথবা পলিব্যাগে বীজ বপন করা হয়। বীজতলা ও পলিব্যাগে পরিশোধিত বাগির সাথে মিশিয়ে বীজ বপন করা সুবিধাজনক। বীজ পর্যায়ে ২৫-৩০ দিন সময় লাগে। চারা গজানোর আগেই চারা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪০-৫০ দিন পর চারা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়ে ফেলাতে হবে।

চারা বাছাই ও রোপণ পদ্ধতি

বীজ তদারকি অতিরিক্ত চারা গজালে কিছু চারা কুলে ফেলাতে হয়। অপাছা বাছাই করতে হয়। পলিব্যাগে চারার শিকড় পলিব্যাগের বাইরে এলে কেটে নিতে হয়। খাট গাছ মূল বর্ধনশীল গাছ। ৬ মাস বরসী বড় চারা রোপণ করা উত্তম। বাগিরদাঙি ও লোনা মাটিতে খাট গাছ লাগে হয়। এ জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের কনায়নের খাট গাছ লাগানো হয়।

ব্যবহার

কোণাকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায় সৌন্দর্যের জন্য সড়ক, অট্টালিকার পাশে রোপণ করা হয়। মাটিতে নাইট্রোজেন উপাদানের ক্ষমতা থাকায় এ গাছ উপকূলীয় অঞ্চলে বেশি লাগানো হয়। ছাদামি হিসাবে এ কাঠ উৎকৃষ্ট। কাঠ খুব শক্ত তাই খুঁটি ও ঝড়িকঠ হিসাবেও ব্যবহার হয়।

সেবাদার

বর্ণনা : ডিম হরিৎ বৃক্ষ, কাণ্ড মোটা, সোলা ও অতি উঁচু হয়। সম্মতগত শোভাবর্ধন হিসাবে রোপণ করা হয়ে থাকে। পাই ৫০-৬০ মিটার লম্বা হয় এবং ৫০০-৬০০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। পাতাগুলো পাত্ সসুজ, বৈশিক, দেখতে অনেকটা বর্ষা মতো কিন্তু কিনারা ডেউ বোলাতো। সাধারণত অক্টোবর মাসে ফুল হয়, তারপর ফল এবং পাত্রে দেহিতে। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এ পাই পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময় : জুলাই-আগস্ট।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি : পাকা ফল কাটো উত্তের হয়। ফল থাকলে পাই থেকে বা পাই ডলা থেকে সংগ্রহ করে বস্তায় বেখে পতিয়ে পানিতে ধুয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। সেবারু বীজ সংরক্ষণ করা যায় না বলে সংগ্রহ করার সাথে সাথে তা বীজ ডলায় বা পলিথ্যাগে বপন করতে হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি : প্রতি পলিথ্যাগে ২টি করে বীজ বপন করতে হয়। প্রাথমিকভাবে ছায়ায় ব্যবস্থা করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম হার শতকরা ৯০ ভাগ। ৭-১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন হয়।

চারা বয়স রোপনের সময় : সেতু থেকে দুই বছর বয়সের চারা সড়কের পাশে, বাগানের ও উপকূলীয় অঞ্চলে ছুস-ছুলাই মাসে রোপণ করা উচিত।

ব্যবহার : সেবাদারু কাঠ ফলক ও নরম। টিনের ধাতের ফ্রেম, পাটাতন, দেপলাই ও প্যাকিং বস্ত্র তৈরিতে সেবাদারু কাঠ ব্যবহার হয়। কাশজের মত তৈরিতেও সেবাদারু কাঠ ব্যবহৃত হয়।

উপকূলীয় বনাঙ্গনের উপযোগিতা

উপকূলীয় বনাঙ্গনের মাধ্যমে সবুজ বেটী তৈরি ও তা সংরক্ষণ করা গেলে বহুবিধ উপকার সাধিত হবে। উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা, সাইক্লোন ও টর্নেডোর প্রকোপ থেকে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষা করা। জ্বালানি ও বাসোক্ত রাহিলা মেটালের, অর্থ উপার্জন, ভূমিক্ষয় রোধ ইত্যাদি প্রয়োজনে উপকূলীয় বনাঙ্গন সৃষ্টি ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত অপরিহার্য। উপকূলীয় বনাঙ্গনের উপযোগিতা সমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নরূপ উপারে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ক) পরিবেশগত উপযোগিতা

- এ ফলকালের সুক্ষমাক্তি উপকূল অঞ্চলের ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ভূ-পিরহ পানির স্তর বৃদ্ধি করে।
- ভূমির লবণাক্ততা হ্রাস করে পরিবেশ জীববহুলের মাল উপযোগী করতে সাহায্য করে।
- পরিবেশের অন্ত্রিভেদ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে, উষ্ণতা সৃষ্টি রোধ করে এবং মাতাস পরিশোধন করে।
- উপকূলীয় সবুজ বেটী উপকূলীয় অঞ্চলে সৃষ্ট সাহুস্রিত বড়, জলোচ্ছ্বাস ও সাইক্লোনের ফল থেকে মানুষ ও জীব জন্তুকে রক্ষা করে।
- ভূমিধস, ব্যাপ্তিগতি ও বড়ত্যাগ করে এবং বৃষ্টিপাত হতে সহন্যতা করে।

- এ বনাঞ্চল মানুষ, পাখি, জীবজন্তু ও পোকাকীটের নিরাপদ আবাস তৈরি ও রক্ষা করে এবং বাসোয় ঘোণান দেয়। কলে অর এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে।
- উপকূলীয় বনায়ন আমাদের স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সুক্ষ্মরূপে ও এর জীবজন্তুকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবী বিখ্যাত স্থানান্তরিত বন হিসাবে খ্যাত এ সুন্দরবনকে রক্ষা করতে উপকূলীয় সাতনরা বেটনী সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই।

খ) মাছনিক উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের ফলে যে নির্ভল সমুদ্র বেটনী তৈরি হয় তার মাছনিক সৌন্দর্য অতুতপূর্ণ। এ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিশেষের বহু ভ্রমণ বিলাসী মানুষের সমাগম ঘটে। হরেক রকম পতপাখির আবাসস্থল তৈরি হয় যা পরিবেশের অসীম উপকার সাধন করে এবং মাছনিকতার নবতর সংবেদন ঘটায়।

গ) অর্থনৈতিক উপযোগিতা

- উপকূলীয় বনাঞ্চলে বৃক্ষজাত অর্থনৈতিক উপযোগিতা অপরিণীম। এ বনাঞ্চলে প্রদমনকারী দেশ-বিশেষের পর্যটকদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথ সম্প্রসাধিত হয়। বার কলে জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।
- কলজ উদ্ভিদ বেবন- মায়িকেল, পেছুর, ভল, ভলা, আম প্রভৃতি থেকে উপপালিত কল উপকূলীয় মানুষের বাসোয় গ্রাহিনা পূরণ করে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়।
- বনাঞ্চলে উপপালিত মধু ও মোম থেকে অর্থ উপার্জিত হয়। ফুল, ফল ও পত্রবতজ থেকে বালাশগা, শাকসবজি, পাখির খাদ্য, পতখলা পাওয়া যায়।
- উদ্ভিদজাত কাঠ ও লতা থেকে জ্বালানি কাঠ, খুঁট, আসবাবপত্র, ছরবাড়ি, খানকাহন, কৃষি উপকরণ, রেলওয়ে শ্রিশার ইত্যাদি পাওয়া যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নলপত্রভাবে উপকূলীয় বনাঞ্চলের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ-

ক. ১২.১৬ লক্ষ হেক্টর

খ. ১৩.১৬ লক্ষ হেক্টর

গ. ১৪.১৬ লক্ষ হেক্টর

ঘ. ১৫.১৬ লক্ষ হেক্টর

২. নিচের কোন বৃক্ষের পাহাড়ি বনের?

ক. গর্জন, গরাল, গামার।

খ. গজারি, গেওরা, সেতল।

গ. তেলসুন্দ, চম্পা, চাপপিতা।

ঘ. আশুল, রেইনট্রি, পতল।

৩. বাংলাদেশের অধিকাংশ বনভূমি অবস্থিত-

i. দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে।

ii. দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে।

iii. উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্ভিদপত্রটি পত্র এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

জিয়া টেমিডিশনের একটি ছাত্তেলে খসে উল্লম্ব প্রাচীনা চিত্র দেখছিল। এক পর্যায়ে সে দেখতে পেল ঐ ঘরের অধিকাংশ পাহাড়েরই অধিবাসনগর ফল গাছে থাকা অবস্থায়ই হচ্ছে এবং তারা পাহা গজাঘোর পর তা মাটিতে পড়ে আসায় সেখানে থাকে।

৫. জিয়ার দেখা অধিবাসনগর নিচের কোন উদ্ভিদে দেখা যায়?

ক. গরাল

খ. গামার

গ. গর্জন

ঘ. গজারি

৬. জিয়ার দেখা বন্যজলের বৈশিষ্ট্য হলো -

i. ছাতি কর্ণস্বাক্ষর থাকে।

ii. বায়ুবিদ্যুৎ বিদ্যমান।

iii. বায়ুশূন্য দীর্ঘ হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন

১. জামান সাহেব কৃষি কার্যকর্তার পরামর্শ মতে তার বাড়ির দক্ষিণ দিকে পুকুর পাড়ে উঁচু ও শক্ত জমিতে মেনজিয়ার বীজ রোপণ করেন। এ জন্য তিনি ১৫ সেমি \times ১০ সেমি আকারের পলি ব্যাগ ব্যবহার করেন। এতে করে জামান সাহেব ব্যাপক সফলতা লাভ করেন।

ক. সার্গারি কাকে বলে?

খ. সার্গারি ছাপনের যন্ত্রোচ্চনীয়ার ব্যাখ্যা কর।

গ. জামান সাহেবের সার্গারির চার'র সংখ্যা নির্ণয় কর।

ঘ. জামান সাহেবের সফলতার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. সুকিরা বেগম বাড়ি তৈরির সময় বৃহৎ ব্যবহারের জন্য ২০ বছর পূর্বে লগোনা দুইটি মেহনদি পাছ কেটে ফেলেন। পাছ দুইটি কাটার সময় প্রমিকরা কুমার ব্যবহার করেন। তার পাছ ২টির শেষের দৈর্ঘ্য ছিল ৮ মিটার, ডিকন মাথার বেড় ২ মিটার, গালের অংশের বেড় ২.৫ মিটার ও মোটা মাথার বেড় ছিল ৫ মিটার।

ক. কঠি সিজনিং কী?

খ. আবর্তন কালের ভিত্তিতে পসার, শিত কোন ধরনের উদ্ভিদ ব্যাখ্যা কর?

গ. সুকিরা বেগমের একটি পাছের অপটিম নির্ণয় কর।

ঘ. সুকিরা বেগমের গৃহীত কার্যক্রমটি সঠিক ছিল কি না বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় কৃষি সমবায়

একই উদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে কোনো কাজ করা সমবায়। কৃষিক্ষেত্র জন্য এয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ, কৃষি যান্ত্রীকরণ, কল্যাণ উৎপাদন, সংরক্ষণ, সংগ্রহ উত্তর কল্যাণ পরিচর্যা, ঋণায়োজ্যাকরণ, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ সকল কাজ সমবায়ের সদস্যরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সীমিত সংখ্যক কৃষক একমত হয়ে নিজেদের পারস্পরিক সম্বন্ধিত একটি কৃষি সমবায় গড়ে তুলতে পারেন। সমবায় কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন। এইরূপ সংগঠনকে রত্ন শীকৃতি দেয় এবং সহযোগিতা করে। এইরূপ সমবায় দেশে প্রচলিত সমবায় আইন অনুসারে গঠিত হলে সমবায় আইনের আওতায় নিবন্ধন লাভ করতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা কৃষি সমবায় সম্পর্কে আলোচনা করব।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- কৃষি সমবায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন সংরক্ষণ ও বাবদে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে কৃষি সমবায়ের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষি সমবায়ের ধারণা ও উদ্ভূত

বিষয়টি বুঝতে খেলা পিঠেই শুকু করা যাক। পাড়ার বা মহল্লার কিশোর কিশোরীরা কোনো খেলা, খরা যাক ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন, বা টেবিল টেনিস খেলতে চায়। স্বী করা যেতে পারেঃ প্রথম কাজ খেলার সাধি সম্বাদ করা। খেলার স্থান নির্বাচন করে রেকর্ডের টিক করা ও যুগ্মবিশেষের অনুমতি নেওয়া। এরপর খেলার সামগ্রী, ক্রিকেট হলে ব্যাট, বল, স্ট্যাম্প, ব্যাডমিন্টন হলে শেট, শেটের খুঁটি, কর্ক, ব্যাট, টেনিস টেনিস হলে টেনিস, ব্যাট, বল এগুলো কেন্দ্র। সাথিরা সবাই বিশেষ টাকা একত্র করে এগুলো কেন্দ্র। আবার তহবিলে কিছু অর্থ যেন থাকে যা থেকে খেলা চলিয়ে জরুরি জন্য কুণিয়ে যাওয়া সামগ্রী কেন্দ্র যায়। আরেকটি অতি নবকর্মে কাজ হলো, তহবিলের আর ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষিত পরেপন করা। একে মোটামুটি বলা যায় যে, সমবায় পদ্ধতিতে খেলা।

কৃষিকাজ সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ দুলাকা অর্জনের লক্ষ্যেও সমবায় পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। একে আমরা বলব কৃষি সমবায়। কৃষি সমবায়গুলো সাধারণত এলাকাজিকিত বা আঞ্চলিক হয়। আঞ্চলিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মুক্ত হওয়ার কৃষি বেশ ব্যবহৃত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া কৃষক উপায় ফলন হয়ে বাখতে পারেন। বাম্পার কলস হলে কলসের যায় পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় এগুলোই পড়ে যায় যে উৎপাদন ব্যয়ও উঠে আসে না। যদি এলাকার জায়ের নিজস্ব কলস প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও যত ওলাব থাকতো তাহলে এই আর্থিক ক্ষতি এড়ানো যেত। কোনো একজন কৃষকের পক্ষে (খুব যত্ন ও ধনী কৃষক বা হলে) এই সুবিধাগুলো অর্জন সম্ভব বা হলেও প্রত্যেক সমবায়ী কৃষক তার জমি ও পুঁজির আনুশাংকিত হয়ে দুলাকার শরিকানা লাভ করবেন, সাধারণত এটাই সমবায়ের চিত্তি।

এমন ব্যালায় একটি প্রবাদ আছে: 'সম্পন্ন পাঠি একের বোকা'। অর্থাৎ একজনের পক্ষে যে কাজ অবহনযোগ্য বোকা, সমজন একত্র হলে সেই বোকা বহু সহজেই বহনযোগ্য হতে পারে।

কৃষি সমবায় আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সমগ্র ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ বেগন সত্যপর্ব্ব অবলম্বন, শিথিল ও সমধিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার, সমধিক বলাই মনন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের নিরাপত্তা বিধান, যান্ত্রিক উপায়ে ফলন সমগ্র ও সমগ্র উত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, প্রচারজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি সমবায় উন্নয়নের সক্ষমতা এনে দিতে পারে এবং একাধে উচ্চ দুলাকা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। তদুপরি কৃষি সমবায় কৃষককে হঠাৎ বিপণনের সহনশীলতাও জোগায়। কলস "সম্পন্ন মিলে কঠি কাজ, হরি জিতি সাহি লাভ" এমন সন্ধাননা সৃষ্টি হয়। এবার আমরা কৃষি সমবায়ের কিছু উপযোগিতা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

সমবায়ের ধারণা

উদ্দেশ্য অনুযায়ী কৃষকগণ নানা ধরনের সমবায় গড়ে তুলতে পারেন।

- ১। কৃষি কুলখন সমবায় (সকল সমবায়) : সমবায়ের প্রয়োজনীয় কুলখন সংগ্রহ
- ২। কৃষি উপকরণ সমবায় : বীজ, সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, কলার ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার
- ৩। কৃষি উৎপাদন সমবায় : কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
- ৪। কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সমবায় : পণ্যদ্রব্য নির্ধারণ, ভর্তুকি গ্রহণ, কৃষিপণ্য বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত হিসাব রক্ষার জন্য।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কৃষি সমবায়ের ওষুধ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার

কৃষি উপকরণগুলোকে যেটা লাগে আমরা কয়েকভাবে জ্ঞাপ করবে পারি। আমরা দেখব যে সমবায়ের মাধ্যমে এই সকল উপকরণ যেমন উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা যায় তেমনি এ সকল উপকরণের সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

কৃষি জমি : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এই উভয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ফলাফল থেকে, সবসময় এক হেক্টর জমি না হলে একটি লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনা করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের অবিশেষে কৃষক এর চাইতে খুবই কম কৃষি জমি মালিক। এমন কী যাদের আড়াই একর বা তার কিছু বেশি পরিমাণ কৃষি জমি রয়েছে তাঁরাও তাঁদের কৃষিকাজের আবশ্যিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে মাটি যন্ত্রপাতি কিনতে সক্ষম নন। যদি কোনোভাবে বিদেশও কেলেদন এই যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারেন না। নিজের কাজ শেষে হত হ্রাটি বসিয়ে রাখতে বা জড়ায় নিতে হয়। সমবায়ের মাধ্যমে অনেক জমি একই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা যায়। সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল কৃষি উপকরণের সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সমবায়ীরাপ সমগ্র গ্রাম কিছু জমিকে জলাধারে রূপান্তরিত করে বর্ষার পানি ধরে রাখা যায়, যা থেকে প্রয়োজনের সময় পেতেই পানি পাওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ স্থানীয়মূলক কিছু জমিও সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়। দক্ষ ও বয়স্ক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারলে সমবায়ের আওতায় জমির পরিমাণ চার পাঁচশত হেক্টর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। তবে জমির পরিমণ বাড়ার পাশাপাশি জমি ব্যবহার পরিকল্পনা তেলে সাধনো প্রয়োজন হবে।

মাটি : কৃষিকাজের জন্য পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি ছাড়া কোনো ধরনের কৃষিকাজই চালানো সম্ভব নয়। কয়েক দশক আগে আমাদের দেশে কৃষিকাজের জন্য গভীর নলকূপেও সুপারিশ করা হতো। অতিপ্রচুর

মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে পতীত মলকুশের অতি ব্যবহার পৰিবেশ বাহন নহ। সমঝাইয়ে নিরাপদ পানি হলেও জলাধারে সঞ্চিত পানি। জলাধারে পানি বর্জকালে সঞ্চয় করে সারা বছর সেই পানি ব্যবহার সর্বোত্তম। জলাধার করা, সেবার থেকে পায়ের সাহায্যে পোচ মালা বা পাইপে সমঝারের আওতাধীন জমিগুলোতে, বহু অশচয়ে, সেসের পানি ব্যবহার করা যায়। জু-উপরিষ্ক জলাধারে সঞ্চিত পানি দিয়ে সেত সেওয়ার পরচ জ্বলনাকুলক অনেক কম। অম হাফা পোচ হাফাও এই জলাধারের পানি অন্যায় আনুমানিক কাকে সাপে বা লাভজনক।

কৃষি যন্ত্রপাতি। কৃষির আধুনিকায়নের জন্য কৃষি যন্ত্রীকরণ প্রয়োজন। পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর থেকে শুরু করে বহু ধরনের যন্ত্রপাতি জমল উৎপাদন, পণ্ড-পানি, মন্যে পানন তথা সার্বিক কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায়। এ সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ যত সহজে সমঝারের মাধ্যমে করা সম্ভব তা ব্যক্তি মালিকানায সম্ভব নহ। সমঝার পদ্ধতিতে যে কোনো কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ব্যবহার করলে আরামের কৃষির উৎপাদনশীলতা যে কোনো উন্নত সেসের মালকে হাড়িয়ে মেতে পারবে।

কৃষির অন্য সার, ঔষধ, বীজ, বায়ো ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন ও ব্যবহার

বীজ, সার, পলিত পণ্ড পানি মাছের খাদ্য এমনকি রোগবালাই নিবারক ঔষধেরও একটি যত্ন অংশ সমঝারের ভিত্তিতে উৎপাদন করা যায়। সরকারের কৃষি সেবা সংস্থাগুলোও বীজ, সার, ঔষধ সরবরাহ করে। সমঝার তার বাস্তবিক প্রয়োজন অংশ থেকেই নির্ধারণ করতে পারে এবং সেবাসমতাবী সংস্থাগুলোকে সেই তথ্য আগেভাগেই সরবরাহ করতে পারে। এতে জাতীয় কৃষি সেবাসমতাবী সংস্থাগুলো সরবরাহযোগ্য উপকরণের মোট তাহিলা সম্পর্কে জেনে খ্যাসমত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

কৃষি ঋণ। কৃষিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ খ্যাসমতের নিরাপদে প্রাপ্তি কৃষির অন্য খুবই সহায়ক। রেজিষ্ট্রিকৃত কৃষি সমঝার হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ নিতে খাফান্যবোধ করবে। প্রথমতঃ ঋণ গ্রহীতার নিবন্ধনকৃত পরিচয় রয়েছে, দ্বিতীয়তঃ ঋণের অর্থের সুদ ব্যবহারের একটি নিশ্চয়তা রয়েছে, তৃতীয়তঃ এবং সর্বোপরি, খ্যাসমতের ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা সমঝার নিজে সম্ভব।

কাহ্ন : শিক্ষাবীরা সমঝারের মাধ্যমে সংগ্রহযোগ্য কৃষি উপকরণের তাহিলা তৈরি করবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন

কৃষি পণ্য উৎপাদন : পণ্য শব্দটির ব্যবহার হলে মনে যে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিপণনের জন্যই সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। তা সে উৎপাদিত দ্রব্য শস্য, ফুল, ফল, তরু, বীজ, ঝাঁপ, কাঠ, তিম, দুধ, মাংস, চামড়া, মাছ বাহি হোক না কেন। কৃষি উদ্দেশ্য লাভ বা সুবাদা অর্জন। কৃষি পণ্য উৎপাদন উৎপাদক এবং জোতা অর্থাৎ ব্যবহারকারীর স্বচ্ছাচ্ছন্দ্যের বেন না হয় এবং সেই সাথে পরিবেশবান্ধব মেন হয়, সেই নিকট সন্ধ্যা যেনে কৃষি পণ্য উৎপাদন জরুরি।

সমবায়টি কোনো কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে অবস্থিত, কৃষি সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত জমি প্রেসি, মাটির ওপাতন, সমবায়ী পরিবারগুলোর এবং বাজারের চাহিদা ইত্যাদি এবং পরিবেশবান্ধবতা বিবেচনায় সিলে উৎপাদনের উপযুক্ত কৃষিপণ্য এবং উৎপাদন পদ্ধতি পরিকল্পনা করে সেই অনুযায়ী উৎপাদন করা মুক্তিযুক্ত। কৃষি কেন্দ্রে এবং খামারে যাতে কোনো রোগ-ব্যাধির উদ্ভব না হয়, হলেও যাতে তা কার্যকরভাবে নিরাপদ রাখা যায় তার জন্য কৃষকরা ব্যবহারপদ্ধতির প্রকৃতি খালাস দরকার। উৎপাদিত প্রত্য নিরাপদে সংরক্ষণ করার বিষয়টিও জরুরি। সংরক্ষণের পর সংরক্ষণ পরিবহনের জন্য কিছু কাজ, যেমন বাছাই-ছাটাই, প্রেসি বিজ্ঞান, প্যাকেটজাতকরণ বা মধ্যস্থ পাত্র স্থাপন ইত্যাদি কাজও পণ্যের মাসেরক্ষণ ও সংরক্ষণে সহায়ক হয়। উপযুক্ত সময়ে বিপণনের জন্য কম বেশি সময়ের জন্য পণ্য ওপাতন করে রাখা প্রয়োজন। কৃষি পণ্য ওপাতনকৃত করতে উপযুক্ত এবং কার্যকর পাত্র বেচন প্রয়োজন, যেমন কলামের পরিবেশের সৃষ্টি করতে হয়। পান, গম, তুটী বিভিন্ন প্রকার চাল ইত্যাদি পণ্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ওতাসের প্রয়োজন হয় এবং বায়ুরোধক পাত্রের সাথে পান্ডা ওতাসে রাখতে হয়। খুব ধনী কৃষক না হলে একজনের পক্ষে এই সকল সুবিধা সৃষ্টি সম্ভব নয়। সমবায় এই আয়োজন সংগঠিত করতে পারে। কৃষি পণ্য বিপণনে আরেকটি কার্যক্রম হলো নিরাপদ পরিবহন। পরিবহনের পাত্র, বাঁচা, প্যাকিং ইত্যাদি প্রযুক্তিপূর্ণ বিষয়। প্যাকিং নির্ভর করে পণ্যের উপর। শস্য পরিবহনে চট্টের বস্তা উপযুক্ত হলেও সবজি, ফুল-ফলের জন্য কোলোক্রমেই উপযুক্ত নয়। এ সকল পণ্যের কোনোটার জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি কিংবা হার্ডবোর্ড কাগজের বাক্স দরকার। আবার মাছ পরিবহনের জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি ব্যবহার করা নিরাপদ হলেও মাছের জ্যাত পোকা পরিবহনে পানি ভরা বড় পাত্র প্রয়োজন। পোনা এমনভাবে পরিবহন করতে হবে যাতে পোনা অস্ত্রিজেলের অভাবে মারা না যায়। তিম পরিবহনের জন্য বিশেষ পাত্র ব্যবহার করা হয় যাতে ভাঁজ করে হাজির হাজার তিম এক সাথে পরিবহন করা যায়। আবার দুধ পরিবহনে প্রয়োজন বিশেষ পাত্র। বিপণনের সুবিধার জন্য কৃষি সমবায়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিপণন সংস্থার সাথে থেকে সম্পন্ন মুক্তি থাকলে সবচেয়ে ভালো হয়। এই আয়োজনও সমবায় ভাসোভাবে করতে পারে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসাবে বিপণনের হিসাব নিকাশ/রেজিস্ট্রার্ড খাতার লিপিবদ্ধ করবে এবং প্রেসিতে জমা দিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমবায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

কৃষি সমবায় সম্পর্কে এ পর্বের যে আলোচনাগুলো হলো সেগুলো বিবেচনায় নিলে আমরা বুঝে সহজেই বুঝতে পারি যে, কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম। সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদনে সক্রিয় হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে আত্মরী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এই বহু কর্মসূচির সূচনা হয় মাত্র। বিত্তীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ হলো জমি ও অর্থ সমবায়ের মুখ্য কথা। তারও আগে দরকার সমবায়ের মূল শর্ত তথা বিধিগুলো আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা। এ ক্ষেত্রে রত্নীর সমবায় অধিদপ্তরের নিকটবর্তী দপ্তরের সহযোগিতাও চাওয়া যেতে পারে। পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে উপজেলা কৃষি, পচপালন ও মৎস্য কর্মকর্তাদের। সমবায় অধিদপ্তর প্রণীত কৃষি সমবায়ের গঠন প্রণালি অনুসরণ করে সমবায় সংগঠন গড়ে তুলে তা যথানিয়মে বখিভুক্ত করা প্রয়োজন। শুধু এক সাথে কৃষিকাজ করার জন্য একতর হয়ে, কোনো সংগঠন না গড়ে নিলে এইরূপ সমবায় বেশি দূর এগোতে পারে না। বরং স্বাচ্ছন্দ্য ও জরাজীর্ণতার অভাবে এর অকাল মৃত্যু ঘটাই স্বাভাবিক। মোক্ষা কথা হলো, সমগ্র কৃষিকাজ, কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের জন্য একটি দক্ষ সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এটিই সমবায় সংগঠন। কৃষি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন সকল হিসাব পাই পাই রাখা করবে এই সংগঠন। মুনাজা প্রত্যেক সমবায়ীকে বিশিষ্টোপের পরিমাণ অনুযায়ী ঋণের সারিভুক্ত এই সমবায় সংগঠন পালন করে। সরকারের বা সরকারি যে-সরকারি সেবা সংস্থাগুলোর অনুদান, ভর্তুকি, সেবা গ্রহণ করবে এবং হিসাব রাখবে। কৃষি পণ্য কেন্দ্র সংস্থা, কোম্পানি বা ব্যক্তির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করবে এবং ভদ্রানুযায়ী ব্যবসা করবে। সমবায়ীদের সমন্বয় সভার কায়ে সমবায়ের কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ গঠি থাকবে এবং সমুদ্র হিসাব উপস্থাপন করবে।

তাই আমরা সোচ্চতে পাজি সমবায় সংগঠন কৃষি সমবায়ের প্রবিশ। এই সংগঠন যত দক্ষ, সং ও শক্তিশালী হবে সমবায়ীরা ততই লাভবান হবেন।

কাঙ্ক্ষা। শিক্ষার্থীরা কৃষি সমবায়ের উপযোগিতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পরিবেশ বান্ধব কৃষি গ্রহণে কোনটি ?

ক. বালাইশাক ব্যবহার

খ. রাসায়নিক সার ব্যবহার

গ. খসড়া পর্ষায় অবলম্বন

ঘ. কদামজাত কচলের রাসায়নিক দ্রব্যব্যবহার

২. কৃষি পণ্যের যানোয়াতনে এলোজেন -

i. কসলেঃ খনে অনুবাহী সন্ধিতকরণ :

ii. যথাক্রমে উৎপাদিত কসল সংরক্ষণ :

iii. সঠিক জায়ে কসলের পরিচর্যা :

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সিদলাই গ্রামের কৃষকগণ গীর্ষদিন ঘরে পানি সেচের অভাবে কৃষিত ফসল উৎপাদন করতে পারছিলেন না। তাদের এ সমস্যা সমাধানে কৃষি কর্মকর্তা তাদের সাহেবের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন সব জাগরণ কৃষি সমন্বয় সমিতি। শাপনাই ও পরিবেশ বান্ধব গ্রহণের মাধ্যমে সিদলাই গ্রামের কৃষকগণ আজ ঐ এলাকার আদর্শ দল।

৩. ঐ সমিতির মাধ্যমে এলাকার কৃষকগণ লাভ করেন-

i. উন্নত কৃষি গ্রহণে ব্যবহারের সুবিধা

ii. উচ্চ মূল্যের ফসলের নিষ্কাশন

iii. রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুকল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. ঐ গ্রামের কৃষকগণ উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবেশ বান্ধব কোন পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন?

ক. অগভীর কলকূপ খনন

খ. গভীর কলকূপ খনন

গ. ডু-ইপরিহ জলাধার নির্মাণ

ঘ. পাম্পের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা

সুজনশীল প্রশ্ন

১. পরিমল বাবু, পোমোজ বাবু বশোর জেলার বনিসূর গ্রামের বাসিন্দা। বসতবাড়ি ব্যতীত তাদের সামান্য আবাদি জমি রয়েছে। তাদের প্রতিবেশী কৃষকদেরও একই অবস্থা। ফলে সকলেই সাপেক্ষিক খরচ চালাতে হিমশিম খান। দু'ব উন্নয়ন কর্মীর পরামর্শে পরিমল বাবুও নেতৃত্বে উক্ত গ্রামের কৃষকরা সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষি ঋণ পাওয়ার জন্য গ্রন্থাগারী কর্মক্রম গ্রহণ করলেন। অপরদিকে পোমোজ বাবুও নেতৃত্বে সমবায়ের মাধ্যমে 'মূল নার্সারি' স্থাপন করে বিভিন্ন কাজে সবাই নিয়োজিত হয়ে গেলেন। এতে অল্প সময়েই তারা আয়ের সুখ দেখতে পেলেন।

ক. কৃষি সমবায় কাকে বলে?

খ. সমবায় ব্যবস্থা কীভাবে অপরকে সক্রিয় হতে পোষায় ব্যাখ্যা কর।

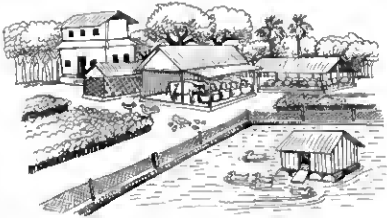
গ. পরিমল বাবুও পৃথীক কর্মক্রমের ধারা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঊর্ধ্বপক্ষে উদ্ভিতির অঞ্চলে কৃষকদের আর্থ বৃদ্ধিতে পোমোজ বাবুও নেতৃত্বের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

সপ্তম অধ্যায়

পারিবারিক খামার

বাংলাদেশ কৃষি এখন দেশ। কৃষি এদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। এদেশের কৃষক প্রাচীনকাল থেকেই পারিবারিক কৃষি খামার পরিচালনা করে আসছে। এদেশের কৃষক তার খামারে শস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য উৎপাদন করে। এ অধ্যায়ে পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক কৃষি খামার তৈরির কল-কৌশল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্ষুদ্র আয়ের টবল হিসাবে পারিবারিক কৃষি খামারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক দুগ্ধ খামার খাঁনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের বর্ণনা করতে পারব।
- দুগ্ধ সোহন ও সংরক্ষণের সনাতন ও আধুনিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক খামারের তথ্য গিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- খামারের উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ও তত্ত্ব

পরিবারিক খামার

বাংলাদেশের কৃষক পরিবার কৃষি খামারের মাধ্যমেই শস্য, শাকসবজি, পর্বশিপশ, ইঁস-মুরগি ও মৎস্য উৎপাদন করে থাকে। আবার অধুনাশী বাসর বাণিজ্যিক ও পরিবারিক হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক কৃষি খামার আবার বড়, মাঝারি ও ছোট হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক খামারের জন্য বেশ পরিমাণ মূলধন ও লোকল প্রয়োজন হয়। কিন্তু পরিবারিক খামারের জন্য কম মূলধন প্রয়োজন। পরিবারিক কৃষি খামার পরিবারের অংশগ্রহণে মিত্রের কখনো কখনো কিছু অতিরিক্ত আয় করে থাকে। বর্তমানে কৃষক পরিবারিক কৃষি খামার থেকে আয় করার চিন্তা মাঝারি রেখে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। মূল পরিবারের সদস্য ছাড়াই পরিবারিক কৃষি খামার পরিচালিত হয়।

পরিবারিক কৃষি খামারের তত্ত্ব

- ১। পরিবারের পাল্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে।
- ২। অতিমি আশ্রয়নে জীবিকা রপে।
- ৩। পরিবারের বেকার সদস্যদের কর্মক্ষেত্র তৈরি করে।
- ৪। পরিবারের সদস্যদের অর্থের সম্বন্ধে সচেতন হতে।
- ৫। পরিবারের স্বাভাবিক আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- ৬। পর্বশিপশ ও ইঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে কৃষি জমির উর্বরতা বাড়ানো যায়।
- ৭। পর্বশিপশ ও ইঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে আগাছা, ফসলের বর্জ্য ও উপজাতসমূহের সঠিক ব্যবহার করা যায়।
- ৮। পর্বশিপশ ও ইঁস-মুরগির মলমূত্র ব্যবহার করে ব্যত্যাগ্যাস উৎপন্ন করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
- ৯। পরিকল্পিত পরিবারিক কৃষি খামার জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- ১০। কৃষকের জীবন যাত্রার মান উন্নত করে।

নতুন শব্দ : ছোট আয়, দুগ্ধ গোহন

পরিবারিক শাকসবজি ও গোশ্চি খামার

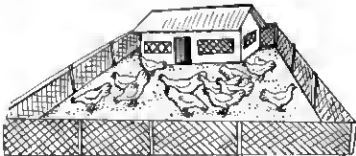
পরিবারিক শাকসবজি খামার

প্রধানত : পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা মেটাওয়ার জন্য এই খামার তৈরি হলেও পরিবারিক ছোট আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই খামারের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এই খামার বাড়ির

আগে পাশে খালি জায়গা, ঝাঁটু ভিটা, মাথোঁরি দিহু জমিতেও করা যায়। অতিমাত্রা কৃষকের পরামর্শ নিয়ে স্বত্বভিত্তিক সারা বছরের চাষ পরিকল্পনা করলে দ্রাঘ সারা বছরেই এই খাবার থেকে কলস পাওয়া যেতে পারে। যা তার পারিবারিক চাহিদা মেটাতেও পরেও কিছু অল্পও লাভে পারে। পারিবারিক নির্দিষ্ট পরিচর্যায় আগাম ফসল উৎপাদন করতে পারলে উচ্চ বাজার মূল্য পাওয়া যেতে পারে। এখন সারা বছরই কোনো না কোনো শাকসবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। যা সবার চাহিদা মেটাতে পারে। রাসায়নিক সার ও বায়োইনসেক্ট সার ব্যবহার না করেও কলস উৎপাদন করা যায়। এতে শাকসবজি নিরাপদ ও সুস্বাদু হয়।

পারিবারিক পোষ্টি খামার

পোষ্টি বলতে পুষ্টিপালিত গাধি যেমন, হাঁস, মুরগি, কবুতর, ডিডির, কোয়েল ইত্যাদিকে বোঝায়। ডিডির ও কোয়েল আশাশুভ লেগের নিম্নে পোষ্টি না হওয়ার ফলে জনপ্রিয় নয়। এদেশের কৃষক পারিবারিক পোষ্টি খামারে হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালন করে আসছে। পুষ্টিপালিত গাধি পালন এ দেশের কৃষকের দৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতীতকাল থেকে কৃষক তার খামারে সেপি জাতের হাঁস, মুরগি ও কবুতর পালন করে আসছে। সাধারণত কৃষক তার খামারে ৫-১৫টি হাঁস-মুরগি পালন করে থাকে। এই প্রচলিত খামারে কোনো উন্নত বংশোদ্ভূত বা খানের ব্যবস্থা থাকে না। হাঁস-মুরগি নিজেদের বাকির আশেপাশে চরে ঘাস পল ও পোকা-মাকড় খেতে বেঁচে থাকে। এতে পরিবারের ডিম ও মাংসের চাহিদা মেটে এবং উৎকৃষ্ট ডিম ও মুরগি বাজারে বিক্রি করে কিছু বাড়তি আয়ও হতে থাকে। এখনে বিনিয়োগ বিঘরটি প্রাচ্যায় পায় না। কিন্তু বর্তমানে এই খামার পরিবর্তন হয়েছে। সেপি জাতের হাঁস-মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে তারা পারিবারিক খামারে উন্নত জাতের হাঁস ও মুরগি পালন করে আসছে যারা বছরে ২৫০টির মধ্যে ডিম দেয়। এই পারিবারিক খামারে তারা অধিক মাংস উৎপাদনশীল ব্রুলাস মুরগিও পালন করে আসছে।



চিত্র ১ একটি পারিবারিক পোষ্টি খামার

এসব পারিবারিক খামারে ৫০-৩০০টি পর্যন্ত উন্নত জাতের ব্রুলাস বা সেম্পার মুরগি বা হাঁস পালন করতে দেখা যায়। সেসব কৃষক জমির অভাবে শস্য, পল্ল, ছাপল ও মাছ চাষ করতে পারে না তারা সহজে পারিবারিক হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করতে পারে।

সকলভাবে পারিবারিক শোণ্ডি থামার পৰিচালনার জন্য এপিক্স থাকা উচিত । বিশেষ করে শোণ্ডির জাত, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক ।

শোণ্ডির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলতে শোণ্ডিকে সুস্থ রাখার জন্য রোগ প্রতিরোধ ও অসুস্থ পশুর চিকিৎসাকে বোঝায় । শোণ্ডির ক্ষেত্রে চিকিৎসা থেকে রোগ প্রতিরোধই শ্রেষ্ঠ- কখনো অধিক প্রয়োজ্য । কারণ কোনো শোণ্ডি থামারে রোগ দেখা দিলে চিকিৎসা না করে কখনো ব্যবসা লাভজনক করা যায় না । তাই পারিবারিক শোণ্ডি থামার পৰিচালনার সময় নিম্ন লিখিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে ।

- সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান বাচ্চা খারা থামার তরু করা ।
- বন্যামুক্ত টিউ ছায়ে খায়র করা ও থামারের আশপাশে পরিষ্কার রাখা ।
- থামারের চারিদিকে মাঝে মাঝে জীবাণুনাশক স্প্রে করা ।
- থামারের পানি ন্যায় জন্য সর্গার ব্যবস্থা করা ।
- সড়ক হলে থামারের চারদিকে বেড়া সেওয়া ।
- ঘরের মেঝে ও সুরপির সিটর ঝককা রাখা ।
- শোণ্ডির ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি করা ।
- ঘরে বাতু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা ।
- খাদ্য ও পানির পাত্রে পরিষ্কার রাখা ।
- সুস্থম খাবার ও বিতন্ড পানি সরবরাহ করা ।
- হাঁস, সোয়াব ও ব্রুলায় মুরপির জন্য পৃথক পৃথক টিকাদান কর্মসূচি মেয়ে চলা ।
- থামার কবীর শরীর ও পোশাক পরিচ্ছন্ন থাকা ।

মহামারী আকারে রোগ দেখা দিলে সকল পশুকে ছলে করে বাটি মণা দিতে হবে । রোগ নিরাময়ে পত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে ।

পারিবারিক পৰিাপিত থামার

হাঁস-মুরপির মতো পৰিাপিত পালনও এসেশের পারিবারিক কৃষি থামারের বৈশিষ্ট্য । আমাদের দেশে পৃথকপিত পৰিাপিতের মধ্যে গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়া অন্যতম । বাংলাদেশের সর্বত্রই পারিবারিক থামারে গরু ও ছাগল দেখা যায় । কিন্তু মহিষ ও ভেড়া সর্বত্র দেখা যায় না । ধনী থামারের পক্ষে গরু ও মহিষ পালন করা সম্ভব । কিন্তু দরিদ্র ও ভূমিহীনদের জন্য ছাগল পালন করা সহজ । বাংলাদেশে পারিবারিকভাবে ছাগল পালন বুঝি লাভজনক । কারণ ছাগলের মাংসের চাহিদা ব্যাপক থাকায় এর বাজার মূল্য অনেক বেশি । ত্র্যাক বেশল ছাগল দ্রুত প্রজননের উপযুক্ততা লাভ করে । এরা একসঙ্গে ২-৩টি বাচ্চা প্রসব করে । পুরু ছাগল ৮ মাস বয়সে বাজারজাত করা যায় ।

আমাদের দেশি গাভী দৈনিক ১০-১৫ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। তাই পারিবারিক সুস্থ খামারে দেশি গাভী হারা পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানো যায় কিন্তু কেমনো ব্যক্তি আর করা যায় না। আমাদের চাহিদার তুলনায় দুধের সরবরাহ খুব কম হওয়ায় পারিবারিক পন্থার খামারে অভির আশঙ্কা নেই। হুস্টাইন, ক্রিসিয়ান ও জার্সি জাতের সকের গাভী দৈনিক ১৫-২০ লিটার পর্বত দুধ দিয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশের পারিবারিক খামারগুলোতে এ খরনের উন্নত জাতের সকের গাভী পালন করা সরকার। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত যুবক উন্নত জাতের গাভীর পারিবারিক খামার করে সফলতা পেয়েছে। পারিবারিক খামারে গাভীর সংখ্যা ২-৫টি পর্বত হয়ে থাকে। গাভীর সংখ্যা এর অধিক হলে তা বাণিজ্যিক খামারের রূপ নেয় এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য জনবল নিয়োগ করতে হয়।

সফলভাবে পারিবারিক পথ খামার পরিচালনার জন্য গ্রহণীয় থাকে সরকার। বিশেষ করে পতর জাত, উৎপাদন ক্ষমতা, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সরকার।

পরাণিপত্র খাদ্য ব্যবস্থাপনা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা বলতে পতর খামারের রোগ প্রতিরোধ ও অসুস্থ পতরকে চিকিৎসা প্রদান করাতে বোঝায়। পতর চিকিৎসা থেকে রোগ প্রতিরোধের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ খামারে রোগ দেখা দিলে চিকিৎসা করে পতরকে উৎপাদনে আসতে অনেক সময় লাগে। তাই পরাণিপত্র খামার পরিচালনার সময় রোগ না হওয়ায় জন্য নিম্নলিখিত খাদ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

- উঁচু স্থানে খামার করা ও খামারের চারিদিক পরিষ্কার রাখা।
- খামারে সাধারণতের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
- খামারের আশ্রিনার নিয়মিত জীবাণুমারক স্প্রে করা।
- খামারের পানি খামার জন্য নির্মিত ব্যবস্থা করা।
- গোয়াল ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বাভাবে তৈরি করা।
- খামারে বাদু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা।
- বন্য পতরাধি খামারে ঢুকতে না দেওয়া।
- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার রাখা।
- সুবন্ধ খাবার ও বিতঞ্চ পানি সরবরাহ করা।
- পতরকে নিয়মিত পোসল করানো
- গরু, মহিষ, ছাগল ও ছেঁড়ার জন্য পৃথক পৃথক টিকাদান কর্মসূচি মেনে চলা।
- মৃত পতরকে মাটি ঢালা দেওয়া।
- পতর রোগে পতর চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।



চিত্র : পতরকে পোসল করানো হচ্ছে



সিলভার কার্প



গ্রাসকার্প



কার্পিও



মাইগ্রেটিক



সবপুটি

চিত্র : অনেকগুলো কয়েকটি নির্দেশিত মাছ

খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ

অনেকগুলো খামারবাহিত কর্মসূচীর মাধ্যমে খামার পরিচালনা করা হয়। খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপগুলো হচ্ছে-

- খামারের পোনা যত্নপূর্ণ ব্যবস্থাপনা (পুষ্টি প্রকৃতি) : পুষ্টির আশ্রয় পরিচালনা, মাদুরে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দূরীকরণ, পান্ডা রোগজনিত, চুল প্রদোষ, সার প্রদোষ, পুষ্টিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা এবং পানির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা
- পোনা যত্নপূর্ণকালীন ব্যবস্থাপনা : পোনার প্রজাতি নির্বাচন, ভালোপোনা বাছাইকরণ, পোনা পোখল, পোনার পরিমাণ নির্ধারণ, পোনা পরিবহন এবং পোনা অভ্যস্তকরণ ও ছাড়া
- পোনা যত্নপূর্ণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা : নির্দিষ্ট সার প্রদোষ, সম্পূর্ণক খাদ্য প্রদোষ, মাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং মছ করা ও বিক্রয়

খামার পরিচালনার বিভিন্ন উপকরণ

খামার পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন। পোনার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় ভিত্তিক উপকরণ সমূহের চাহিদা নিচে দেওয়া হলো :

ব্যবস্থাপনার পর্যায়	উপকরণের চাহিদা
মহুদ পূর্ব বা পুকুর প্রস্তুতি	মা, কোলাশ, মাহ মারার নিব (বেকন-গ্রেটিনন), চুন, সার (জৈব ও অজৈব), বালতি, ছাত্র, হাতির চাকি, মগ, সেকিডিস
মহুদকালীন	মাছের রোগ, হাড়ি বা পলিথিন বাগ, বাবার লবণ, পটাসিয়াম পাব ম্যানানেট, pH কণক, আর্মোবিটর
মহুদ পরবর্তী	জৈব ও অজৈব সার, হাতির চাকি, বাঁদের টুকরা, সেকিডিস, সম্পূরক খাদ্য, বালতি, মগ/বাটি, খামলানি, চুন/জিপসাম, মা/কঁচি, ব্যালেন, পাহারা সেওয়ার জন্য টর্চ, জাল (খর্ব জাল, কঁচি জাল, বেড় জাল)

মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

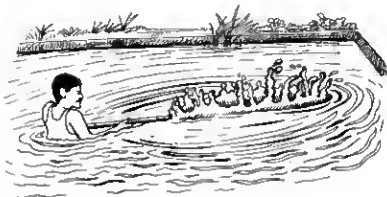
মাহ চাষকালীন সময়ে রোগাক্রান্ত হতে পারে। তাই মাসে একবার জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আনুমানিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বছরের যেকোনো সাধারণ সপ্তক হলে মাছের স্বাভাবিক চলাচলো বন্ধ হয়ে যায়, স্থলকণ স্বাভাবিক গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়, সেতের উপর লাগ/কালা/সোলা লাগ পড়ে, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় বা কম যায়, মাছের সেহ অতিমিত্তি বসবাসে অনুভূত হয়। চাষকালীন মাছের কয়েকটি সাধারণ রোগ হচ্ছে কবরোগ, স্কেল ও পাখনা পড়া রোগ, লাল ফুটকি রোগ, ফুলকা পড়া রোগ এবং মাছের উকুন। খামারের পুকুরে মাহ রোগাক্রান্ত হলে কোনো কর্মকর্তার পরামর্শ নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাথমিকভাবে পুকুরের ব্যবস্থা তেমন শক্ত প্রতি ০.৫-১.০ কেজি চুন প্রয়োগ করা যায়।

পুকুরের কিছু সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার

১। মাহ জেসে উঠা ও খাবি খাওয়া (পানিতে অক্সিজেনের অভাব)

পুকুরের তলার অতিরিক্ত কলার উপস্থিতি, জৈব পদার্থের পচন, বেশি সার প্রয়োগ, ঘোলাত্ব, মেঘলা আবহাওয়া ও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পানিতে অক্সিজেনের অভাব হয় এবং এ সমস্যা দেখা যায়। এর কালে মাহ ও তিথি মাঝে মাঝে। অক্সিজেনের অভাবে মৃত মাছের মূখ "হা" করা থাকে।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পানিতে সাঁতার কেটে বা পানির উপর বঁশ পিটিয়ে পুকুরের পানি আন্দোলিত করে অথবা হররা টেনে পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ানো হবে। বিপদজনক অবস্থায় পুকুরে পরিচালন নতুন পানি সরবরাহ করতে হবে অথবা পাশ পিঠে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।



চিত্র : খাদ্য শিকারী পুঙ্খবহ পানিতে অক্সিজেন ঘোষণা

২। পানির উপর সূর্যের প্রভাব

অতিরিক্ত সূর্য পোতা উৎপাদনের ফলে এ সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে হাফের খাদ্য কষ্ট হয় ও হাফ পানির উপর বাধা বেড়ে থাকে। পোতা পরে পরিবেশ নষ্ট হয়। হাফ ও চিত্রিত পুঙ্খ হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পাতলা সূতি কাগজ দিয়ে ঢেকে ফেলা যায়। সার ও খাদ্য সেখানে সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে কিছু পানি পরিবর্তন করতে হবে। কিছু বড় সিলিন্ডার আর্প হেডে জৈবিক ভাবে নিষ্কাশন করা যেতে পারে।

৩। পানির উপর লাল ভব

লাল পোতা: অথবা অতিরিক্ত আয়তনের জন্য এ সমস্যা দেখা যায়। এর প্রভাবে পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। হাফ ও চিত্রিত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করে যায়। আবার পানিতে অক্সিজেনের ঘটতিও হয়। শতাব্দে প্রতি ১২-১৫ গ্রাম কপার সালফেট বা তুঁতে ছোট ছোট পোটলার বেঁধে পানির উপর থেকে ১০-১৫ সেমি নিচে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে রাখলে বাতালে পানিতে ছোটদের ফলে তুঁতে পানিতে মিশে পোতা দমন করে।

প্রতিকার ব্যবস্থা: বড়ের বিজালি বা কলোপাইডের পাতা পৌঁছিয়ে তৈরি করে পানির উপর ট্রেনে বা পাতলা সূতি কাগজ দিয়ে ঢেকে ফেলা যায়।

৪। ঘোলা পানি

বৃষ্টি ঘোলা পানি পুঙ্খবহে প্রবেশ করে পানি ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। পাড়ে খাল বা খাকলেও এমনটি দেখা যায়। এর ফলে পানিতে সূর্যের আলো ঢুকে না, ফুলকা নষ্ট হয়ে যায় ও প্রাকৃতিক খাদ্য কমে যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পুকুরে চুন (১-২ কেজি/শতক), জিপসাম (১-২ কেজি/শতক) বা ক্রিটকারী (২৪০-২৪৫ গ্রাম/শতক) প্রয়োগ করা যায়।

৫। পুকুরের তলদেশের কাগার গ্যাস অধা হওয়া

কারণ: পুকুরের তলার অতিরিক্ত কলার উপস্থিতি এবং বেশি পরিমাণ সারস্রাভা ও আবর্জনার পচনের ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে করে পানি বিস্রাক হয়ে মাছ মারা যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পুকুর তলানো ফলে অতিরিক্ত কলার ফুলে ফেলতে হবে। হররা টেনে তলার গ্যাস দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।



চিত্র : হররা

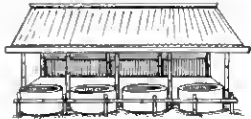
পারিবারিক মনস ধামাচ ছাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবারের মাছের জাহিদা মেটানো এবং সে সাথে সাথে ফলে বাড়তি কিছু মাছ বাজারে বিক্রি করে পরিবারের সারস্রাভা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও পারিবারিক ধামাচের মাধ্যমে পরিবারের বেকার সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

সকল শব্দ: হররা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পারিবারিক দুগ্ধ খামার

গাভী পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। একজন মানুষের বছরে প্রায় ৯০ লিটার দুধ পান করা সরকার। কিন্তু আমাদের দেশের একজন মানুষ বছরে গড়ে প্রায় ১০ লিটার দুধ পান করে থাকে। তাই দেশে দুধের উৎপাদন ও গ্রাহকের ব্যাপক অটুতি রয়েছে। বিশেষ থেকে পুষ্টি দুধ আরদানি করে এই বাটটি আর্থনিক পূরণ করা হয়। দেশে দুধের দ্রুতি বাড়ার নিগত দুই নম্বকে মানুষের মধ্যে গাভী পালন ও দুগ্ধখামার স্থাপনে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে প্রায় থেকে শহর ও উপশহরে অনেককই পারিবারিকভাবে গাভী পালন করছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাভী পালনে গাভীর বাসস্থান ও খামার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। গাভী পালন করে স্বকর্মসংস্থান বাড়ানো যায়, জীবনীন ও প্রান্তিক চটবিশেষ আর বাড়ানো যায় এবং পরিবারের পুষ্টি ও বাত্বিতি আরো বাড়ানো করা যায়। সুতরাং আমরা নিজের বাত্বিতে পারিবারিক খামার করে ২-৫টি গাভী পালনের মাধ্যমে আরো পথ সুগম করে দুধের চাহিদা মেটিতে পারি। উন্নত জাতের গাভীর খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করতে হবে। পারিবারিক পর্যায়ে ২-৫টি গাভী লম্বায়ে ছত্র ছত্র খামার স্থাপন করা যায়। সাধারণত ৫টি বা অল্প গাভী লম্বায়ে বাণিজ্যিক খামার স্থাপন করা যায়। খামার মাধ্যমে মূলধন সংরক্ষণ করতে থাকে স্বয়ং পরিশোধের ক্ষতিজনক বিবেচনা করে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। খামারেব জন্য গাভী নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে উন্নত জাতের অধিক দুগ্ধসম্পন্ন হয়। পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য বসতিবাতির উন্নত স্থান নির্বাচন করতে হবে। খামারের স্থান নির্বাচনে বেশব বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে হবে, সেগুলো নিম্নে দেওয়া হলো।

- অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও শুষ্ক স্থান।
- খামারের স্থান উন্নয়ন ও নির্মাণ।
- খামার সম্প্রসারণ করার সুযোগ।
- বসন্তযন্ত্র হতে একটি দুই।
- আলো যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- পানি ও পথ বাতের প্রাপ্যতা।
- পশুর চাহিদা ও বাতীর ব্যবস্থা বিবেচনা।

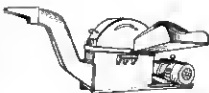


চিত্র : একটি পারিবারিক খামার

পারিবারিক দুগ্ধ খামারের প্রয়োজনীয় উপকরণ

পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপন করতে বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। খামার নির্মাণের জন্য মূলধন থেকে শুরু করে গাভীর খাচা প্রসব পর্যন্ত বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। উপকরণ নির্বাচন ও উৎসের সময় উভয়ের গুণগতমান সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে। নিম্নে উপকরণসমূহের পরিচিতি দেওয়া হলো :

মুগধন, বাহারের জুনি বা জমি, ভালো জাতের পাঠী, আদর্শ সোপলা, খোশালা নির্মিত সাক্ষী, উন্নত বাশোর ও পানির পাত্র, বাসের জনি, পানির লাইন, পরিবহনের জন্য পিক আপ/মটরভ্যান বা রিকসা জ্যান, বাস কটির চশিৎ মেশিন, কিত ট্রাপি ও বাহারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, দুগ্ধ সোহন ও বিতরণ সাহিত্রী, পাত্র গ্রাফিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি, পাত্র জন্য প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাস ও শাদাদার খাদ্য, টিকার সরবরাহ এবং পত্রকে কৃত্রিম গ্রন্থননের ব্যবস্থা



চিত্র : ঘাস চশিৎ মেশিন

কাছ : পরিবারিক দুগ্ধ বাহারের উপকরণের তালিকা তৈরি করবে ।

দুগ্ধ সোহন

পাঠীর ওলান থেকে দুধ সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে দুধ সোহন বলে । নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে একই পোয়ালো হারা পাঠী থেকে দুধ সোহন করতে হয় । এতে করে পাঠী হিরতভাবে করে এবং উৎপাদনের দাখাবাহিকতা বজায় থাকে ।

দুধ সোহনের ধাপ-

১। দুধ সোহনের সময় : প্রতিদিন দুইবার অথবা তিনবার দুধ সোহন করা যায় । নির্দিষ্ট সময়সূচী মেলে সোহন করলে দুধ উৎপাদন বাড়ে ।

২। পাঠী প্রস্তুত করা : দুধ সোহনের পূর্বে কখনোই পাঠীকে উত্তেজিত বা বিরক্ত করা যাবে না । কোনো অবস্থাতেই পাঠীকে মারধর করা যাবে না । দুধ সোহনের পূর্বে পাঠীর ওলান ও বাট সুসুস্থ পরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে । তারপর পরিষ্কার কাপড় বা জোয়ালে দিয়ে ওলান ও বাট মুছে দিতে হবে ।

৩। পোয়ালার প্রকৃতি : সোহনের পূর্বে পোয়ালাকে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হবে । গামছা বা কোনো কাপড় দিয়ে চুল থেকে রাখতে হবে । সোহনকারীর সব কেটে নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে । দুধ সোহনের সময় সোহনকারীর বদন্ত্যাস যেমন- খুখু কেল্লা, শাক কাড়া এমনকি কথা কলা ইত্যাদি জ্যান করতে হবে ।

৪। সোহনের জন্য পরিষ্কার পাত্র ব্যবহার করা : ওলান থেকে দুধ সোহনের সময় বাসতিন পরিবর্তে পটুল আকুরির চাকলাসহ বাহ্যাসম্বত হাতাওলালা ব্যক্তি ব্যবহার করা উচিত । দুধ সোহনের পর দুধের পাত্র প্রথমে পরম পানি দিয়ে এবং পরে ত্রাপ দিতে হবে পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে কেলতে হবে । পরবর্তী সোহনের পূর্ব পর্যন্ত তাকে পাত্রগুলো উপুত্ব করে রাখতে হবে ।

৫। পালকে বশ্যবাহি দুগ্ধসাধা : দুধ সোহনের সময় বশ্য বাহি গোন পালকে বিতক্ত না করে সে বিকে খেয়াস রাখতে হবে।

৬। দুধ সোহনের অন্য পালকে উদ্বীপিত করা : বাছুরের ঘরা পালীর বাঁট হুঁটিতে অথবা গোয়াদা কর্তৃক ওলাস ব্যাসাজ করে পালীকে দুধ সোহনের জন্য উদ্বীপিত করতে হবে।

৭। সোহনের সময় পালীকে ঝাওরানো : দুধ সোহনের সময় পালীকে ব্যাচ রাখার জন্য অল্প পরিমাণ দানাদার খাদ্য বা সবুজ ঘাস পালীর সাহনে দেওয়া উচিত। এতে পালী খাবার খেতে ব্যস্ত থাকে এবং দুধ সোহন সহজ হয়।

দুধ সোহন পদ্ধতি : দুধ সোহন পদ্ধতি দুই প্রকার -

১। সর্বাঙ্গন পদ্ধতি : হাত দ্বারা সোহন

২। আধুনিক পদ্ধতি : যন্ত্রের সাহায্যে সোহন

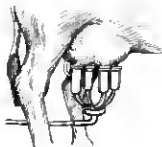
দুধ সোহনের সময় যে কোনো একটি পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১। হাত দিয়ে দুধ সোহন

সোহনের সময় ওলাসের বাঁটের পোড়া বস্ত্রে রেখে বাঁটের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হয়। ফলে বাঁটের মধ্যে জমা হওয়া দুধ বের হয়ে আসে। অব্যাহত চাপ সহিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে ওলাস থেকে বাঁটে দুধ এসে জমা হয়। এভাবেই প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করতে থাকে। হাত দিয়ে সোহনের সময় পালীর হামপাশ থেকে সোহন করতে হয়। দুধ সোহনের সময় প্রথমে সামনের দুই বাঁট একসাথে ও পরে পিছনের দুই বাঁট একসাথে সোহন করা হয়। অব্যাহত অতঃক ৩৭ (x) সিসেমের অথবা সামনের একটি ৩ পিছনের একটি বাঁট একসাথে অথবা যে বাঁটে দুধ বেশি আছে হাতে মনে হয় সেগুলো আগে সোহন করে থাকে।



চিত্র : সর্বাঙ্গন পদ্ধতি



চিত্র : আধুনিক পদ্ধতি

২। বুকের সাহায্যে সোহন

বড় বড় বাণিজ্যিক স্বাস্থ্যে বেখানে গাভীর সন্তা অনেক বেশি সেখানে একসঙ্গে অনেকগুলো গাভীকে সোহনের জন্য সোহন বস ব্যবহার করা হয়। সোহনের সময় হলে গাভীর বাঁটে টিট কাপ লাগিয়ে দুধ সোহন বস চালু করা হয়। এতে সহজে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ সোহন করা সম্ভব হয়।

স্বাস্থ্য : শিকারীরা দুধ সোহনের আধুনিক ও সমাজন পদ্ধতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করবে।

দুধ সংরক্ষণ

নির্দিষ্ট সময়-সীমা পর্যন্ত দুধকে স্বাস্থ্য হিসাবে উপযোগী রাখতে পচনহীন রাখার প্রক্রিয়াকে দুধ সংরক্ষণ বলে। সোহনের পর পরই দুধকে হাঁকতে ও ঠাণ্ডা করতে হয়। দুধের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন সহজ নয়। কারণ দুধের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন পুর সহজে ঘটে। বাংলাদেশের সর্বত্রই সাধারণত কাঁচা দুধ বিক্রি করা হয়। দুধ অধিক সময় কাঁচা অবস্থায় থাকলে গুণগত মান ক্ষুণ্ণ হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় বিভিন্ন জীবাণু দুধে ল্যাকটিক এসিড উৎপাদনের মাধ্যমে দুধকে টিক স্বাদযুক্ত করে ফেলে। স্ট্রেপটোকক্কি (*Streptococci*) নামক জীবাণু প্রধানত দুধে এসিড তৈরি করে। জীবাণু সাধারণ তাপমাত্রায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে দুধ নষ্ট করে ফেলে। নিম্নে দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

ক) দুধ সংরক্ষণের সমাজন পদ্ধতি

দুধ তাপ দ্বারা স্ফুটনে সংরক্ষণ করা : পারিবারিকভাবে এটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। একবার গরম করলে ৪ ঘণ্টা ভালো থাকে। তবে ৪ ঘণ্টা পর পর ২০ মিনিট করে স্ফুটালে দ্বায় সংরক্ষণ রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু কমে গ্রাহ্য হয়। তবে, এতেও দুধের গুণমান কিছুটা কমে যায়। কেননা উচ্চ তাপ প্রক্রিয়ায় কিছু সংখ্যক ভিটামিন ও অ্যান্টিবায়ো এসিড নষ্ট হয়ে যায়।

খ) দুধ সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি

১। রিক্লিমারেটরে স্বল্প সময়ের জন্য ৫° সে. রেখে দুধ সংরক্ষণ করা যায়।

২। ডিপ ফ্রিজ দুধ সংরক্ষণ করা যায়। এখানে দুধে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় না ঠিক, তবে দুধের রাসায়নিক বদল ভেঙে যায়। কলে দুধের গুণগত মান কিছুটা হ্রাস পায়।

গ। দুধ পাস্টারাইজেশন

পুষ্টিগত দুধকে অন্যতর আদর্শ স্বাস্থ্য করা হয়। এই দুধ বাতুর বা হানুকের জন্য আদর্শ থাকার, সাথে সাথে এটি অণুজীবের জন্যও সমানভাবে আদর্শ মাধ্যম। দুধ সোহনের পর সময়ের সাথে সাথে দুধের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে এবং দীর্ঘকাল সাধারণ তাপমাত্রায় রাখলে এক সময় সম্পূর্ণরূপে এটি নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট হওয়ার কারণ হিসাবে প্রধানত অণুজীবকে দায়ি করা হয়। এই অণুজীব অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ও নিম্ন মাত্রায় ক্রমাতে ও বংশ বিস্তার করতে পারে না। এই তাপমাত্রা ব্যবহার করে দুধের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিরস্তর করার উপায় হলো পাস্টারাইজেশন। দুধ পাস্টারাইজেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো রোগ উৎপাদনকারী

জীবাণু ধ্বংস করা। দুধ বেশি সময় সংরক্ষণ এর জন্য অবস্থিত জীবাণু ধ্বংস করা, দুধে উপস্থিত এনজাইম নিষ্কিয়করণ।

সুই পাসের (১৮-৬০-১৮-৬৫ মিটার) একজন করাসি কসারনবিদ প্রথম অনুধাবন করেন যে, পচন প্রণালি এক প্রকারের জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। যদিও সুই পাসেরই পারদ্রিকরণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক, কিন্তু দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণে ড. সফসলেট নামক এক জার্মান বিজ্ঞানী প্রথম এর ব্যবহার করেন। দুধে উপস্থিত রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ও এনজাইম ধ্বংস করে দুধের প্রত্যেক কণাতে ১৪৫° তা. (৬২.৮° সে.) তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট সময়কাল অথবা ১৬২° তা. (৭২.২° সে.) তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড সময়কাল পর্যন্ত উত্তপ্ত করাকে পারদ্রিকরণ বলে। পারদ্রিকৃত দুধ সতে সতে ৫° সে. তাপমাত্রায় নিচে ঠাণ্ডা করতে হবে।

পারদ্রিকরণ এর সুবিধা

- ১। পারদ্রিকৃত দুধ নিরাপদ, কেননা এতে রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ধ্বংস হয়।
- ২। পারদ্রিকরণ দুধের সংরক্ষণকাল দীর্ঘায়িত করে, কেননা ইহা ল্যাকটিক এসিড প্রস্তুতকারী জীবাণুর সংখ্যা কমায়।
- ৩। পারদ্রিকরণ এর ফলে দুধের এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে দুধ দীর্ঘকাল ভালো থাকে।
- ৪। পারদ্রিকরণের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষতিকর জীবাণু বিনষ্ট হয়ে যায়।
- ৫। এই প্রক্রিয়ায় দুধের পুষ্টিমান ঠিক থাকে, কোনো বিধাদেশ সৃষ্টি হয় না।

পারদ্রিকরণের অসুবিধা

- ১। পারদ্রিকরণ প্রক্রিয়া আদর্শ উপায়ে করতে না পারলে অতিরিক্ত অ্যাসোজনে দুধের চর্বি কণা শুষক হতে পারে।
- ২। তাপ সংবেদনশীল ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- ৩। উচ্চ তাপজনিত কিছুটা বিধাদেশ সৃষ্টি করতে পারে।

পারদ্রিকরণের প্রকারভেদ:

- ১। নিম্নতাপ দীর্ঘ সময় পারদ্রিকরণ ৬২.৮° সে. তাপ ৩০ মিনিট সময়ের জন্য।
- ২। উচ্চতাপ কম সময় পারদ্রিকরণ ৭২.২° সে. তাপ ১৫ সেকেন্ড সময়ের জন্য।
- ৩। অতিউচ্চতাপে পারদ্রিকরণ ১৩৭.৮° সে. তাপে ২ সেকেন্ড সময়ের জন্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করা

পারিবারিক খামার একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এইরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো পারিবারিক কৃষি খামারের সকল স্থাবর-গুরুত্বের সম্পদ সম্পত্তির বিবরণ, আয় বা বিনিয়োগের আর্থিক তথ্য, আয়ের সকল তথ্য এবং মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ বা সন্নিবিষ্ট করা প্রয়োজন। নিচে একটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

পারিবারিক খামার : জালিক পারিবারিক খামার

খালিকের নাম : জালিক মিত্র

ঠিকানা : গ্রাম- বরুয়া

মৌজা-বরুয়া-কালুগ

উপজেলা/থানা- বরুয়াসিংহ সদর

তারিখ- বরুয়াসিংহ ২২০২

পারিবারিক খামারে মোট জমির পরিমাণ : ১ বিঘা (৩৩ শতক)।

উঁচু জমি	: ৩ শতক
মাথাবি শিল্প জমি	: ১০ শতক
বসত বাড়ি	: ৭ শতক
পুকুর	: ২০ শতক
খামার	: ৩ টি
মৎস্য খামার	: ২০ শতক
সবকি খামার	: ১০ শতক
ব্রহ্মার মুরগির খামার	: ৩ শতক

নিম্নে ব্রহ্মার মুরগির খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব বর্ণনা করা হলো।

খামারের উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

পারিবারিকভাবে ব্রহ্মার ও লেগার মুরগি পালন করলে মিজেরদের খাবার মাংস ও ডিমের চাহিদা মেটে। তাছাড়া ব্রহ্মার ও খামার ডিম বাজারে বিক্রি করে ব্যক্তি আয় করা সম্ভব। নিচে ১০০টি ব্রহ্মার মুরগি পালনের আয়-ব্যয় হিসাব করার একটি নমুনা দেওয়া হলো।

ব্রহ্মার মুরগি পালনের ব্যয়ের খাত ২টি- ক। স্থায়ী খরচ, খ। চলমান খরচ

ক। স্থায়ী খরচ (Capital or Fixed Expenditure) : খামারে বাজা তোলার আরম্ভ জমি, মুরগির ঘর, আসবাবপত্র, ব্রহ্মার বয়, খাদ্যের পাত্র, পানির পাত্র, ছত্র ও বাসতি ইত্যাদি খরচসমূহে যে সমস্ত খরচ হয় তাকে মূলধন বা স্থায়ী খরচ বলে। নিচে ১০০টি ব্রহ্মার মুরগি পালনের ব্যয় হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলো।

ক্রমিক	মুদ্রণের খরচ	ব্রহ্মণের খরচ (হোকার, চিক পার্শ্ব, বাথ)	খাদ্যের ও পানির খরচ	পানির ব্যয় ও ভ্রাম	মোট স্থায়ী খরচ
নিম্ন	৮,০০০/-	২,০০০/-	১,০০০/-	১০০০/-	১২,০০০/-

৭. চলমান খরচ (Recurring Expenditure) : খামারের ব্যাঙ্ক ত্রু থেকে তরু করে সৈন্যদল যে সব খরচ হয় তাকে চলমান খরচ বলে : ব্যাঙ্ক পালনকালে শেষ পর্যন্ত ১০০টির মধ্যে ২-৫ টি মৃত্যু হয়। চলমান খরচের মধ্যে ব্যাঙ্কের দাম, খাদ্য ত্রু, চিকিৎসা খরচ, টিকা ও ঔষধ, শিটার (মুদ্রণের বিছানা), শ্রমিক ও পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মণের মুরগি মোট ১ মাস খামারে থাকে। নিচে পরিবারিক খামারে ১০০টি ব্রহ্মণের মুরগি পালনের চলমান খরচ হিসাব করার একটি ছক উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হলো।

ব্যাঙ্কের দাম (প্রতিটি ৫০/-)	খাদ্য ত্রু (প্রতিটির জন্য ও বেড়ি মোট ৩০০ কেজি খাদ্য, প্রতি কেজি ৩০/-)	চিকিৎসা (মাসিক ৩০০/-)	টিকা ও ঔষধ	শিটার	শ্রমিক	পরিবহন খরচ	মোট চলমান খরচ
৫,০০০/-	৯,০০০/-	৩০০/-	১৫০০/-	২০০/-	নিম্ন	৫০০/-	১৭,৫০০/-

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে ১০০টি ব্রহ্মণের মুরগি পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে ক্লাসে অর্পণ দিয়ে।

প্রকৃত আয় হিসাবের জন্য মোট চলমান খরচের সাথে মুরগির খরচ, ব্রহ্মণাভি, মূলধন ও চলমান খরচের উপর অপর খরচ (Depreciation Cost) হিসাব করতে হবে।

মোট বার্ষিক অপর খরচ (Depreciation Cost)

১। মুরগির খরচের উপর (১০০০/- টাকার উপর ৫%) = ৫০০/-

২। ব্রহ্মণাভির উপর (৫,০০০/-টাকার উপর ১০%) = ৫০০/-

৩। মোট স্থায়ী মূলধন ও মোট চলমান খরচ = (১২,০০০ + ১৭,৫০০/-) উপর ১৫% = ৪,৪১০/-

মোট বার্ষিক অপর খরচ = ৫,২১০/- টাকা

এক বছরে যদি ১০টি ব্যাঙ্ক পালন করা হয় তবে একটি ব্যাঙ্কের মোট অপর খরচ হবে = টা ৫২১/- টাকা
অতএব মোট ব্যয় = মোট চলমান খরচ + একটি ব্যাঙ্কের মোট অপর খরচ = টা ১৭,৫০০/- + টা ৫২১/- = টা ১৭,৯২১/-

আয় (Income) : ব্রহ্মণের মুরগি, শিটার ও খাদ্যের বস্তু বিক্রি করে আয় করা যায়। তাছাড়া শিটার জৈব সার হিসাবে ব্যবহৃত এবং বছরে খাদ্য তৈরিতে পুঙ্খের ব্যবহার করা হয়। নিচে পরিবারিক খামারে ১০০টি ব্রহ্মণের মুরগি থেকে আয় হিসাব করার একটি ছক উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হলো।

ব্রহ্মলয় ঘুরণি বিক্রি ৯৫টি (৫% হুদ্য) ১৫০/- কেজি (পড় শুকন ১.৪ কেজি)	লিডার বিক্রি	বাসেবর বস্তা বিক্রি (বস্তা ৬টি, প্রতিটি ১০/-)	মোট আয়
১৯,৯৫০/-	১০০/-	৬০/-	২০,১১০/-

নিট লাভ = (মোট আয় - মোট ব্যয়) = টাঃ ২০,১১০/- - টাঃ ১৭,৯২১/- = টাঃ ২,১৮৯/- টাকা

কাজ : শিক্ষার্থীরা বায়রের আয় ব্যয়ের ও লাভ ক্ষতির হিসাবে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি সম্পর্কে লিখবে।

নতুন শব্দ: স্থায়ী খরচ, চলমান খরচ, লিটার

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পারিবারিক খিনি পুঙ্খরে চাষ করা হয় কোন বায় ?

ক. যুগোল

খ. গ্রাস কর্ণ

গ. সরপুটি

ঘ. পাশাশ

২. দুই পদ্ধতি করণের উদ্দেশ্য-

i. জীবনু ধরনে করা।

ii. ওপাতল অক্ষুর রাখা।

iii. রাসায়নিক উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিম্নের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সিহন মিয়া তার বাড়ির সামনের ৬০ শতকের ১.৫ মিটার পতীরজার পুকুরে মাছের চাষ করেন। বর্ষার শেষে তিনি পুকুরে দিয়ে লক্ষ করেন তার পুকুরের মাছগুলো ঘাটে পুতে রাখা বাঁশের সাথে বা ঘষছে। তিনি এ বিষয়ে অস্যা কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করলে অস্যা কর্মকর্তা তাকে কিছু পরামর্শ দেন।

৩. সিহন মিয়ার পুকুরের মাছগুলো কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল?

ক. কড়া রোগ

খ. লেজ পড়া রোগ

গ. মাছের উকুন রোগ

ঘ. লাল ছুটকি রোগ

৪. সিহন মিয়ার পুকুরের অন্য কর্মশপ্তে কত কেমি ডিপটারের প্রয়োজন?

ক. ১.৫ কেমি

খ. ১.৮ কেমি

গ. ২.৫ কেমি

ঘ. ২.৮ কেমি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফ-হাসিক দীর্ঘ বিন ঘরে নিজ আক্তিনার বেশি কাজের সুযোগ পালন করে আসছেন। একে তেমন লাভবান না হওয়ায় তারা শোস্তি খামারের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে পরিবারিক শোস্তি খামার স্থাপন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সফলতা লাভ করেন। কিন্তু তারা লক্ষ করলেন তাদের খামারের বর্জ্যগুলো বাড়ির পরিবেশকে দূষিত করছে। এ অবস্থায় তারা খামারের বর্জ্যগুলো পটিয়ে কসলের জমিতে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. পরিবারিক খামার কতক বলে?

খ. বসিদ্ধিক খামারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. আরিফ-হাসিকের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আরিফ-হাসিকের উদ্যোগটির বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত



বিশ্বব্যাপক স্বপ্ন- পান্ডিত্য ও নিরাক্ষরতার মুক্ত সোনার বাংলাদেশ পঙ্কজে
নিম্নোক্তের মধ্যে দাপ্তরিক হিসেবে গড়ে তোল
- মানবীর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না

নবী ও পিতৃ নির্ধারিত ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য মাশবল মেডেলাইন সেন্টারে
১০৯২১ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য